ত্রিপুরার সন্ত চরিতমালা

ডঃ জগদীশ গণ-চৌধুরী
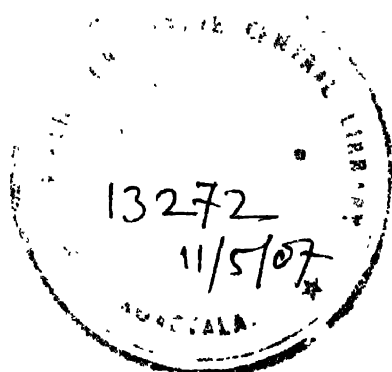
আগরতলা, ত্রিপুরা

৫১০৪ কল্যব্দ, ২০০২ খৃষ্টাব্দ, ১৪১২ ত্রিপুরাব্দ, ১৪০৯ বঙ্গাব

TRIPURAR SANT-CHARITMALA

By

Dr. Jagadis Gan-Chaudhuri

প্রথম সংস্করণ ঃ আগরতলা বইমেলা, ২০০২

(স্ব) ডঃ জগদীশ গণ-চৌধুরী

প্রকাশক ঃ ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি

প্রাপ্তিস্থান ঃ

নিউ আগরতলা বুক সেন্টার
আগরতলা - ৭৯৯০০১
দূরভাষ ঃ (০৩৮১) ৩৮ ৬৫৫০

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধাণ সরণী, কলিকাতা - ৭০০০০৬

অক্ষর বিন্যাস ঃ সুপার সোনিক
বিকাশ গণ-চৌধুরী, দুর্গা প্রসাদ সিন্‌হা

মূল্য ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা

গুরুদেব শ্রী শ্রী শান্তি কালী

সাধক ভূপেন্দ্র দেববর্মা

ন্যায় ও সত্য রক্ষা করতে গিয়ে এঁরা হলেন নিহত।

তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ নিবেদিত।।

সূচীপত্র

ভূমিকা

ত্রিপুরার সন্ত চরিত্রমালা রচনা করতে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সন্তদের চরিত্র চিত্রায়ণে অলৌকিকতা, কল্পনাবিলাস, নাটকীয়তা পরিহার করা হল। তাঁদের আবির্ভাব-তিরোভাব, আচার-আচরণ, ভজন-পূজন ইত্যাদি বিষয়ে অতিন্দ্রীয়তা, অলৌকিকতা, রহস্যময়তা আরোপ করলে বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে বিশেষত কলিযুগে।

সন্তরা সামাজিক জীব, সামাজিক বন্ধন তাঁদের থাকতেই পারে। সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক সম্পর্ক সব সময় সন্তদের ক্ষেত্রে দোষাবহ, লজ্জাকর — এ ধারণা সম্ভবতঃ ঠিক নয়। পারিবারিক সম্পর্ককে কিভাবে ব্যবহার করা হয়, সেটিই বিচার্য বিষয়।

সুদূর অতীতে প্রাচীন ভারতে আবির্ভূত অনেক সন্তের আয়ুষ্কাল পাওয়া যায় না। তাই তাঁরা আদৌ ছিলেন কিনা - এ ধরণের সন্দেহ কেহ-কেহ প্রকাশ করতে পারে। ত্রিপুরাতে আবির্ভূত সন্তদের সম্বন্ধেও দীর্ঘকালের ব্যবধানে সেই প্রকার সন্দেহ দেখা দিতে পারে। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত সন্তরা যে কাল্পনিক পুরুষ নন, বরং রক্ত-মাংসের মানুষ একথাটি বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁরা স্বয়ম্ভু নন, দেবদূত নন। তাঁরা মহান। তাঁদের পারিবারিক পরিচয় সংযোজন একারনেই করা হল। তাঁদের কার্যাবলী সম্বন্ধে যুক্তিগ্রাহ্য, মানবীয় ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস অন্তর্নিহিত আছে এই জীবনপঞ্জীতে। ইহাতে তাঁরা হেয় হবেন না, বরং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবেন, কালের করাল গ্রাসে বিস্মৃত হবেন না। জীবনীমূলক এই প্রবন্ধগুচ্ছকে সন্তদের নামের আদ্য অক্ষর অনুসারে বর্ণনাক্রমে সাজানো হয় নি, তাঁদের আবির্ভাবের কালানুক্রমে সাজানো হল।

প্রয়াত ও জীবিত সব সন্তের জীবনী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। মাত্র কতিপয় সন্তের জীবনী সংকলিত হল। ইহা এই গ্রন্থের অন্যতম দুর্বলতা। এছাড়া, সব সন্তের ছবি সংগ্রহ করা যায় নি। আরেক দুর্বলতা হল পরিবেশিত তথ্যে সম্ভাব্য ভুল-ত্রুটি। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মহাত্মাদের নিকট এবং ভক্ত-শিষ্য, পাঠকবর্গের নিকট গ্রন্থকার ক্ষমাপ্রার্থী।

এই গ্রন্থের অন্তর্গত তথ্যাদি সংগ্রহ করা একার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বহু সহৃদয় ব্যক্তি, ভক্ত শিষ্য একাজে সহায়তা করেছেন। এই সব মহানুভব সহায়কদের নিকট গ্রন্থাগার ঋণী।

ন্যায় ও সত্য রক্ষা করতে, দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বাঁচাতে গিয়ে যাঁরা নিহত হলেন, তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হল।

মহারাজ রাজধর মাণিক্য

মহারাজ অমর মাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র রাজধর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ত্রিপুরার দক্ষিণভাগে, উদয়পুর নগরে। অমরের রাজত্বকাল হল ১৫৭৭ খৃঃ থেকে ১৫৮৫ খৃঃ পর্যন্ত। রাজধরের রাজত্বকাল হল ১৫৮৬ খৃঃ থেকে ১৫৯৯ খৃঃ পর্যন্ত। অমরের জন্ম আনুঃ ১৫২০ খৃষ্টাব্দে। রাজধরের জন্ম আনুঃ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে। রাজধরের পুত্র যশোধর ভূমিষ্ঠ হন ফেব্রুয়ারী ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে।

সম্রাট অশোকের জীবন ও ত্রিপুরার মহারাজ রাজধরের জীবন কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ। যুবরাজ রাজধর ছিলেন সৈনিক, যুদ্ধা, রাজ্যবিজেতা; মহারাজ রাজধর ছিলেন করুণাময়, বৈষ্ণব, ধার্মিক, ভক্ত প্রবর, দানবীর এবং অহিংসার প্রতিমূর্তি। ষড়রিপু বিবর্জিত এই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব মহারাজ প্রতিদিন পঞ্চপাত্র অন্নদান করতেন। ভারতের সুপ্রাচীন পরম্পরা অনুযায়ী মহারাজ রাজধর নিষ্ঠার সহিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত গ্রন্থ নিত্য শ্রবণ করতেন। তর্পণ, ব্রাহ্মণসেবা, গো-সেবা, পূজাপার্ব্বণ ইত্যাদি নিয়মিত পালিত হত। তুলাপুরুষ দান, ষোড়শদান, দেবালয় নির্মাণ, জলাশয় খনন ইত্যাদি করে তিনি চিরস্মরণীয় হয়েছেন।

ত্রিপুরার এই রাজার মানসিক পরিবর্তনের খবর গুপ্তচর মুখে শুনে মোগল শাসক ত্রিপুরাকে আক্রমণ করে বসল। রাজধর তখন বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডেকে-ডেকে নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। সেনাপতি চন্দ্রদর্প নারায়ণের নেতৃত্বে সৈন্যবল প্রেরণ করেন। কৈলাগড়ে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল এবং মোগল বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হল।

গোমতী নদীর উত্তর তীরে অনুচ্চ টিলাভূমিতে এক সুরম্য মন্দির নির্মাণ করা হল রাজধরের আন্তরিক আগ্রহে। রাজা স্বহস্তে তাহা বিষ্ণুপ্রীতে উৎসর্গ করেন। তিনি মন্দিরে গিয়ে নিত্য হরিনাম সংকীর্তন করতেন, প্রদক্ষিণ করতেন, পাদোদক গ্রহণ করতেন। ধর্মপ্রাণ রাজা রাজধর হরিনাম কীর্ত্তনে বিহ্বল অবস্থায় গোমতীর জলে নিমজ্জিত হয়ে দেহত্যাগ করেন। ইহা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ❑

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ

শিবানন্দ গিরি মহারাজের আদি ইতিহাস জানা সম্ভব হয় নি। তিনি খণ্ডলে ও বিলোনীয়া নগরে দীর্ঘকাল সাধন-ভজন করেছিলেন। তাঁর পূর্ব পরিচয় অজানা রয়ে গেল। তাঁর আয়ুষ্কাল আনুমানিক ১৮১৯ খৃঃ-১৯৩৯ খৃঃ।

বিলোনীয়া নগর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দক্ষিণে ফুলগাজি নামক জনপদ হল বাণিজ্যকেন্দ্র। আরো দক্ষিণে হল ফেনী নগর। ফুলগাজি জনপদের অন্তর্গত সাহা পাড়া নামক পল্লীতে বর্ধিষ্ণু সাহাদের বদান্যতায় প্রাপ্ত ভূমিতে বহিরাগত, নবাগত, তরুণ সন্ন্যাসী শিবানন্দ গিরি একটি আশ্রম গড়েন। কখন আশ্রম গড়লেন ? এই প্রশ্নের উত্তর অজানা। অনুমান করা যায় যে ইহা সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্তী কালের ঘটনা। এমনও হতে পারে যে, তিনি সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খৃঃ) অন্যতম বীর সৈনিক ছিলেন। ঐ মহাবিদ্রোহ কঠোর হাতে নির্মম রূপে দমিয়ে ফেলে বৃটিশ শাসন বহু সৈনিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করল। তখন অবস্থা বেগতিক দেখে, এই স্বাভিমানী যুবক সাধু হয়ে যান। আত্মপরিচয় গোপন রাখা একান্ত আবশ্যক বিধায়, তিনি এবিষয়ে কাউকে কিছু বলেন নি। এমন অনুমানের পশ্চাতে আরেকটি যুক্তি হল এই যে, তিনি যদি প্রথমেই সাধু হতেন, তাহলে তিনি গুরুগৃহে মাঝে-মধ্যে যেতেন এবং গুরু আসতেন শিষ্যের আশ্রমে। এধরণের দ্বিপাক্ষিক যাতায়াত ঘটে নি।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, শিবানন্দ গিরি ছিলেন দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান। তাঁর গায়ের রং ছিল ফর্সা। তিনি নিরামিষ ভোজন করতেন, তামাক সেবন করতেন। কৌপিন মাত্র পরিধান করতেন। শেষ বয়সে চর্বি জমে মোটা ভুঁড়ি হয়েছিল। আশ্রমে কেউ এলে খুশী হতেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় একাকী থাকতেন। শিষ্য সংখ্যা বাড়ানো, শাস্ত্র পাঠ করা, ধর্মসভাতে প্রবচন দেওয়া, সমাজ সংস্কার করা, গান-বাজনা করা, বই পুস্তক লেখা, তীর্থ পর্যটন করা - এসবের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। ভিক্ষা করতেন না, গাই-বাছুড় পালন করতেন না। আকাশবৃত্তি ছিল তাঁর জীবন ধারণের উপায়।

তাঁর শিষ্য সংখ্যা অতীব নগণ্য। নাই বললেই চলে। মাত্র দুই জন তাঁর শিষ্য হয়েছিল। একজন হলেন হরানন্দ ব্রহ্মচারী। হরানন্দ ব্রহ্মচারী জনসমাজে হরিমোহন সাধু নামে পরিচিত ছিলেন। হরিমোন সাধু (আঃ ১৮৮৫ খৃঃ-১৯৮১ খৃঃ) দীর্ঘকাল থাকেন নি গুরুর নিকট। এরপর এক স্বামীহারা বিধবাকে তিনি প্রতিপালন করেন। সেই মহিলা শেষ জীবন অবধি গুরুর সেবাযত্ন করেছেন। সেই সেবিকা জনসমাজে গঙ্গার মা নামে পরিচিতা।

ভারত বিভাজনের আগে থেকেই পাকিস্থানের দাবী প্রতিষ্ঠাকল্পে মুসলমানরা বহু হামলা চালিয়েছিল হিন্দুদের উপর। সেই ব্যাপক, বিধ্বংসী হামলা থেকে নোয়াখালী,

খণ্ডল প্রভৃতি জনপদ রক্ষা পায় নি। তখন শিবানন্দজী অতি বৃদ্ধ। ভক্তদের অনুরোধে ও আগ্রহে ১৯৩৬ সালে তিনি বিলোনীয়া নগরে আসেন। বিলোনীয়া আসার পর, আশ্রমিক কাজে তাঁকে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। তন্মধ্যে চন্দ্রমাধব বাবু, গিরীশ বাবু, নলিনী রঞ্জন বাবু ছিলেন মুখ্য। এছাড়া শিষ্যা গঙ্গার মা তো ছিলেনই নিত্য সেবায়।

শিবানন্দ গিরির অন্তিমকালের দুইটি ঘটনা বিলোনীয়াবাসী জনতাকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করেছিল। প্রথমটি হল - তাঁর ইচ্ছা মৃত্যু বরণ এবং দ্বিতীয়টি হল অন্তিম সংস্কার করতে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর আগমন। তিনি কয়েকমাস আগেই জানিয়েছিলেন কবে দেহরক্ষা করবেন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর একজন সাধু আসবেন; তাঁরই নির্দেশ অনুসারে মৃতদেহের সৎকার করা যেন হয়। তাঁর পূর্ব ঘোষিত দিনটি হল শনিবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৪৫ বাংলা, শুক্ল পক্ষ। শ্রী পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা হয়। সরস্বতী পূজার অব্যবহিত পরেই দেহরক্ষা করার সংকল্প। খৃষ্টাব্দের হিসাবে জানুয়ারী ১৯৩৯ খৃঃ।

পূর্ব ঘোষিত সময়সূচী জানা থাকাতে অগণিত ভক্ত বিলোনীয়া ও খণ্ডল পরগণা থেকে আসতে থাকে। সারা আশ্রম লোকে লোকারণ্য। শুভদিনে শুভক্ষণে শিবানন্দ গিরি আসনে বসলেন এবং ইষ্টনাম জপ করতে থাকেন। ভীষ্ম-অষ্টমী তিথিতে, মাঘের শুক্লপক্ষে রাত্র ১০টা ১৮ মিনিটে শিবানন্দ গিরি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাজার-হাজার ভক্ত সারা রাত নাম কীর্তন করল।

পরদিন ভোরে জনৈক দীর্ঘদেহী, গেরুয়াধারী, হিন্দীভাষী সন্ন্যাসীর শুভাগমন ঘটল। স্থানীয় ভক্তরা এই নবাগত সাধুকে আগে কোন দিন দেখেনি। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী শিবানন্দের নশ্বরদেহ সমাধিস্থ করা হল। পরক্ষণেই নবাগত সাধু অদৃশ্য হলেন।

শিবানন্দ গিরির প্রথম জীবন রহস্যাবৃত। তাঁর পরবর্তী জীবন দর্পনের মত স্বচ্ছ। তিনি কোন বিরাট আশ্রম, বড় সেবাপ্রকল্প, অগণিত ভক্ত, কর্মবীর শিষ্যবর্গ রেখে যান নি। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদি ছিল না। তাঁর চিন্তার জগৎ সীমিত ছিল। আশ্রমিক জীবন দেখে বিচার করলে, তাঁকে কর্মবীর বলা যায় না। ভোলার ভক্ত, ভোলানাথ সদৃশ্য ছিলেন শিবানন্দ গিরি। তাঁর চক্ষুকে উন্মীলিত করে দেবার মত গুরুর সান্নিধ্য তিনি পান নি। পরবর্তীকালে, তাঁর নিকট হরানন্দ ব্রহ্মচারী এলেন। হরানন্দকেও তিনি সিংহবিক্রমে মহৎ কিছু করার প্রেরণা দিতে পারেন নি। ফলে কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল [illegible] হয়েই বিলীন হয়ে গেল দুইটি তেজস্বী সন্তান। ❑

আচার্য আনন্দ স্বামী

সমতল ত্রিপুরার চাকলা রোশনাবাদে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার কালীকচ্ছ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আনন্দচন্দ্র নন্দী। তাঁর পিতার নাম রামদুলাল নন্দী। তাঁর আবির্ভাব তিথি হল ১১ই বৈশাখ, ১২৩৯ বঙ্গাব্দ।

রামদুলাল নন্দী (১৭৮৫-১৮৫২ খৃঃ) ছিলেন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ; সংস্কৃত,বাংলা,ফার্সী ভাষায় যথেষ্ঠ জ্ঞান ছিল। তিনি ত্রিপুরার রাজার রাজকর্মচারী ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ রাজা কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য (১৮৩০-১৮৪৯খৃঃ) তাঁকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ''রায়'' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ,সৎ,সাধক,ভক্তিগীতি রচয়িতা। তিনি এতই গুরুভক্তি পরায়ণ ছিলেন যে, সমস্ত ঘর, বাড়ী. পুকুর, ভূমি দানপত্র করে গুরুকে দিয়ে দেন। তিনি সাধক রামদুলাল নামে বেশী পরিচিত ছিলেন।

আনন্দ চন্দ্র নন্দী ছিলেন বহু ভাষাবিদ্; সংস্কৃত, বাংলা. হিন্দী, উর্দু, পার্সী, ইংরাজী ভাষায় তিনি পন্ডিত ছিলেন। তিনি প্রথমে শাক্ত মতাবলম্বী ছিলেন। পরে তাঁর মত-পরিবর্তন হয়। তিনি ব্রাহ্ম-মতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়(১৭৭২-১৮৩৩খৃঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজ কলিকাতাতে সর্ব প্রথম স্থাপিত হয় ১৮২৮সালে, ঢাকাতে স্থাপিত হয় ৬.১২.১৮৪৬ সালে; ব্রজসুন্দর মিত্র কর্তৃক কুমিল্লাতে স্থাপিত হয় ৫ই পৌষ ১২৬০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯.১২.১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেন, আনন্দমোহন বর্ধন প্রমুখ সাধকদের দ্বারা কালীকচ্ছে ব্রাহ্মমত প্রচারিত হয়েছিল। আনন্দ চন্দ্র ও কৈলাস চন্দ্র নন্দী ব্রাহ্ম মতের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আনন্দ চন্দ্র গ্রামের বাড়ীতে আমবাগানে গাছতলে বসে দিন রাত সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি ভগবানকে ডাকতেন ''দয়াময়'' বলে। তিনি কয়েকটি গান রচনা করেন এবং সর্বধর্ম সাধন প্রণালী লিখেছেন। তিনি গৃহী ছিলেন। তাঁর তিরোধান দিবস হল ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ বাংলা।

মহেন্দ্র চন্দ্র হলেন রামদুলালের পৌত্র,এবং আনন্দ চন্দ্রের পুত্র। মহেন্দ্র চন্দ্র ছিলেন চিকিৎসক, নিষ্ঠাবান সাধক, অতিথিবৎসল, সমাজসেবক। প্রত্যহ ভোরে প্রাতঃকৃত্য, জপতপ, আরতি, কীর্তন করে অতঃপর চিকিৎসা করতেন। তিনি প্রথিতযশা চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসা করে যত টাকাই পেতেন দিনান্তে সবটাকাই খরচ করে ফেলতেন। এইখরচের একটা বড় অংশ যেত অতিথি সেবাতে ও পরহিতব্রতে।

আনন্দ স্বামী(১৮৩২-১৯০০খৃঃ)কর্তৃক প্রবর্তিত আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে লবচন্দ্র পাল (১৮৮২-১৯৬৬)গড়েন সর্ব ধর্ম মিশন। আগরতলার দক্ষিণ প্রান্তে অরুন্ধুতি নগরে অবস্থিত সর্বধর্ম মিশন লব বাবুরই কীর্তি। ❑

মোহন দাস ব্রজবাসী গোস্বামী

মোহন দাস ব্রজবাসী গোস্বামী আগরতলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকস্থ টাকারজলা ও জম্পইজলা নামক দুই বৃহৎ জনপদের প্রায় মধ্যবর্তী গ্রাম দেবচরণ বৈরাগী পাড়া নামক পার্ব্বত্য পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলই নামক ত্রিপুর- ক্ষত্রীয় বংশোদ্ভুত। তিনি প্রায় ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছে,আনুমানিক ১৮৪১ খৃষ্ঠাব্দে; তাঁর মহাপ্রয়াণ হল ১৯৪৬ খৃষ্ঠাব্দে। ১৯৪২খৃষ্ঠাব্দে মহারাজ বীর বিক্রম জম্পইজলা পরিদর্শনে এসেছিলেন; এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর মোহনদাস দেহত্যাগ করেন।

মোহন দাস বাল্যশিক্ষা পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি গৃহী ছিলেন। তাঁর এক স্ত্রী, তিন পুত্র এবং এক কন্যা ছিল। বাল্য, কৈশোর, যৌবন পর্যন্ত তিনি সাধারণ গৃহীর মতই গৃহস্থ জীবন, তথা জুমিয়া কৃষকের জীবন যাপন করেন।

শ্রীমৎ সর্ব্বানন্দ দাস ব্রজবাসী গোস্বামী হলেন মোহন দাসের দীক্ষাগুরু। প্রভু সর্ব্বানন্দ দাস হলেন জমাতিয়া নামক ত্রিপুর-ক্ষত্রীয় বংশোদ্ভুত। গুরুর কৃপা লাভ করে মোহন দাস সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেন এবং উত্তর-ভারতের নানা তীর্থ পর্যটন করেন।

তীর্থপর্যটন করে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন। মোহন দাস শাস্ত্র আলোচনায়,তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনায় আনন্দ পেতেন। তাঁর শিষ্য সংখ্যা ছিল প্রায় দুই শত। শিষ্যরা ছিল কলই,জমাতিয়া, ত্রিপুরী ও নোয়াতিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। এই পদ্ধতি হল জাতীয় সংহতি বিধানের প্রকৃষ্ট পন্থা।

মুরারী দাস ব্রজবাসী গোস্বামী প্রভু এবং মানিকদাস ব্রজবাসী গোস্বামী প্রভু হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম স্থাপনের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। আশ্রমটি জম্পইজলা নামক বৃহৎ জনপদের অন্তর্গত দেবচরণ বৈরাগী পাড়াতে অবস্থিত। ইহার প্রতিষ্ঠা সন আনুমানিক ১৮৯০ খৃষ্ঠাব্দ। মুরারী দাস ও মানিক দাসের তিরোধানের পর এই আশ্রমের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন মালাকতর হীনদাস, কৃষ্ণদাস, বুদ্ধা, সতীপ্রিয়া, চিত্তপ্রসাদ, হরিবন্দু, মাথুলুক, রামানন্দ দাস, মোহনদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনরা। প্রায় শতবর্ষ পরে এই আশ্রমের ঐতিহ্য রক্ষা করছেন ভক্তহরিদাস ব্রজবাসী গোস্বামী, শক্তিদাসী পূজাহরি, শক্তি কুমার কলই, শক্তমনি কলই। ❑

দয়াল গুরু হীনদাস সিদ্ধান্তরী

দয়াল গুরু হীনদাস সিদ্ধান্তরী জন্ম গ্রহণ করেন সনাতন ঠাকুর পাড়া নামক এক পার্ব্বত্য পল্লীতে, ইহা আগরতলা নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত টাকার জলা ও জম্পই জলা নামক দুই বৃহৎ জনপদের আশে-পাশে।তাঁর পিতার নাম ঠাকুর সনাতন দেববর্ম্মা। সনাতন ঠাকুর ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে ''ঠাকুর''উপাধি প্রাপ্ত হন,তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বৈভবের স্বীকৃতি স্বরূপ।

পূর্ব্বাশ্রমে তথা গৃহস্থ জীবনে হীনদাসের কি নাম ছিল,তা জানার মত পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করা হয় নি। বিগত শনিবার ২১শে মাঘ, ১৪০২ বাং (৬.১.১৯৯৬ ইং) জম্পইজলার অন্তর্বতী শ্রীগৌরাঙ্গ আশ্রমে গিয়ে পঞ্চশ্রী ভক্ত হরিদাস ব্রজবাসী গোস্বামী, শক্তিমনি কলই এবং শক্তিদাসী পূজাহরি-এর কাছ থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া গেল, তাতে বলা হয়েছে হীনদাস প্রায় ৮০ বৎসর জীবিত থেকে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

এই হিসাব অনুসারে তিনি আনুমানিক ১৮৫৭ খৃষ্ঠাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যশিক্ষা পর্যন্ত পড়াশুনা করেন এবং যৌবনে বিবাহ করে জুমিয়া কৃষকের জীবন যাপন করেন কয়েক বৎসর। তাঁর এক স্ত্রী এবং এক পুত্র ছিল।

হীনদাসের দীক্ষাগুরু কে তাও জানা যায় নি। তবে তিনি শাক্ত মতে দীক্ষিত ছিলেন এবং অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন। তিনি জম্পইজলা ও টাকার জলা এলাকায় বাড়ী-বাড়ী ঘুরে বেড়াতেন, প্রকৃত ভক্ত পেলে কথা বলতেন; নচেৎ কম কথা বলতেন।

পথিকৃৎ মুরারীদাস ব্রজবাসী গোস্বামী ও মানিকদাস ব্রজবাসী গোস্বামী কর্তৃক স্থাপিত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম(আঃ১৮৯০ খৃঃ) হয়ে উঠেছিল বহু সাধুসন্তদের আশ্রয়স্থল। হীনদাস সিদ্ধান্তরী এই আশ্রমেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি বড়-বড় রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ধারণ করতেন। তাই তাঁর ডাকনাম ছিল মালা কতর। ত্রিশূলকে মাটিতে পুঁতে সোজা খাড়া রেখে ত্রিশূলের গলায় সেই মালা রাখতেন। লোক বিশ্বাস, সাধন বলে সেই জপমালা আপমা-আপনি আবর্তিত হত। ভূত প্রেত, অপদেবতা তাঁর বশীভূত ছিল বলে লোকবিশ্বাস।

তিনি সহজে কাউকে দীক্ষা দিতেন না। উপযুক্ত পাত্র না পেলে, যত্র তত্র, যাকে-তাকে মন্ত্র দেবার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। যতদূর জানা যায়, তিনি মাত্র দুই জনকে

মন্ত্র দিয়ে গেছেন ।একজন হলেন শ্যাম রায়,অন্যজন হলেন বৃহদাস সিদ্ধান্তরী। শ্যামরায় শেষ কালে গুরুর সেবা যত্ন করে ছিলেন, এবং ভক্ত হরিদাস ব্রজবাসী গোস্বামী মৃত্যুকালে গীতা ও ভাগবত পাঠ করে শুনান। মালা কতর শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং এই আশ্রমেই তাঁকেসমাধি দেওয়া হয়। ❑

বসন্ত সাধু

সমতল ত্রিপুরাতে, চাকলা রোশনাবাদে,কুমিল্লার ত্রিশ গ্রাম নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন বসন্তকুমার দেব। তিনি ১২৬৭ বঙ্গাব্দে, আশ্বিন মাসে,মহাষ্টমী তিথিতে (১৮৬০ খৃঃ) ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

তিনি কর্মসূত্রে কলিকাতা ছিলেন কিছুকাল। সেখানেই একটি বিশেষ পুস্তক-পাঠ করে তিনি অতীব প্রভাবিত হয়েছিলেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ(১৮৪০-১৯১১ খৃঃ) কর্তৃক রচিত অমিয় নিমাই চরিত নামক গ্রন্থখানি তঁর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি বিবাহিত ছিলেন। স্বামী -স্ত্রী উভয়ে সেই গ্রন্থখানি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন। জন্মভূমি কুমিল্লাতে ফিরে এসে এই দম্পতি কেবলই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দর্শন পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হতেন। প্রায়ই ভাব-সমাধিতে থাকতেন। ক্রমে-ক্রমে তাদের ভক্ত-শিষ্য হতে থাকে। ত্রিশ গ্রামে বিশাল কীর্তন ও ভক্ত সম্মেলনের আয়োজন করা হল।

তাঁর প্রেরণায় নানা গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্মাশ্রম স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর আমন্ত্রণে নবদ্বীপ ধাম থেকে হরিদাস গোস্বামী প্রভু একবার ত্রিশগ্রাম বেড়াতে আসেন।বসন্ত সাধুর দ্বারা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব প্রচার ব্যাপক রূপ নিয়েছিল ত্রিপুরার পশ্চিম প্রান্তে। শ্রী হরিচরণ আচার্য (১৮৬১-১৯৪১খৃঃ) ছিলেন সমতল ত্রিপুরার বিখ্যাত কবিয়াল। তাঁর রচিত কবিতাসমূহ 'কবির ঝঙ্কার' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে নরসিংদী থেকে। এই বিখ্যাত কবিয়াল স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নিজ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন বসন্ত সাধুর করকমলে। উৎসর্গপত্রে শ্রদ্ধেয় কবি বলেন যে, বসন্ত সাধুর প্রভাবেই এই সব ভক্তিগীতি রচনা ও গানের আসরে পরিবেশনা সম্ভব হয়েছে।

বিগত ৩১শে শ্রাবণ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১৯২৩ খৃঃ) বসন্ত সাধু পরলোক গমন করেন। ❑

গৌর কিশোর

সমতল ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তে, খন্ডল পরগনা অবস্থিত। খন্ডলের দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ ধর্মপুর নামক গ্রামে বাস করতেন গৌর কিশোর। গৌর কিশোরের জন্ম দিন ও মৃত্যু দিন সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তাঁর আবির্ভাব কাল হল আনুমানিক ১৮৭০ খৃঃ এবং তিরোভাব কাল হল আনুমানিক ১৯৪০ খৃঃ।

গৌর কিশোর-এর বংশ পরিচয় স্বল্পজ্ঞাত। এই পরিবারকে বলা হত স্থানীয় ভাষায় হাউল্যা। হালুয়া নামক মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারককে বলা হয় হালুইকর। হালুইকর শব্দটি অপভ্রংশ হয়ে লোকমুখে হল হাউল্যা। তাই তিনি গৌরকিশোর হাউল্যা নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কাগজে-পত্রে লেখার সময় গৌর কিশোর মজুমদার নামে পরিচিত ছিলেন।

গৌর কিশোর বিবাহিত ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম আশুতোষ। আশুতোষের পুত্রের নাম দেবেন্দ্র ও কৃপাসিন্ধু। ভারত বিভাজনের অব্যবহিত পরেই দেবেন্দ্র ও কৃপাসিন্ধু জোলাইবাড়ী আসেন। গৌরকিশোর ও আশুতোষ দক্ষিণ ধর্মপুরে মারা যান।

গৌর কিশোর সৎ,ধর্মভীরু,অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পুত্রের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, পরিবারের দায়িত্ব পুত্র ও পুত্রবধুর হাতে সমর্পণ করে নবদ্বীপে চলে যান। বেশ কয়েক বৎসর নবদ্বীপে হরিনাম কীর্তন করে এবং ভিক্ষা করে দিন কাটাতেন।

কিসের আকর্ষণে তিনি নবদ্বীপে গেলেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে শ্রী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর(১৮৩৮-১৯১৪খৃঃ) এবং প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী (১৮৭৪-১৯৩৭ খৃঃ)-এই দুই মহাপুরুষের অসামান্য অবদান আলোচনা করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৩)তিরোভাবের পর গৌড়ীয় গগনে অন্ধকার যুগ নেমে এল। বহু অপসম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল,যেমন আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশী, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী প্রভৃতি। বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সব অপসম্প্রদায়ের গর্হিত আচরণ দেখে মহাপ্রভুর দর্শনকে ভুল বুঝতও অপছন্দ করত। অসাধারণ প্রতিভাধর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায় শতেক গ্রন্থ রচনা করে অপসম্প্রদায়ের মত খন্ডন করেন এবং মহাপ্রভুর মতামত প্রচার করেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন শুদ্ধভক্তির পরাকাষ্ঠা,অসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং বিচক্ষণ সংগঠক। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন, বহু মঠ-মন্দির স্থাপন করেন এবং বিশুদ্ধ ভক্তি আন্দোলন গড়ে তুলেন। তিনি

১৯১৮খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন। এই দুই মহাত্মার অক্লান্ত শ্রমে ভক্তি-আন্দোলন নব রূপ লাভ করল,পুনর্জীবিত হল।

গৌর কিশোর সেই আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী থেকে কতিপয় নিষ্ঠাবান ভক্ত আগে-পরে গিয়েছিলেন নবদ্বীপে। নবদ্বীপ, নীলাচল ও বৃন্দাবন-এই তিন স্থান ভক্তি আন্দোলনের পীঠস্থানে পরিণত হল। গৌর কিশোর অন্তরের বৈরাগ্য ভাববশতঃ সুখ-স্বাচ্ছন্দ ছেড়ে অকিঞ্চন জীবনের দিকে পা বাড়ালেন। গৌর কিশোর ছিলেন সরস্বতী ঠাকুরের সমসাময়িক।

বেশ কয়েক বৎসর নবদ্বীপে থাকার পর তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হলেন পিতৃগৃহে ফিরে যেতে এবং খন্ডলে প্রেমধর্ম প্রচার করতে। সেই আদেশ শিরোধার্য করে তিনি জন্মস্থানে এলেন। নিরামিষ ভোজন করতেন। বাড়ীতে-বাড়ীতে কীর্তন করতেন। ভক্তরা অনুভব করত গৌর কিশোরের আন্তরিক নিষ্ঠা, শুদ্ধ আচার ও অমায়িক ব্যবহার। তিনি যে পেটের দায়ে, অভাবের কারণে ভিখারী নন, সেটুকু লোকে জানত। তিনি বৃদ্ধ বয়সে নাতি দেবেন্দ্রকে কিংবা কৃপাসিন্ধুকে সংগে নিতেন দূরবর্তী গ্রামে গেলে। হরিনাম করতে-করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ❑

শ্রীশ্রী মহাত্মা নকুল সাধু

পূর্ব্ব বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামক বিখ্যাত জনপদে, ভিটাডুবি নামক গ্রামে নিমাইচান্দ বণিক ও ঈশ্বরী বণিক নামক দম্পতি বাস করতেন। তাঁদের ছিল এক পুত্র এবং দুই কন্যা ; ইহাদের নাম হল যথাক্রমে নকুল, রত্নাময়ী ও মুক্তাময়ী। নকুলের জন্মতিথি হল শুক্রবার, ১১ই কার্ত্তিক,১২৭৮ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ১৮৭১খৃঃ।

আগরতলা থেকে প্রায় ৩০ মাইল পশ্চিমে -উত্তরে হল ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। ইহার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে মেঘনা নদী প্রবাহিত, পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়ে তিতাস নদী প্রবাহিত। ত্রিপুরার রাজাদের বদান্যতায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণের নিবাস গড়ে উঠেছিল। ইহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। নিমাইচান্দ বণিক ছিলেন ব্যবসায়ী, সৎ, ধার্মিক এবং বৈষ্ণব। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সতী, সাধ্বী, দয়ালু, অতিথি সেবাপরায়ণা। বিবাহের বেশ কয়েক বৎসর পর অনেক সাধন-ভজনের পর পুত্রলাভ করেন এই বণিক দম্পতি। জন্মকালে পুত্র নকুলের ছিল পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, পূর্ব্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র, সিংহ লগ্ন, সিংহ রাশি, শুক্রবার। কুষ্ঠী তৈরী করেছিলেন রাজ্যেশ্বর আচার্য। শৈশবে ক্রন্দনরত অবস্থায় ''রাধাগোবিন্দ'' নাম শুনালে নকুলের কান্না থেমে যেত।

নকুলের বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে পিত্রালয়ে। বাড়ীতেই প্রথম অক্ষর জ্ঞান লাভ হল। তখনই মেধার পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু বালক বড়ই দুরন্ত; খেলায় , নাচে, গানে প্রচন্ড নেশা। অতঃপর নবম বর্ষ বয়সে নকুলকে নিয়ে যাওয়া হল মেড্ডা নামক গ্রামে, মাতুলালয়ে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নগর থেকে২ মাইল উত্তরে হল মেড্ডা। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে হল অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয়। মাতুল বাড়ীতে তিনি পড়াশুনা করেছেন এবং১২৯৪বঙ্গাব্দে উচ্চ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার সমাপ্তি এখানেই হল।

অর্থ উপার্জনের জন্য নকুল কোন কালেই আগ্রহী ছিলেন না। বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যতটুকু প্রয়োজন তাতেই তিনি তুষ্ট ছিলেন। উদ্দেশ্য ও উপায় যেন সৎ হয় সেদিকে তিনি অত্যন্ত সজাগ। শটতা, প্রবঞ্চনার ধারে-কাছে তিনি ছিলেন না। যাই হোক্ , মেড্ডাতে তিনি গ্রাম্যপাঠশালা স্থাপন করে গৃহ শিক্ষকতা শুরু করেন। তাঁর পাঠদান এত উন্নতমানের ছিল যে,সেখানে যে ভর্ত্তি হত, সেই ভাল ফল করত। তাঁর পাঠশালার সুনাম চারিদিকে ছড়াল ; কেউ-কেউ ইহাকে অর্থদান দিয়ে পাকা দালান কোঠা নির্মাণের প্রস্তাব দিল। কিন্তু নকুল বিনম্রভাবে সে সব অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কিছু

কাল পর, পাঠদানে তাঁর অনীহা দেখা দিল। তাঁর মুখে কেবলই হরিনাম আসে, পাঠ্যবিষয় আসে না। তাই তিনি বিদ্যার্থীদের বিদায় দিয়ে,পাঠশালা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর পিতৃগৃহে ফিরে যান এবং পিতার ব্যবসায়ে মন দেন। বাবাকে বিশ্রাম দিয়ে যুবক পুত্র পিতার কাজ নিজ হাতে নিলেন।

সততার সুবাদে এবং ন্যায্য মূল্য বশতঃ তিনি যে সব দ্রব্য বাজারে নিতেন, সে-সবই বিক্রয় হয়ে যেত। কিন্তু কিছু দিন পরই, সেই পুরাতন ভাবাবেশ পেয়ে ব্যবসা বন্ধ হল।

পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং গুরুর আদেশে, চাপের মুখে নকুল বিবাহ করতে সম্মত হন। ত্রিপুরা জিলার নবীনগর থানা নিবাসী ধনাঢ্য কৃষ্ণ মঙ্গল বণিক মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা সর্ব্বসুন্দরী বণিক হলেন নকুলের স্ত্রী, কাল ক্রমে এই দম্পতির গৃহে তিন পুত্র জন্মিল। পুত্রদের নাম হল-অখিল, সতীশ, রাধামাধব। ডাঃ রাধামাধব বণিক আগরতলায়, রামনগরে বাস করতেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এই প্রতিবেদন লিখিত হল। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৮৯১খৃঃ) নকুল জন্মস্থান ছাড়লেন। বাড়ীর সকলকে নিয়ে গেলেন মেড়্ডা গ্রামে। পৈত্রিক বাড়ীঘর বিক্রয় করে, মেড়্ডা গ্রামে নতুন করে ঘরবাড়ী ক্রয় করে নিলেন। তখন নকুলের বয়স বিশ বৎসর মাত্র। তখন তিনি বিবাহিত।

নকুল ছিলেন নিত্যসিদ্ধসাধক। তিনি এই ধরাধামে মাত্র ৫৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর আয়ুষ্কাল ১৮৭১খৃঃ থেকে ১৯২৪ খৃঃ পর্যন্ত। তাঁর সমসাময়িক আরেক মহাপুরুষ এই পূর্ববঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর নাম প্রভু জগবন্ধু (১৮৭১-১৯২১ খৃঃ)। উভয়ের মধ্যে প্রীতি ছিল। উভয়েই হরিনামে বঙ্গবাসীকে মাতোয়ারা করতে, আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে বিশ্বে শান্তি আনতে, হরিবিমুখ বিষয়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করতে প্রাণপাত করেছেন।

মাতুলালয়ে যাবার অব্যবহৃতি পরেই, ভক্ত প্রহ্লাদের জীবনচরিত অবলম্বনে যাত্রাগান পরিবেশিত হয়েছিল ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে। প্রহ্লাদের উপর অকথ্য অত্যাচারের দৃশ্য দেখে বালক নকুল রাগে-দুঃখে কান্নায় অস্থির হয়ে রাত্রেই একাকী যাত্রাস্থল ত্যাগ করেন। গভীর রাত, দুই মাইল পথ, একা যাবেন মেড়্ডা। পথে এক বটগাছ তলে সাক্ষাৎ পেলেন জনৈক সাধুর। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হল। সাধুর অপার করুণা, বালকের গভীর শ্রদ্ধা একাকার হল। এই সন্ন্যাসীর মহিমা, কৃপা ও আদেশ-উপদেশ বালকের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। নকুল এক স্থানে স্থির হয়ে বসে নীরবে সাধনা করেন নি। তিনি কীর্তনের দলবল নিয়ে নানা স্থানে, বহু হরিসভায় হরিনাম কীর্তন করেছেন। হরিনাম প্রচারে তিনি তৃণের মত বিনয়ী, কুসুমের মত কোমল, বায়ুর মত নিত্য প্রবহমান ছিলেন। কিন্তু কেউ হরিনামের, রামের, কৃষ্ণের নিন্দা করলে, তিনি বজ্রের মত কঠোর ছিলেন।

দুইটি ঘটনার কথা প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে। শিলচরের দারোগা রজনীবাবু ছিলেন হরিবিমুখ কুতর্কী। দয়ানন্দ স্বামীর আত্মীয় সুগন্ধী গ্রাম নিবাসী সুরেন্দ্র রায় ছিলেন হরিনিন্দুক। তিনি উভয়কে পদাঘাত করে ছিলেন। তিনি অনিমা, লখিমা প্রভৃতি সিদ্ধিতে সিদ্ধ ছিলেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রভু জগবন্ধু নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি গম্ভীরাতে থাকতেন। সেখানে কেহ প্রবেশ করতে পারত না। নকুল সাধু দলবল নিয়ে ফরিৎপুরে যান, বাইরে প্রাঙ্গণে সকলে কীর্তন করছিল। তখন তিনি সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশ করে প্রভুর সাথে কথা বলেন। পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ যেমন প্রায়ই সমাধিস্থ হতেন, নকুল সাধু তদ্রুপ সমাধিস্থ হয়ে বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যেতেন। একমাত্র হরিনাম কীর্তন কানে শুনলেই তিনি প্রকৃতিস্থ হতেন। তেরশত বৎসরের বিদেশী বিধর্মী শাসনে, হিন্দুধর্ম বাহির থেকে ও ভেতর থেকে আঘাতে-আঘাতে বিপর্যস্ত হচ্ছিল, তখন নকুল সাধু দিয়ে গেছেন সনাতন ধর্মের প্রতি গভীর ভক্তি বিশ্বাস। তাঁর তিরোভাব তিথি হল ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ, সোমবার (১৯২৪ খৃঃ)। ❑

শ্রীমৎ বৈকুণ্ঠ গোস্বামী

সমতল ত্রিপুরায়, চাকলা রোশনাবাদে, মুরাদনগর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন শ্রীমৎ বৈকুণ্ঠ গোস্বামী। তাঁর জন্ম তিথি হল ২রা অগ্রহায়ণ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৭১ খৃঃ। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অনিলধন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত শাশ্বত ত্রিপুরা নামক গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্য হল এই নিবন্ধের উৎস।

তিনি শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কুমিল্লার পশ্চিমে মুরাদনগরের কৃষ্ণপুর গ্রামে অতিবাহিত করেন। গ্রাম্য পাঠশালাতেই পড়াশুনা সেরে ঢাকা নগরে মহাবিদ্যালয়ে কিছুদিন লেখাপড়া করেছেন। মেধাবী বৈকুণ্ঠ অতঃপর কলিকাতাতে গিয়ে শিবপুরস্থিত কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু কারিগরী বিদ্যায় স্নাতক হন নি। কোন দিব্য অনুভূতি বশতঃ তিনি কারিগরী বিদ্যার পড়াশুনা ছেড়ে, গ্রামের বাড়ীতে আসেন এবং মুরাদনগর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু শিক্ষাদান বেশীদিন করেন নি। শিক্ষকতা ছাড়লেন ঐ একই দিব্যানুভূতি বশতঃ।

কৃষ্ণপুরে পৈত্রিক ভিটামাটিতে ফিরে এলেন। বাড়ীর পুকুরপাড়ে ছিল বিশাল বেলগাছ। সেই বিল্ববৃক্ষ মূলে বেদী তৈরী করে সাধন-ভজনে রত হন। কালক্রমে সেই বিল্ববৃক্ষমূল পরিচিত হল কৃষ্ণপুর সিদ্ধাশ্রম নামে। তাঁর অতিথিপরায়ণতা ছিল অত্যধিক। প্রায় প্রতিদিন অতিথি সেবা করাতেন তিনি। অথচ অর্থবিত্ত তেমন কিছু ছিল না। দীর্ঘ সাধনা দ্বারা তিনি যে উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন তার মর্মার্থ হল সৌভ্রাতৃত্ব। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবিশ্বাস যদি জীবেপ্রম জাগায় সাধকের মনে ও আচরণে, তবেই হবে সাধনার পূর্ণতা প্রাপ্তির পরিচয় বা প্রমাণ। জাতিধর্ম, বর্ণবংশ নির্বিশেষে বৈকুণ্ঠ সাধু মানুষকে ভালবাসতেন। তাঁর মূলমন্ত্র হল প্রীতিঃ হি পরমং সাধনম্। ❑

ভৈরব নট্ট

সমতল ত্রিপুরার খণ্ডল পরগণাধীন মামদপুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ভৈরব নট্ট। ভৈরবের জীবনী স্বল্পজ্ঞাত। তাঁর জন্ম আনুমানিক ১২৮৫ বঙ্গাব্দে এবং মৃত্যু আনুমানিক ১৩৫২ বঙ্গাব্দে; খৃষ্টাব্দের হিসাবে তাঁর সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল হল ১৮৭৮-১৯৪৫ খৃঃ।

ভৈরব নট্ট সম্বন্ধে তথ্য দিয়েছেন শ্রী নির্মল চন্দ্র রায় (৩রা আশ্বিন, ১৩২৭-) এবং মনীন্দ্রকুমার মানিক (১৩রা ফাল্গুন ১৩৩৫—)। উভয়েই প্রতিবেশী ছিলেন এবং স্বচক্ষে দেখেছেন ভৈরব নট্টকে। খণ্ডলের লোকের নিকট ভৈরব নট্ট ছিলেন হাসির রাজা। তাঁকে কথ্য ভাষায় ডাকা হত ভৈরা ঢইংগা এই নামে। তিনি খুব হাসি তামাসা করতেন।

নট্ট সম্প্রদায় নর বা নট নামে পরিচিত। নাচে-গানে, খেলায় বিশারদ এই বংশের লোকেরা। আফগান-তুর্কী আক্রমণের ফলে ত্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারত থেকে পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে আসে এই নট্ট বংশের পূর্ব পুরুষরা। খণ্ডলের পরশুরামে নট্টদের একটি পাড়া ছিল। তাদের তৈরী চিড়া এত চিকন, মিহি, পাতলা ও সুস্বাদু ছিল যে দুধ, কলা, গুড় ছাড়াই খালি খাওয়া যেত। পরশুরামের বিখ্যাত চিড়া দূর-দূরান্তে রপ্তানি হত। চৈত্রমাসে শিবের গাজন উপলক্ষে নাচ-গান হয় বহু কাল যাবৎ। সেই নাচ-গানে নট্ট বংশীয় ছেলেরা মেয়ে-সেজে নাচ-গান করত। বিভিন্ন পাড়ার নাচের দলের কর্তা ব্যক্তিরা নট্ট বংশীয় ছেলেদের বায়না করে আনতেন। যে দলে অন্ততঃ একটি নট্ট ছেলে নাই, সেই দল কানা হয়ে যেত। তাদের নাচে-গানে ছিল জাদুর মত শক্তি, ছিল সম্মোহনী আকর্ষণ।

ভৈরব নট্ট খুব ভাল গায়ক ও বাদ্যকর ছিলেন। কোন হিন্দু মারা গেলে, শ্রাদ্ধের পর পড়ি কীর্তন দেওয়ার প্রথা সুপ্রাচীন। পড়ি কীর্তন গাইতে ভৈরবের মত বাহাদুর খণ্ডলে একেবারেই বিরল। তাঁর সাথে দোহারু থাকত; প্রসন্ন ঢোলী ছিলেন বিখ্যাত বাদ্যকর। ভৈরবের গান শোনার জন্য শত-শত শ্রোতা আসত। সেই করুণ রসাত্মক গান শুনে শ্রোতারা কান্না করতেন। প্রয়াতের নিকট আত্মীয়রা কান্নায় গড়াগড়ি যেত গানের আসরে।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রায় প্রতি গ্রামে রোগ নিরোধকল্পে পূজা দেওয়া হত। দিনে শীতলা দেবী এবং রাতে কালী দেবী পূজিতা হতেন। গ্রামের সকলেই চাঁদা দিত, তাই লোকমুখে ইহা গ্রামবাসী পূজা নামে খ্যাত। বিরাট পূজা খলা তৈরী করা হত সমবেত শ্রমে। সারা রাত গান-বাজনা হত। গ্রামবাসী পূজাতে গানের আসরে ভৈরবকে চাই। ভৈরবকে পেতে হলে আগে থেকেই যোগাযোগ করতে হত। সমগ্র খণ্ডলে ভৈরবের

বাজার দর খুব চড়া ছিল। তিনি রামপ্রসাদী গান গাইতেন। গানের ফাঁকে-ফাঁকে হাসি-তামাসা করতেন। কখনো হাসাতেন, কখনো কাঁদাতেন। ভৈরব ছিলেন সুকণ্ঠি হরবোলা।

ভৈরব কথায়-কথায় গান রচনা করতে পারতেন। মাঘ, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তরজা গানের আসর বসত গ্রামে। গ্রামের ধনী পরিবার গায়কদের খাবার দিতেন। কিন্তু গ্রামের সকলেই আনন্দে অংশ নিত । গানের আসর সাজাত। ভৈরব নট্ট তরজা গান গাইতেন। খণ্ডলে তরজা গানকে লোকে বলে আড়ি গান। এতে কবিদের লড়াই হয়। খণ্ডলে কতিপয় কবির নাম হল — ভৈরব নট্ট, আশুতোষ তেলীপাল, সুবল ভট্ট, অনন্ত কুমার বল প্রমুখরা। আশুতোষ তামাক সেবন করতে-করতে এক সাথে যুগপৎ তিন জন অনুলেখককে স্বরচিত গানের পদ বলে দিতেন। সুবল ভট্টের গোফ ছিল বেশ বড় বড়। অনন্ত কুমার বলের ছিল পাণ্ডিত্য। ❑

নবীনচন্দ্র সেন

সমতল ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তে খণ্ডল পরগনাতে তারাকুচা নামক গ্রামে গোলকচন্দ্র সেন ও আনন্দময়ী সেন নামক দম্পতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র ছিলেন কালীসিদ্ধা,আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ও প্রখ্যাত সমাজসেবক। তাঁর সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল হল ১৮৭৮ থেকে ১৯৪৬ খৃঃ।

গোলকচন্দ্রের পূর্বপুরুষ চট্টগ্রামে ছিলেন। পর্তুগীজ ও মঘ মিলে যখন জলদস্যুতা ও অন্যান্য অত্যাচার শুরু করল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের গোড়া থেকে, তখন অন্য অনেকের মত এঁরাও উত্তর দিকে সরে-সরে ক্রমে খণ্ডলে চলে আসেন। গোলকচন্দ্র ও আনন্দময়ী একাধিক পুত্র-কন্যার পিতা-মাতা হন। তন্মধ্যে তিনজন পুত্রের নাম হল নবীন, অক্ষয় (১৮৮১-১৯৬৬ খৃঃ), ও বঙ্কিম। তিন পুত্রই বিবাহ করেন। কিন্তু নবীন ছিলেন ব্যতিক্রম। অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি বিবাহ করতে বাধ্য হন, এবং বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক প্রায় ছিল না। তাঁর কোন পুত্র কন্যা নাই। অক্ষয়ের পুত্র অনাদি; বঙ্কিমের পুত্র মুকুন্দ।

নবীনের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে তারাকুচাতে। তখন সমগ্র তারাকুচাতে কোন পাঠশালা ছিল না। অনেক পরে আনুমানিক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রামবলী গণ (১৮৫০-১৯১২ খৃঃ) ও গগন বিশ্বাস মিলে ঋষ্যমুখ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তখন ব্রাহ্মণের গ্রাম্য টোল ছিল শিক্ষার একমাত্র ভরসা। পূর্ব বসন্তপুর নিবাসী ভগবান ভট্টাচার্যের টোলে নবীন প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এই টোলের শিক্ষাকে ভিত্তি করে নবীন পরে সংস্কৃতে ও ভারতীয় শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন স্বীয় অধ্যবসায় বলে।

ভারতবর্ষে সহস্র বৎসরের বিদেশী-বিধর্মী শাসনকালে পেশাচ্যুত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয়দের একাংশ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পেশাতে মনোনিবেশ করেছিল। নবীনচন্দ্র সেই ধারা অনুসরণ করেন। নবীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রয়োগিক শিক্ষা লাভ করেন কোন প্রবীণ কবিরাজের নিকট। তখন খণ্ডলে কোন হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিল না।

নবীনচন্দ্র শিক্ষানবিশী সম্পন্ন করে বাবা-মায়ের নামে চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ফেনী নগরে গোলকানন্দ ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ঔষধের কার্যকারিতা ও জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়ে গেল। তিনি কর্মচারী নিয়োগ করে প্রায় ৮/১০টি শাখা স্থাপন করেন আশে-পাশে নানা স্থানে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে নবীনচন্দ্র এইসব ঔষধালয় স্থাপন করেন।

কবিরাজী করে নবীনচন্দ্র যথেষ্ট পসার করেছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট পয়সা করেননি।

তিনি অর্থলিপ্সু, শোষক ছিলেন না। স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা-সেবা দিতেন; দীনদুঃখী রোগীকে প্রায় বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন। ১৯৩০ সাল থেকেই বিশ্বজোড়া আর্থিক সংকট দেখা দিল, কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য কমতে থাকে ; কাগজ, কেরোসিন, কাপড়, ঔষধ, যন্ত্রপাতির দাম বাড়ে। নানারকম আন্দোলন দেখা দিল। নবীনচন্দ্র সেই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঔষধের দাম বাড়ান নি।

আনুমানিক ১৯৩৫ সালে খণ্ডলে অগ্নিহোত্রী নামক জনৈক তেজস্বী, সমাজসংস্কারক, শাস্ত্রজ্ঞ খণ্ডলে আসেন। ক্ষত্রীয় আন্দোলন বা সংক্ষেপে পৈতা আন্দোলন গড়ে উঠল তাঁর আগমন উপলক্ষে। স্থানীয় পুরোহিতগণ এতকাল যাবৎ ক্ষত্রীয় ও বৈশ্যদিগকে মৃতাশৌচ এক মাস যাবৎ পালন করতে বিধান দিতেন। শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী তা হবে যথাক্রমে ১৩ দিন ও ১৫ দিন। অগ্নিহোত্রীর কথা শুনে ক্ষত্রীয় ও বৈশ্যরা জেগে উঠল। সেই আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন, নিবারণ চৌধুরী, যামিনী চৌধুরী, দ্বারকানাথ ভৌমিক, মহেন্দ্র বল, উকিল প্রসন্ন পাল, ক্ষেত্রমোহন সাহারায়, যামিনীকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখরা।

লর্ড মিন্টো কর্তৃক ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব হিন্দু-মুসলমানের তিক্ত সম্পর্কে ঘৃতাহুতি দেওয়া হল। মিন্টোর গোপন পরামর্শ অনুযায়ী ১. ১০. ১৯০৬ দিনাঙ্কে মুসলমান নেতারা মিন্টোর সাথে দেখা করল, নানাবিধ দাবী উত্থাপন করে সায় পেল এবং ডিসেম্বরে ঢাকাতে মুসলিম লীগ গঠন করল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তরুণ যুবকদের চিহ্নিত করণের কাজে বৃটিশ গোয়েন্দারা স্থানীয় এক বিশেষ গোষ্ঠীর লোকেদের কাছ থেকে সহায়তা পেত। হিন্দুদের উপর দাঙ্গা-হাঙ্গামা দ্রুত বেড়ে গেল। বৃটিশ শাসকবর্গ নীরব দর্শক হয়ে থাকত ও মজা দেখত। এই প্রেক্ষাপটে হিন্দু মহাসভা গঠিত হল। নবীনচন্দ্র ছিলেন হিন্দু মহাসভার সক্রিয় কর্মী।

নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি (১৯২৫/১৯৩৪) সংক্ষেপে কৃষক প্রজা দল নামে পরিচিত ছিল। দলনেতা ফজলুল হক। ১৯৩৭ খৃঃ থেকে ১৯৪৩ খৃঃ পর্যন্ত হক মন্ত্রীসভা বঙ্গদেশে ক্ষমতাসীন ছিল। অতঃপর ভিন্ন দল এল, নেতা সুরাবুদ্দি (১৮৯৩-১৯৬৩ খৃঃ)। লীগ নেতা সুরাবর্দি ছিল কলিকাতা দাঙ্গার (১৬. ৮. ১৯৪৬ খৃঃ) নেপথ্য নায়ক। তারপর নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হল ১০. ১০. ১৯৪৬ দিনাঙ্কে; প্রত্যক্ষ নেতা গোলাম সারোয়ার। মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালীতে এলেন ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে।

কলিকাতাতে দাঙ্গার পরই নোয়াখালীতে দাঙ্গার প্রস্তুতি চল্‌ল। চারিদিকে উত্তপ্ত পরিবেশ। হিন্দু মহাসভার নেতা নবীনচন্দ্র যে - কোন দিন নিহত হতে পারেন। তখন তিনি ফেনীতে। ফেনীতে লীগের বহু সক্রিয় কর্মী নেতার কাছ থেকে ইঙ্গিতের অপেক্ষায় অধীর

আগ্রহে অপেক্ষমান। তাই হিতাকাঙ্খীদের পরামর্শে ও ভাইদের আগ্রহে নবীনচন্দ্র তারাকুচাতে পৈত্রিক বাড়ীতে আসেন।

নবীনচন্দ্র মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে হিন্দুদের জাগাতে চাইতেন। গভীর রাত্রে, নীরবে, নির্জনে তিনি কালীমাতার ধ্যান করতেন। হিন্দুদের উপর একতরফা অত্যাচারের কাহিনী তিনি প্রায় প্রতিদিন শুনতে পেতেন। সংবেদনশীল ও কোমল মন ছিল তাঁর। তাই মানসিক যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে যান। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে কিংবা ১৯৪৭ সালের জানুয়ারীর গোড়াতেই তিনি পিতৃগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ❑

শ্রীশ্রী ব্রহ্মজ্ঞ মা

সমতল ত্রিপুরাতে, চাকলা রোশনাবাদে বাস করতেন এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। নাম অভয়াচরণ চক্রবর্তী ; তাঁর স্ত্রীর নাম শ্যামাসুন্দরী দেবী। অভয়াচরণ ও শ্যামাসুন্দরী ছিলেন গৃহী এবং পুত্র-কন্যার পিতা মাতা । তাদের দ্বিতীয়া কন্যার নাম হল কাদম্বিনী দেবী। কাদম্বিনীর জন্ম তিথি হল শুক্রবার, ৯ই ফাল্গুন, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৮৮০খৃষ্টাব্দ। কাদম্বিনী উত্তর জীবনে শ্রী শ্রী ব্রহ্মজ্ঞ মা নামে পরিচিতা হলেন।

কাদম্বিনী চক্রবতীর শৈশব, ও কৈশোর কেটেছে পিতৃগৃহে। তিনি যৎ সামান্য লেখাপড়া শিখেন বাড়ীতেই। তৎকালীন প্রথানুসারে তাঁকে গৌরীদান করা হয়। অর্থাৎ মাত্র আট-নয় বৎসর বয়সে তাঁকে বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু এই বালিকা বধূ বেশী দিন শ্বশুর বাড়ীর আনন্দ ভোগ করতে পারেন নি। বিবাহের মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যেই তিনি স্বামীহারা হন। কলেরাতে মারা যান স্বামী। বিধবা বালিকা পিতৃগৃহে ফিরে এলেন। তখন সময় ছিল আনুমানিক ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ।

কাদম্বিনীর জীবন এবার ভিন্ন দিকে মোড় নিতে থাকে এবং তা চলে দীর্ঘ ৪৫ বৎসর (১৮৯০-১৯৩৪ খৃঃ) যাবৎ। বৈধব্য দশা এবং মৃতদেহ সৎকার দৃশ্য বালিকার জীবন মূলে নাড়া দিল। একদিন বিতারা গ্রামের কেউ মারা গেল। শ্মশানে আনা হল মরাদেহ। চিতা সাজানো হল। মহাপুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করেন, মুখাগ্নি করা হল। অতঃপর দাউ-দাউ করে জলে উঠল আগুনের লেলিহান শিখা। এই করুণ দৃশ্য সেদিন কাদম্বিনী প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই মর্মান্তিক দৃশ্য জাগাল তাঁর মনে নানা রকম প্রশ্ন। যেমন কে আমি ? দেহ কি ? আত্মা কি ? মানুষ কেন আসে ? কেন চলে যায় ? মরণের পর কি হয় ? এছাড়া আরেকটি ঘটনা তাঁকে খুব প্রভাবিত করেছিল। সর্প দংশনে তিনি মরণাপন্না হয়েছিলেন। কিন্তু মরতে-মরতে বেঁচে উঠেন।

তাঁর মাথায় এই সব কেবলই আলোড়ন সৃষ্টি করতে থাকে। কৈশোর বয়সেই তাঁর মধ্যে উদাসীন স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এক্ষণে এই সব প্রশ্ন তাঁকে করল ধ্যানমগ্না, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, আত্মানুসন্ধানী। কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতা ব্যতীতই তিনি নীরবে সাধনা করতেন। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন। তিনি কুলগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কলিকাতাতে রামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন পরম পূজনীয়া সারদা মা (১৮৫৩-১৯২০),স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী রাখাল মহারাজ প্রভৃতি মহাত্মাদের সাথে। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করে তিনি মনশিক্ষা

দিয়েছেন। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, মঠ-মন্দির নির্মাণ, প্রচার প্রভৃতিতেআগ্রহ কম ছিল। তিনি ভাবাবেশে থাকতেন। শেষ বয়সে অম্লরোগে খুব কষ্ট পেয়েছেন। ভক্তরা চিকিৎসার ত্রুটি করে নি। দেওঘরে, বৈদ্যনাথ ধামে ১৮ই কার্তিক, ১৩৪১ বঙ্গাব্দে (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর) তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেওঘরে বেলাবাগানে নির্বাণ মঠ নির্মাণ করা হয়েছে তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে। ❑

শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল

পূর্ব্ব বঙ্গের কুমিল্লার অন্তর্গত বেগম আবাদ নামক গ্রামে লবচন্দ্র পাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাব তিথি হল ১৭ বৈশাখ ১২৮৯বঙ্গাব্দ (মে,১৮৮২খৃঃ)এবং তিরোভাব তিথি হল ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (মে, ১৯৬৬খৃঃ)।

কাশীনাথ পাল ও মতিরানী পাল হলেন লবচন্দ্রের পিতা-মাতা। আনুমানিক ১৮৯০খৃষ্টাব্দে কাশীনাথ মারা যান। লবচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র আট বৎসর। কিশোর বয়সে পিতৃহারা,সহায়-সম্বলহীন লবচন্দ্র ঐকান্তিক আগ্রহকে অবলম্বন করে লেখা-পড়া চালিয়ে যান। কখনো মামার বাড়ী,কখনো দিদির বাড়ী,কখনো শ্বশুর বাড়ী হল পড়ার জন্য আশ্রয়স্থল। বিদ্যালয়ের স্তর উত্তীর্ণ হবার পর বিবাহ করার জন্য চাপ এল। লবচন্দ্র বললেন,যে. যিনি মহাবিদ্যালয়ে পড়ার খরচ দেবেন, তাঁর কন্যা বিবাহ করবেন। এই শর্তের খবর চারিদিকে প্রচারিত হল। উজান চর কৃষ্ণনগর নিবাসী ডেঙ্গর পাল রাজী হলেন। কিন্তু আগে বিবাহ পরে পড়াশুনা। পাত্রীর নাম চপলা সুন্দরী পাল। আনুমানিক চব্বিশ বৎসর বয়সে. অর্থাৎ ১৯০৪খৃষ্টাব্দে লবচন্দ্র পাল বিবাহ করেন, অতঃপর ঢাকাতে জগন্নাথ মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং যথা সময়ে কলা বিভাগে স্নাতক হন।

লবচন্দ্রের তিন পুত্র ও এক কন্যা। ইহাদের নাম হল যথাক্রমে,হীরালাল, সরোজ, মনোজ এবং বাসন্তী। তিনি কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন, বিদ্যালয় গুলির নাম হল মাটির পাড়া বিদ্যালয়, নবিনগর বিদ্যালয়, ইব্রাহিমপুর বিদ্যালয় এবং উজানচর বিদ্যালয়। কালক্রমে তিনি মোট চার জন মহিলার পাণিগ্রহণ করেন।

রামদুলাল নন্দী(১৭৮৫-১৮৫২খৃঃ) ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজার জনৈক দেওয়ান। তাঁহার নিবাস ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত কালিকচ্ছ নামক গ্রামে। রামদুলালের পুত্র আনন্দ চন্দ্র (১৮৩২-১৯০০ খৃঃ) ছিলেন সন্ত-মহাত্মা। সাধন জীবনে তিনি শ্রীমৎ আনন্দ স্বামী নামে পরিচিত ছিলেন। আনন্দ স্বামী ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত। ১৮২৮খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩খৃঃ) কর্তৃক কলিকাতাতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হল। অতঃপর চারিদিকে ইহার শাখা স্থাপিত হতে লাগল।পূর্ব্ব বঙ্গের ঢাকা নগরে ৬ই ডিসেম্বর ১৮৪৬খৃঃ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ব্রজসুন্দর মিত্র (১৮২০-?) প্রমুখ কতিপয় যুবক। কুমিল্লাতে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয় ৫ই পৌষ ১২৬০ বঙ্গাব্দ (১৯ ডিসেম্বর ১৮৫৪ খৃঃ) অমৃতলালগুপ্ত প্রমুখ শিক্ষিত যুবকদের উদ্যোগে। কুমিল্লাতে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন গুরুদয়াল সিংহ, মহেন্দ্র নন্দী, দ্বিজদাস দত্ত, আনন্দ চন্দ্র বর্ধন, কৈলাস চন্দ্র

দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯১ খৃঃ) প্রমুখরা।

ঢাকা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, চট্রগ্রামে ব্রাহ্ম আন্দোলন জোরদার রূপ নিয়েছিল। ইহার দ্বারা প্রভাবিত হন আনন্দ-স্বামী (১৮৩২-১৯০০)। আনন্দস্বামী দ্বারা প্রভাবিত হন মনমোহন দত্ত, লবচন্দ্র পাল প্রমুখরা। আনন্দ স্বামী ভগবান কে ''দয়াময়'' রূপে উপাসনা করতেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী লবচন্দ্রকে স্পর্শ করল। উৎসাহী উদ্যোগী লবচন্দ্র প্রথম আশ্রম স্থাপন করেন উজান চর কৃষ্ণনগরে ৫ই পৌষ১৩২৬ বঙ্গাব্দে(ডিসেম্বর ১৯১৯)। ভারত বিভাজনের পর দেশের পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে গেল। তাই তিনি আগরতলায় আসেন ২২শে চৈত্র, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল ১৯৫১খৃঃ)। তাঁর সাথী ছিলেন মনমোহন সরকার। কিছু দিনের মধ্যেই অরুন্ধুতিনগরে দশ দ্রোণ জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি ক্রয় করেন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা মূল্যে। সেখানেই তিনি আশ্রম করেন, এবং বাকী জীবন অতিবাহিত করেন সাধন-ভজন করে। তাঁহার আশ্রমের নাম সর্বধর্ম মিশন। তিনি ছিলেন আমিষ ভোজী, গৃহী, স্বল্পবাক্, উদ্যোগী, নিষ্ঠাবান। তাঁর বিশেষ সহযোগী ছিলেন মনমোহন দত্ত (১০ই মাঘ১২৮৪ বঙ্গাব্দ-১৩১৬) এবং আপ্তাবুদ্দিন। ❑

ওঁ দয়ালগুরু বৃহদাস সিদ্ধান্তরী

ওঁ দয়ালগুরু বৃহদাস সিদ্ধান্তরী ত্রিপুরা রাজ্যের কোন এক পার্ব্বত্য পল্লীতে ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতার নাম নাগোদা জমাতিয়া এবং মাতার নাম কুঞ্জিনীকন্যা জমাতিয়া। নাগোদা জমাতিয়ার এক পুত্র ও এক কন্যা। তাঁদের নাম হল বিষ্ণুপদ ও গোপীকন্যা। এই বিষ্ণুপদ হলেন উত্তরকালে সাধক বৃহদাস সিদ্ধান্তরী। এই সাধকের জীবনী লিখেছেন আগরতলা নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী অমর চন্দ্র দেবনাথ।

বিষ্ণুপদ কখন ভূমিষ্ঠ হন? ভক্ত-শিষ্যদের মতে তিনি দেড়শত বৎসর জীবিত থেকে ১৩৮০ বঙ্গাব্দের ৬ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অর্থাৎ তিনি ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মানবলীলা সংবরণ করেন। ভক্তদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁর আয়ুষ্কাল হল১৮২৩-১৯৭৩ ইং। এই হিসাব সঠিক বলে মনে হয় না। তাঁর গুরুদেব মালা কতর হীনদাস সিদ্ধান্তরীর আয়ুস্কাল হল আনুমানিক ১৮৫৭-১৯৩৭খৃঃ। ভক্তদের বিশ্বাস সত্য হলে গুরুর চাইতে শিষ্যের বয়স অনেক বেশী। ইহা সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের হিসাব অনুযায়ী তিনি আনুমানিক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি বাল্য শিক্ষা পর্যন্ত পড়াশুনা করেন এবং যৌবনে বিবাহ করেন। তাঁর সহধর্মিনীর নাম লীলাবতী। তাঁর সন্তানের সংখ্যা ছয়। এদের নাম হল শব্দরায়, পুরঞ্জয়, ভবানীকন্যা, উমাচন্দ্র, ভৃগুপদ ও বাসুকী কন্যা। ভবানীকন্যা অকালে মারা গেলে পিতা বিষ্ণুপদ দারুণ শোকাহত হন এবং মনের শান্তির পথ খুঁজতে থাকেন। এমন সময় সাধক মালা কতর হীনদাস সিদ্ধান্তরী নামক মহাত্মার সাক্ষাৎ পান। এই সাক্ষাৎকার খুব সম্ভবতঃ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে। তিনি সন্ন্যাস নেন। সন্ন্যাস নেবার পর ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন।১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে নব্বই বৎসর বয়সে তিনি স্থূলদেহ ত্যাগ করেন।

আহারে-বিহারে তিনি নিষ্ঠাবান নিরামিষ ভোজী ছিলেন না। আমিষ, নিরামিষ, মাছ, মাংস, পান, তামাক, ক্ষারপানি, 'গোদক' নামক ভর্তা, বাঁশ করুল ইত্যাদি তিনি পছন্দ করতেন।

পোষাক-পরিচ্ছদের বেলায় তিনি খুবই উদাসীন ছিলেন। অধিকাংশ সময় কৌপিন পরিধান করতেন। মাঝে-মধ্যে নগ্ন থাকতেন। জনসভাতে, লোকালয়ে, নগরে বা গ্রামান্তরে যাবার সময় আপাদ-মস্তক আবৃত করে লম্বা ঢিলা জামা পরিধান করতেন।

গৃহী জীবনে ও আশ্রমিক জীবনে তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। মাটি কাটা, বাঁশ-বেতের কাজ,গৃহ নির্মাণ, গোপালন, চাষ, রান্না করা, বাগান করা, মাছ ধরা, জঙ্গল কাটা, সেবা প্রভৃতি কাজ নিজ হাতে,নিঁখুত ভাবে ও নির্লিপ্ত ভাবে করে যেতেন। রোগীর সেবায় তন্ত্র-মন্ত্র,তাবিজ-কবচ প্রভৃতি প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন।

মিতাচারিতা, মিতব্যয়িতা এবং সংরক্ষণ শীলতার পরাকাষ্ঠা তিনি দেখিয়েছেন ব্যয়ের ক্ষেত্রে। অপচয় ও অপব্যয় তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। টাকা-পয়সার, বাজার খরচের, দান-দক্ষিণার হিসাব রাখতেন। ভক্তদের দেওয়া দ্রব্য হেলায় ফেলে দিতেন না। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তিনি যেন ঘোরতর সংসারী। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ইহা খাঁটি সাধকের লক্ষণ।

তিনি গান-বাজনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর কবিত্ব প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে বহু ভক্তিগীতি রচনায়। তিনি নিজেই রচনা করেছেন এবং নিজেই সুর দিয়েছেন। ভজন মন্ডলীতে সমবেত নাচে,গানে, বাজনায় তন্ময় করে রাখতেন ভক্ত-শিষ্যদিগকে।

অদ্বৈতবাদে দীক্ষিত এই যোগী সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গন্ডী অপছন্দ করতেন। নারী-পুরুষ, পাহাড়ী-বাঙালী, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা-এই সব ভেদ বুদ্ধির উর্ধে ছিলেন তিনি। তাঁর সেবক-শিষ্য-ভক্তদের মধ্যে এই সবই ছিল। তিনি স্বীয় সাধন বলে জাতীয় সংহতি ও বিশ্বশান্তির বুনিয়াদ দৃঢ় করে গেছেন। ত্রিপুরায় ও পূর্ব্ববঙ্গে সমাদৃত হয়েছেন আন্তরিকতার সহিত। ❑

শ্রীমৎ স্বামী জগবন্ধু গোস্বামী মোহান্ত মহারাজ

ব্রজভূমিতে, বৃন্দাবনে, নন্দগ্রামে শ্রীমৎ স্বামী জগবন্ধু গোস্বামী মোহান্ত মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। মাঘ মাসে শুক্লা প্রতিপদে তাঁর আবিভাব। ১৫ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৭১ বঙ্গাব্দে তাঁর তিরোভাব ঘটে। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তাঁর শিষ্যা অন্নপূর্ণা দেবী থাকেন আগরতলাতে,জগহরি মুড়াতে শ্রী শ্রী রঘুনাথ জীউর আশ্রমে। অন্নপূর্ণা দেবী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন লেখা হল। জগবন্ধুগোস্বামী প্রায় ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর আয়ুস্কাল হবে আনুমানিক ১৮৭৪খৃঃ থেকে ১৯৬৪খৃঃ পর্যন্ত।

বাল্যকালে তিনি রামপন্থী সাধুদের এক সম্মেলনে কৌতূহল বশতঃ গিয়েছিলেন। সম্মেলন হয়েছিল নন্দগ্রামে। সেখানে এক সাধু সুলক্ষণযুক্ত বালকটিকে দেখে আদর করে 'বালক ভগবান' বলে কোলে তুলে নিলেন। এই ভাবেই সাধুসঙ্গ ভাল লাগল। তিনি ঐ সাধুর সঙ্গে চলে গেলেন। বেশ কয়েক বৎসর ঐ সাধুর সাথে ভারতের অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্র দর্শন করলেন, সাধন-ভজন পদ্ধতি শিক্ষালাভ করলেন। রামের প্রতি প্রগার ভক্তি দৃঢ়বদ্ধ করলেন।

নানা তীর্থ ভ্রমণ করতে-করতে, তিনি পূর্ব্ববঙ্গে এলেন। পশ্চিমে মেঘনা এবং পূর্ব্বে তিতাস, এই দুই নদীর মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামক স্থানে একটি প্রাচীন দেবালয় বিদ্যমান। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নগরের দক্ষিণ প্রান্তে কান্দিরপাড় নামক স্থানে ঐ দেবালয় অবস্থিত, ইহার স্থাপয়িতা ছিলেন জনৈক ব্রজবাসী সন্ত। দেবালয়ের নাম রঘুনাথ জীউর মন্দির। মন্দিরের মোহান্তের আগ্রহে এবং এলাকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের আকর্ষণে , তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেই কয়েক বৎসর থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নিকটেই, পূর্ব্বদিকে অবস্থিত প্রাচীন দেশীয় হিন্দু রাজ্য । এখানে প্রতি বৎসর শীতকালে বহু সাধুসন্তদের শুভাগমন ঘটত। রাজার কড়া নির্দেশ ছিল,যাতে মহাত্মারা আদর যত্ন পান। দান দেবার্চণ বিভাগ সাধুদের থাকার খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করত। এই ভাবেই জগবন্ধু গোস্বামী একবার আগরতলায় আসেন। এখানকার আদরযত্ন পেয়ে তাঁর ইচ্ছা হল কিছু দিন এখানে সাধন ভজন করার।

এখন যেখানে মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপিত (১৯৪৭ খৃঃ), তখন সেখানে ছিল গভীর বনজঙ্গল, রাজবাড়ীর হাতীর বিচরণ ক্ষেত্র ; বন্য হাতীও আসত।

মহাবিদ্যালয়ের ১নং ছাত্রাবাস এবং খেলার মাঠ পাশাপাশি অবস্থিত। ইহার উত্তরে আছে কর্তার বাড়ী। মহারাজ রাধাকিশোরের অন্যতম পুত্র হলেন নরেন্দ্রকিশোর। নরেন্দ্র কিশোরের তিন পুত্র; নাম হল বলীন, বিক্রমেন্দ্র, ও রমেন্দ্র। বলীন সাধু হয়ে যান। বিক্রমেন্দ্রের ডাক নাম ছিল বিদুরকর্তা; রমেন্দ্রের ডাক নাম ছিল মুচিকর্তা। এই দুই কর্তার বাড়ী মহাবিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উত্তরে বিদ্যমান। এই স্থানটি তখন লোকবসতিশূন্য ছিল, বড় বড় গাছ-গাছড়ায় পূর্ণ ছিল। কর্তার বাড়ী হয়েছে অনেক পরে। জগবন্ধু গোস্বামী এই স্থানটি পছন্দ করলেন। গাছতলে বসে তিনি ধুনি জ্বালিয়ে কেবলই রামনাম করতেন। রাজার লোক এসে লাকড়ী কেটে দিত, খাবার দিয়ে যেত। রাজার ইচ্ছা ছিল সেখানেই, হাওড়া নদীর তীরে একটি আশ্রম করে দিতে। সাধু রাজী হলেন না। অন্যত্র চলে যাওয়ার আগে রাজাকে জানালেন, এবং অনুরোধ করে গেলেন সেই ধুনি যেন অক্ষয় রাখা হয়। প্রায় শতবর্ষব্যাপী সেই ধুনি অক্ষয়, অনির্বাণ আছে, পাকা দেবালয় করা হয়েছে, হনুমান বিগ্রহ পূজিত হন।

ত্রিপুরা থেকে তিনি গেলেন পশ্চিমবঙ্গে, আলমডাঙ্গা নামক স্থানে। সেখানেও রঘুনাথ জীউর আশ্রম আছে। এছাড়া, ২৪ পরগণার হালিশহরে, নদীয়ার বগুলা নামক স্থানে রঘুনাথের আশ্রম আছে। এই সব আশ্রমের স্থাপয়িতা কে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে এসব আশ্রমে তিনি মোহান্ত পদে ছিলেন।

জগবন্ধু গোস্বামী আসামে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ভক্ত ও শিষ্য কয়েকজন ছিল। আসাম থেকে তিনি আবার আসেন আগরতলাতে। আগরতলাতে মেলার মাঠে পোদ্দার বাড়ীর গোবিন্দ বাবু, রাজেন্দ্র বাবু, লব বাবু ও কুশ বাবু ছিলেন তাঁর শিষ্য। সেই বাড়ীতে সাত মাস থাকেন। অতঃপর বগুলাতে চলে যান। বগুলাতে তখন ছিল শিষ্যা অন্নপূর্ণা দেবী। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকায়, শিষ্যা অপত্যস্নেহবশতঃ রাগারাগি করেন। গুরুদেব আনন্দিত চিত্তে শিষ্যার আবদার মেনে নিলেন এবং কয়েকদিন পর বল্‌লেন, আগরতলার ভক্তদের ঐকান্তিক আগ্রহ। আগরতলাতে একটি আশ্রম স্থাপন করতে ভক্তরা সম্পত্তি দিয়েছেন। গুরুদেবের ইচ্ছা, অন্নপূর্ণা দেবী যেন আগরতলাতে গিয়ে আশ্রম স্থাপনের কাজে সহায়তা করেন।

১৩৬৮ বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে ১৯৬১ ইং) গুরু ও শিষ্যা এলেন আগরতলাতে। আগরতলার অখিল ঘোষ এবং সুকুমার পাল গেলেন আগবতলা বিমানবন্দরে গুরুদেবকে আনতে। অখিলবাবুর বাড়ী ছিল হাওড়া নদীর দক্ষিণ তীরে। আগের দিন ঝড়-তুফানে হাওড়া নদীর উপরে তৈরী বাঁশের-কাঠের কাঁচা সেতু ভেঙ্গে গেল। তাই জগহরিমুড়াতে সুকুমার বাবুর বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা হল। এখানে প্রায় এক বৎসর থাকলেন। সুকুমার

পাল কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিতেই আশ্রম গড়ার সিদ্ধান্ত হল। আশ্রমের কাজ চালু করে, অন্নপূর্ণাকে কাজের ভার দিয়ে গুরুদেব চলে গেলেন বগুলাতে। কয়েক বৎসর পরে তিনি মারা যান। তাঁর তিরোভাব কাল হল ১৫ই বৈশাখ ১৩৭১ বাং(১৯৬৪ খৃঃ)। ❑

হরানন্দ ব্রহ্মচারী

গুরুর দ্বারা অভিশপ্ত, জনসাধারণ দ্বারা উপেক্ষিত, নিজের দ্বারা নিজে অবহেলিত একটি জীবন হল হরানন্দ ব্রহ্মচারীর। বিলোনীয়া মহকুমাতে তিনি হরিমোহন সাধু নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত অনেকটাই অজ্ঞাত। সম্যক্ তথ্যের অভাবে এই প্রতিবেদন অঙ্গহীন ও ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।

তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম হল হরিমোহন মল্লিক। হরিমোহনের পিতা-মাতার নাম সংগ্রহ করা যায় নি। তাঁর ভাই এর নাম শিশুরাম; ভাইপো-এর নাম ভগীরথ। হরিমোহন, শিশুরাম ও ভগীরথ লোকান্তরিত। ফলে সংগৃহীত তথ্য সবই লোকশ্রুতি নির্ভর। তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার (আঃ ১৯০৪-) শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার, শ্রীযুক্ত উষারঞ্জন মজুমদার এবং মমানুজা লীলাবতী গণচৌধুরী।

গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করে হরিমোহনের জন্মসন নির্ণয় করা গেল। তাঁর জন্মসন হল আনুমানিক ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। তাঁর মৃত্যুদিন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর মৃত্যুদিন হল ১৫ ই অগ্রহায়ণ·১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৯৮১ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং তিনি প্রায় ৯৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক জীবনীশক্তি এত বেশী ছিল যে, সমস্ত প্রকার অনিয়ম ও অযত্ন সত্বেও, তিনি দীর্ঘজীবি হয়েছিলেন।

আঠারমুড়া পর্বতমালা হতে উৎপন্ন হয়ে মুহুরী নদী পূর্ব দিগ্ থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হতে-হতে বিলোনীয়া নগরের উত্তর-পশ্চিম পাশ দিয়ে চলে গেছে। মুহুরী নদীর উত্তর-পশ্চিম তীরে কালিকাপুর, দক্ষিণ-পূর্ব তীরে বিলোনীয়া নগর। কালিকাপুর বর্তমানে বাংলাদেশে, বিলোনীয়া ত্রিপুরাতে, অর্থাৎ ভারতে। কালিকাপুরের অন্তর্গত উত্তর কাউতলী নামক পাড়াতে হরিমোহনের জন্ম। ছোটবেলায় তিনি পিতৃহারা হন। পারিবারিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই পরের গৃহে কাজ করতেন।

কালিকাপুরের দক্ষিণ প্রান্তে বাস করতেন রামতনু মজুমদার, রামতনু ছিলেন ত্রিপুরা রাজসরকারের দারোগা। কালিকাপুরের উত্তর প্রান্তে থাকতেন নন্দকুমার মজুমদার। রামতনুর দুই স্ত্রী, নন্দকুমারের দুই স্ত্রী। নন্দকুমারের বোন সনকা হলেন রামতনুর দ্বিতীয় স্ত্রী। সনকাকে বিবাহ করার পর রামতনুর প্রথম স্ত্রীর ঘরে সন্তান হল। সেই পুত্রের নাম আনন্দ। অতঃপর সনকার আদর কমে গেল। সনকা চলে আসেন পিতৃালয়ে। নন্দকুমার

(আঃ ১৮৪৯খৃঃ-১৯৩৯খৃঃ)-এর পুত্র হলেন নগেন্দ্র (আ১৮৯০-১৯৮২ খৃঃ)। নগেন্দ্র ছিলেন রেল ষ্টেশন মাষ্টার। নগেন্দ্র ও হেমপ্রভা হলেন ছয় পুত্রকন্যার পিতা-মাতা, তাঁদের নাম হল চিত্তরঞ্জন, মনোরঞ্জন, উষারঞ্জন, পুতুল, বাসন্তী ও সুভাষরঞ্জন। সনকা (আঃ ১৮৭০-১৯৬৩ খৃঃ) পিতৃগৃহে এসে এই ছয়জন নাতি-নাতিনকে লালন পালন করেছেন।

সনকা যখন রামতনুর বাড়ীতে গৃহবধু ছিলেন, তখন হরিমোহন ছিলেন রামতনুর বাড়ীর কর্মচারী তথা গোপালক। হরিমোহন তখন সনকাকে মা বলে ডাকতেন। হরিমোহন মাঠে গরু চড়াতেন, গাছের ডালে বসে মধুর সুরে বাঁশী বাজাতেন। সেই দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা। কালক্রমে হরিমোহন যৌবনে পদার্পণ করলেন। তখন বঙ্গদেশের বহু যুবক ব্রহ্মদেশে যেত ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী করতে। যুবক হরিমোহন খণ্ডলবাসী কারো সাথে ব্রহ্মদেশে গেলেন। ব্রহ্মদেশে কিছু অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরলেন এবং বাড়ীতে সেই টাকা দিয়ে, নিজে সাধনপথে পা বাড়ালেন। ব্রহ্মদেশে যাওয়া, ব্রহ্মদেশ থেকে ঘরে ফিরে আসা এবং গৃহত্যাগ এই তিনটি ঘটনা ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে। বিষয়-বৈরাগ্য তাঁকে করল ঘর ছাড়া।

কিন্তু যাবেন কোথায় ? তৎকালে খণ্ডল পরগণাতে একজন অতি বৃদ্ধ নামজাদা সাধু ছিলেন। তাঁর নাম শিবানন্দ গিরি মহারাজ (আনুঃ ১৮১৯-১৯৩৯ খৃঃ)। শিবানন্দ দীর্ঘজীবি হলেও শিষ্যসংখ্যা বেশী বাড়াতে চাইতেন না। ফুলগাজীতে সাহাপাড়াতে এক ছোট আশ্রম করে থাকতেন। হরিমোহন গেলেন শিবানন্দের নিকট। যুবক হরিমোহন তখন দিব্যকান্তি পুরুষ। শিবানন্দ স্থান দিলেন যুবককে। কিছুদিন পর শুভদিন দেখে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তে নাম রাখা হল হরানন্দ ব্রহ্মচারী।

হরানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন বলবান, তেজবান, একাগ্রচিত্ত সাধক। গুরুর নির্দেশে কঠোর তপস্যায় মেতে গেলেন। কে কতক্ষণ জপ-তপ করতে পারে, — এই নিয়ে গুরু-শিষ্যে প্রীতিপূর্ণ প্রতিযোগিতা শুরু হল। তখন গুরুর বয়স শতাধিক বৎসর, শিষ্য যুবাবয়সী। তাই শিষ্যের জয় হওয়াই স্বাভাবিক। জয়ের আনন্দে শিষ্য শিষ্টাচার বজায় রাখতে অক্ষম হলেন। ফলে গুরুর মনে ব্যাথা হল। গুরু-শিষ্যে মানসিক দূরত্ব বেড়ে যেতে থাকে। শুনা যায়, গুরু নাকি অভিসম্পাত করেছিলেন যে, হরানন্দ ব্রহ্মচারী তিন বৎসরের বেশী কোথাও এক জায়গায় টিকবে না। গুরুর সাথে শিষ্যের সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হরানন্দ বহিষ্কৃত হলেন সাহাপাড়াস্থিত আশ্রম থেকে।

গৃহচ্যুত, নিরাশ্রয় হরানন্দ ব্রহ্মচারী মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। কিন্তু তিনি পারিবারিক পরিবেশে ফিরে গেলেন না, কামিনী-কাঞ্চনের মোহে সমাবৃত হলেন না। কারো কৃপাপ্রার্থী হলেন না। তাঁর মনোবল ও দেহবল অটুট রইল। নিজের জন্মভূমিতে তথা নিজের গ্রামে

ফিরে এলেন, নিজের বাড়ীতে না উঠে গেলেন নদীর ধারে শ্মশানে। তাঁর অভিশপ্ত জীবনের কথা এর মধ্যে জানাজানি হল। গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় চিড়া-মুড়ি-গুড়, দই ইত্যাদি দিয়ে যেত। এলাকাতে তিনি অজ্ঞাতকুলশীল সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন না। তাই স্বাভাবিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা পেতেন নিজ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। কিন্তু এই তেজস্বী ও ত্যাগব্রতীকে কেন্দ্র করে কোন বড় সেবাশ্রম গড়ে তোলার গঠনমূলক চিন্তা ও চেষ্টা এলাকাবাসীর ছিল না। হরানন্দের চিন্তাতেও এই ধরণের বড় কিছু, মহৎ কিছু গড়ার চিন্তা ছিল না। এই ব্যাপারে গুরু ও শিষ্যের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা স্বীকার্য। তাই দেখা যায়, এঁদের আশ্রম নদীর ধারে, শ্মশানের ধারে, পথের ধারে, বাজারের ধারে গড়া হয়েছে। এঁদের আশ্রম মানে পর্ণ কুটির যেখানে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা নেই, দীন-দুঃখীর সেবার ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, কোন ভাল দেবালয় নেই, কোন যাত্রী নিবাস নেই, কোন ধর্মগ্রন্থাগার নেই, জনগণকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে সেবার ব্যবস্থা নেই।

কিছু দিন শ্মশানে বাস করার পর, রাঙ্গামাটি নামক গ্রামে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম গড়ে তুলেন। বল্লামুখা ও ঈশানচন্দ্র নগর নামক জনপদের পশ্চিমে এবং বিলোনীয়া নগরের উত্তরে রাঙ্গামাটি অবস্থিত। কয়েক বৎসর পর, দেশভাগের সময় রাঙ্গামাটি পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা হল লাঠির জোরে। রাঙ্গামাটির আশ্রম হল হরানন্দের প্রথম আশ্রম।

হরানন্দের দ্বিতীয় আশ্রম হল মজুমদার হাট নামক স্থানে। মজুমদার হাট হল বিলোনীয়া নগরের দক্ষিণে-পশ্চিমে। ১৯৩০ সালে দক্ষিণে ফেনী থেকে উত্তর বিলোনীয়া পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করা হয়েছিল। মজুমদার হাট হল রেলপথের নিকটেই, পশ্চিম পাশে। এই আশ্রমও তিনি ত্যাগ করেন তিন বৎসরের মধ্যেই। কাশীধাম থেকে শিবলিঙ্গ এনে তিনি এই আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শংকরী নামক জনৈকা শিষ্য এই সময় তাঁকে কিছু দিন সেবা করেছিলেন।

হরানন্দের তৃতীয় আস্তানা হল পার্বত্য ত্রিপুরাতে, বিলোনীয়া নগরের নিকটেই,মুহুরী নদীর পূর্ব্ব তীরে শ্মশানে। বিগত ১৩.২.১৯৩৫ দিনাঙ্কে মহারাজ বীর বিক্রম বিলোনীয়া ভ্রমণে গেলেন এবং প্রজাদের কাছ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা পেলেন। পরের বৎসর শীতকালে বিলোনীয়াতে কলেরা রোগ মহামারি রূপে দেখা দিয়েছিল। মহামারির সহিত মহারাজার ভ্রমণের কোন সর্ম্পক নেই। বিগত শত-শত বৎসর যাবৎ মহামারি এভাবেই আসত প্রায় প্রতি বৎসর। ভাল পানীয় জল ছিল না। ভাল চিকিৎসালয় ছিল না। মুখ্যতঃ জলবাহিত রোগ হাজার-হাজার মানুষকে, গ্রামকে শুন্য করে দিত। যাই হোক, ১৯৩৬ সালে মহামারিতে বিলোনীয়া নগরের ক্ষুদ্র শ্মশানকে মহাশ্মশানে সম্প্রসারিত করতে হরানন্দের ভূমিকা ছিল। কিছু দিন পর তিনি মহাশ্মশানের আস্তনা ত্যাগ করেন।

হরানন্দের চতুর্থ আশ্রম হল বিলোনীয়া নগরেই অভয়া কালীবাড়ী নামক স্থানে। অভয়া কালীবাড়ীর নিকটেই ছিল পূর্ব পরিচিত নগেন্দ্র মজুমদারের নতুন নিবাস। নগেন্দ্র মজুমদারের পিসী সনকা দেবীকে বালক হরিমোহন মা বলে ডাকতেন।

সনকা তখনও জীবিত। পার্থক্য শুধু এই যে, সনকা তখন স্বামীগৃহ ছেড়ে পিতৃগৃহে, রাখাল বালক হরিমোহন তখন হরানন্দ ব্রহ্মচারী। পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে, হরানন্দ যেতেন প্রায়ই সনকার নিকট। নগেন্দ্র মজুমদারের পিসী সনকা দেবী মাতৃস্নেহে হরানন্দের খোঁজ-খবর নিতেন। হরানন্দ প্রায়ই নগেন্দ্রের বাড়ী থেকে পানীয় জল আনতেন। অভয়া কালীবাড়ী প্রাঙ্গণ পরবর্তীকালে শিশু উদ্যানে পরিণত হল। হরানন্দ ছেড়ে দিলেন অভয়া কালীবাড়ী।

হরানন্দের পঞ্চম আস্তানা হল জোলাইবাড়ী বাজার। জোলাইবাড়ী বাজারের মধ্যেই একটি ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর নির্মাণ করে তিনি কয়েক বৎসর কাটান। আগরতলা থেকে সাব্রুম পযর্ন্ত দীর্ঘ সড়ক এই বাজারের ও আশ্রমের নিকট দিয়েই নির্মিত হয়েছে। আশ্রমের গায়েই বিশাল টিলা। টিলার উপর জোলাইবাড়ী বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে।

হরানন্দের ষষ্ঠ আশ্রম হল বাইকোরাতে। জোলাইবাড়ী বাজারের উত্তরে এবং শান্তির বাজারের দক্ষিণে বাইকোরা অবস্থিত। বাইকোরাতে বাজার, বিদ্যালয়, বৌদ্ধ মন্দির ইত্যাদি রয়েছে। এখানেই রাস্তার পাশে পর্ণ কু টীরে থাকতেন হরানন্দ ব্রহ্মচারী।

হরানন্দের সপ্তম তথা শেষ আস্তানা হল মুহুরীপুর। বাইকোরা থেকে মাত্র কয়েক মাইল পশ্চিমে হল মুহুরীপুর। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজা বীর বিক্রম ত্রিপুরা ভ্রমণে বের হন। লুং থুং হল প্রাক্তন নাম। সেই নাম পাল্টে রাজা নাম করণ করেন মুহুরীপুর। মুহুরীপুরে বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। একটানা মুহুরীপুরে কাটান নি। কখনো বাইকোরাতে, কখন জোলাইবাড়ীতে যেতেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে শেষ কয়েক বৎসর মুহুরীপুর আশ্রমে জীবন যাপন। তখন তাঁকে সেবাযত্ন করতেন ভবানী নামক জনৈকা শিষ্যা। তাঁর মৃত্যু দিবস হল ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ বাংলা, অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৯৮১ খৃষ্টাব্দ।

হরানন্দ ব্রহ্মচারীর ছিল আত্মবিশ্বাস, কষ্টসহিষ্ণুতা, তেজ, ত্যাগ, দেহবল ও মনোবল। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা, চিন্তার প্রসারতা, জীবসেবার জন্য গঠনমূলক দৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে ঘাটতি ছিল। তিনি ছিলেন শৈব সন্ন্যাসী। তাঁর নিকট ভক্তিমার্গই মুখ্য, জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ গৌন। তিনি কোন আত্মজীবনী এবং ভক্তিগীতি রচনা করে যান নি, কোন সুব্যবস্থিত সেবাপ্রকল্প রেখে যান নি। ❑

শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

সমতল ত্রিপুরার চাঁদপুর মহকুমাতে, চাঁদপুর বাজারে, ডাকাতিয়া নামক নদীর উত্তর পাড়ে, পুরাতন আদালত পাড়াতে সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও মমতাময়ী দেবীর পুত্ররূপে আবির্ভাব হয়েছিল এক শিশুর, যিনি উত্তরকালে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব নামে বিশ্ববিখ্যাত হন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল বঙ্কিমচন্দ্র, বাল্যকালে ডাকনাম ছিল বল্টু। বঙ্কিমের আয়ুস্কাল (১৮৮৭-১৯৮৪খৃঃ) সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তাঁর সম্ভাব্য আবির্ভাব কাল হল মঙ্গলবার দ্বিতীয় সপ্তাহ পৌষমাস, ১২৯৪বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ২৮.১২.১৮৮৭খৃঃ। তাঁর তিরোভাব কাল হল শনিবার, ৮ই বৈশাখ ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ২১.৪.১৯৮৪খৃঃ।

অযাচক, অভিক্ষু, আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন তিনি। তাঁর ধারাবাহিক জীবনী প্রকাশিত পুস্তকাকারে পাওয়া যায় না । তিনি বহু পুস্তক, পুস্তিকা ও ভক্তি গীতি রচনা করে প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া চব্বিশ খন্ড বিশিষ্ঠ একটি অতীব মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাতে তাঁর উপদেশ-বাণী, আংশিক ভ্রমণসূচী, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাকারে তাঁর জীবনকথা পাওয়া যায়। কিন্তু সুসংবদ্ধরূপে জীবন কাহিনী পাওয়া যায় না। তাঁর বহু রচনা, দিনপঞ্জী বিনষ্ট হয়েছে । প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক উপদ্রবে ধ্বংস প্রাপ্ত তথ্যসমূহ উদ্বার করার কোন উপায় নাই। **অখন্ড সংহিতা** গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা আছে। কেবল মাত্র দশ বৎসরের (১৯২৭-১৯৩৬ খৃঃ) কর্মযজ্ঞের বিবরণ তাতে লিপিবদ্ধ আছে। এমন কি এই নিবন্ধেরও অনেক দুর্বলতা আছে।

পিতামহ হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় ও পিতামহী হরগঙ্গা

শ্যামসুন্দর ও উমাতারার পুত্র পুণ্যশ্লোক হরিহর ছিলেন উকিল, দানবীর, সাত্ত্বিক, ধর্মপ্রাণ,ও সেবাপরায়ণ। ঘরে-বাইরে, গ্রামে, তীর্থে তিনি অকাতরে দান করেছেন। উত্তর ভারতের ও পূর্ব ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করতে হলে চাঁদপুর জাহাজঘাটা দিয়ে যাতায়াত করতে হত। অগণিত তীর্থযাত্রী হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অতিথিশালায় থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা পেত। অগণিত ছাত্রের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করতেন হরিহর। কত কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে দিয়েছেন অর্থ। কত অনাথকে দিয়েছেন আশ্রয়। হরিহর ছিলেন জাপক-পুরুষ। তাঁর মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা। দাদু-নাতিতে প্রায়ই শাস্ত্রচর্চা হত। হরিহরের একাধিক পুত্র-কন্যা ছিল। তাঁরা একান্নবর্তী পরিবারে থাকতেন।

হরিহরও হরগঙ্গা দেহত্যাগ করেন ভারত বিভাজনের পূর্ব্বে। তিনি রেখে যান তিন পুত্র (সুরেশ, সতীশ, জগদীশ) এবং তিন কন্যা (জ্ঞানদা, প্রিয়তমা এবং সুবর্ণ) । তিনি ৯৭ বৎসর আয়ু পেয়েছিলেন।

পিতা সতীশচন্দ্র ও মাতা মমতাময়ী

সতীশচন্দ্র ছিলেন কর্মবীর, কবি, দার্শনিক, আর্য়ুবেদ শাস্ত্রী, সাধক, গায়ক, নিষ্ঠবান ব্যক্তি। চাঁদপুরে লোহার কারখানা চালাতেন তিনি। এ কাজে সহায়তা করতেন তাঁর দাদা। মজুর-মিস্ত্রী কাজ করত কারখানাতে। কিন্তু কারখানাটি বেশী দিন চালাতে পারলেন না। বাকী-বকেয়াতে নষ্ট হল কারখানা। বাদবাকী সব বিক্রয় করে , সতীশ গেলেন ঢাকা নগরে কবিরাজী করতে । সততা ও নিষ্ঠার জন্য যশ-খ্যাতি হল। একবার রোগী দেখতে আমন্ত্রিত হয়ে গেলেন ময়মনসিংহে। রোগীদের কাতর আহ্বানে ময়মনসিংহে প্রায়ই যেতেন।

সেখানে এত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা হল যে, ময়মনসিংহে বাড়ী ক্রয় করে তের-চৌদ্দ বৎসর রয়ে গেলেন। ইহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে-পরের ঘটনা। সেখানে অবসর সময়ে গান-বাজনা করতেন। ভক্তিগীতি ও দেশাত্মবোধক গান রচনা করতেন। হাস্যরসিক, মধুরভাসী, দেশপ্রেমিক সতীশচন্দ্র ছিলেন ময়মনসিংহ বাসীর অতি আপন জন। সতীশচন্দ্রের দাদা ও বৌদি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত, সতীশচন্দ্র ও মমতাময়ী ছিলেন শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ভক্ত। সতীশচন্দ্রের বাসনা ছিল সন্ন্যাসী হবার। কিন্তু তা হল না। তিনি ছিলেন গৃহী-সন্ন্যাসী। সতীশের ভগ্নী ও ভগ্নীপতি অধিকাংশ সময় সতীশদের সাথে থাকতেন। তাঁরাও ছিলেন খুব সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। সমগ্র বাড়ীতে একটি আধ্যাত্মিক, ধার্মিক, সাত্ত্বিক পরিবেশ বিরাজ করত। সতীশের একাধিক পুত্র-কন্যা ছিল। ভারত-বিভাজনের ফলে সব তছনছ হল। তখন তিনি স্ত্রী পুত্র-কন্যা ভাই-বোনদের নিয়ে চলে আসেন বিভক্ত ভারতে, নবদ্বীপে। সতীশ তাঁর চার পুত্র (বঙ্কিম, নকুলেশ্বর, নলিনী, সুখময়) এবং তিন কন্যা (সুরুচি, কল্যানী ও বানী) নিয়ে পরিবারটিকে আর জম-জমাট করতে পারেন নি। তিনি ৮৫ বৎসর আয়ু পেয়েছিলেন।

শৈশব, বাল্য, কৈশোর

জন্মাবধি কিছু অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা গেছে শিশুর আচরণে। ভূমিষ্ঠ হবার অব্যবহিত পরক্ষণ থেকে প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ নবজাতক ছিলেন নীরব, নিস্তব্ধ। দুরন্তপনা ও দুঃশীলতা কোন বয়সেই তাঁর স্বভাবে ছিল না। অন্যমনস্কতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, মননশীলতা ছিল তাঁর আবাল্য চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্য। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত্ব করতে পারতেন। একদিন পড়াকালীন, এক সহপাঠী এসে বালক বঙ্কিমের পিঠে

আলপিন দিয়ে খোঁচা দিয়েছিল। পড়ায় অভিনিবিষ্ঠ বঙ্কিম টের পান নি, অথচ আলপিনের খোঁচায় রক্ত-নির্গম হয়েছিল। পড়তে-পড়তে তিনি ঝাল মুড়ি খেতে ভালবাসতেন। একদিন এভাবেই মুড়ি শেষ হয়ে গেলে পর তিনি নির্বিকার চিত্তে একটার পর একটা কাঁচা লঙ্কা খেয়ে ফেল্‌লেন। ভাত খেয়ে উঠে তিনি বলতে পারতেন না কি কি তরকারী দিয়ে খেয়েছেন। কৈশোরে একবার খুব জ্বরে কষ্ট পেয়েছেন। সুস্থ হয়ে যে-দিন যখন ভাত পথ্য করতে বসলেন, অমনি এক ক্ষুধার্ত পাগল এসে ভাত চাইলে পর বঙ্কিম ভাতের থালা দিয়ে দিলেন। তখন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। বিদেশী কারখানাতে তৈরী বিস্কুট তখন খাওয়া বারণ ছিল। পৈত্রিক বস্‌তবাড়ীতে একবার আগুন লেগে সামান্য ক্ষতি হল, পাড়াপ্রতিবেশীর সহযোগীতায় অল্পেতে রক্ষা হল। ঠিক সেই দিন, সেইসময় তিনি পাশের কোঠাতে ধ্যানমগ্ন থাকায় টের পেলেন না এতবড় অঘটন। বালক বঙ্কিম তখন জুবিলী বিদ্যালয় নামক গ্রাম্য পাঠশালার ছাত্র, বিদ্যালয়ের পাশেই রেল ষ্টেশন। এক দিন চলন্ত গাড়ীতে উঠার জন্য জনৈক ধাবমান যাত্রীকে বিপদ থেকে নিবারণ করার জন্য ছাত্র বঙ্কিম চীৎকার করতে থাকেন। পরদুঃখকারতা হল তাঁর অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি। পিতা সতীশচন্দ্র চাঁদপুরস্থিত লোহার কারখানা বন্ধ করে ঢাকা নগরে গেলেন চিকিৎসা-ব্যবসা করার জন্য। তখন বঙ্কিমের ছাত্রাবস্থা। পিতার সাথে পুত্র গেলেন। পুত্রকে ভর্ত্তি করানো হল ঢাকাতে পোগোজ বিদ্যালয়ে। পোগোজ বিদ্যালয়ের চত্ত্বরে ছিল একটি বেলগাছ। অবসর-ঘন্টাতে বালক বঙ্কিম ঐ বেলগাছের নীচে বসে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করতেন। এই কিশোরের স্বপ্ন ছিল পদব্রজে পৃথিবী পরিক্রমা করার, নৌকায় করে বাংলার গ্রামে-গ্রামে গিয়ে শোকার্তকে সান্তনা দেবার, ভয়ার্তকে অভয়দেবার, পাপার্তকে ঈশ্বরমুখী করার।

ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র লোকান্তরিত হন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে: পরবর্তী রাজা হন মহারাজ রাধাকিশোর। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের অন্য একটি ঘটনা বালক বঙ্কিমের চিন্তাধারা দৃঢ়করণে সাহায্য করেছিল। চাঁদপুরে তাঁর গ্রামের এক চরিত্রহীন স্বামী কুসঙ্গে মিশে প্রায় রাত্রই অন্যত্র কাটাত। এতে মর্মাহিতা স্ত্রী দিনের পর দিন কান্নাকাটি করতেন। সংবেদনশীল বালক বঙ্কিম খবর নিয়ে নিশ্চিত হয়ে তার দুইবন্ধুকে নিয়ে গভীর রাতে গ্রামের বটগাছতলে বসে জপতপ করতেন যাতে চরিত্রহীন সৎপথে ফিরে আসে। সপ্তাহ খানেক জপতপ করে অভীষ্ট সিদ্ধ হল। ব্যাপক অর্থে চরিত্রহীনতাই যে সমাজের মূল রোগ এবং জপতপ-ধ্যানধারনাই যে অন্যতম প্রধান প্রতিষেধক -এই বিশ্বাস বঙ্কিমের বাক্যে- কার্যে-চিন্তায় সারাজীবনের জন্য ছাপ ফেলে গেল। প্রসঙ্গতঃ আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক। চাঁদপুরে তাঁর পিতৃালয়ে মাঝে-মধ্যে ধর্মালোচনার সভা বসত। এমনই এক সভায় এক পন্ডিত মন্তব্য করেন যে, ওঁ কার হল সর্বমন্ত্রের সার ও বীজ, ইহা

উচ্চারণ করার অধিকার শূদ্রের নেই। বালক বঙ্কিম ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং গৃহভৃত্য ভারত শীলকে সভায় ডেকে এনে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করান এবং দেখান যে তাতে শূদ্রের আল জিহ্বা খসে পড়ে না।

শিক্ষা

বিদ্যার্থী বঙ্কিমের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। অসম্পূর্ণ তথ্য অনুযায়ী , তিনি চাঁদপুরে জুবিলী বিদ্যালয়ে , ঢাকাতে পোগোজ বিদ্যালয়ে এবং কলিকাতাতে রিপন মহাবিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছিলেন। ঢাকা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন প্রথম বিভাগে। কলিকাতাতে আই.এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এবং যথা সময়ে উর্ত্তীণ হন। অতঃপর স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন বঙ্গদেশে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী (১৯০৫ খৃঃ) আন্দোলন তীব্র আকার নিয়েছিল। যুবক বঙ্কিম সেই রাজনৈতিক আন্দোলনে একাত্ম হয়ে গেলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাবিদ্যালয় ছাড়লেন। বিপ্লবী বঙ্কিম বৃটিশের গোয়েন্দার জালে আটকে গেলেন, দারোগা পূর্নচন্দ্র দেবনাথ গ্রেপ্তার করেছিলেন । এবং কুমিল্লাতে কারারুদ্ধ হলেন। তখন তাঁর পিঠে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। সম্ভবতঃ কারাবাস শেষ হবার পর তিনি মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আর গ্রহণ করেন নি। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়ার সময় আদর্শ শিক্ষক শ্বেতবাহন বাবু পড়ানোর অবকাশ কালে উপদেশ দিতেন, জপ-তপ করতে বলতেন। বালক বঙ্কিম খুব পছন্দ করতেন এসব উপদেশ।

দীক্ষা

কুলগুরু অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য বালক বঙ্কিমকে সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। জনৈক মহাপুরুষ স্বীয় তপঃপূত স্নিগ্ধ দৃষ্টি বালক বঙ্কিমের উপর স্থাপন করে সত্ত্বা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তখন(১৮৯৫ খঃ) বালক বঙ্কিমের বয়স মাত্র আট বৎসর। বঙ্কিমের বাল্যবন্ধু ননীলাল কুন্ডু এবং ভূতনাথ বার্মা ছিলেন খুব উৎসাহী তপস্বী। কে কতবার, কে কতক্ষণ জপ করতে পারে, -এই নিয়ে প্রতিযোগীতা চল্‌ত। বনে জঙ্গলে, বাঁশ ঝাড়ে, খালি মট্‌কীতে, গর্তে, কাঁটার ঝোপে জপ-তপ করার প্রতিযোগীতা চলল কিছু কাল। ঢাকাতে ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, বেলগাছ তলায় এবং রমনা নামক মাঠে ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন বালক বঙ্কিম। এমনই এক সন্ধ্যায় পিস্তল হাতে এক বন্ধু এসে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে বলেছিল। বিপ্লবী দলে-উপদলে একতার অভাব ছিল। চাঁদপুরের পূর্ব্বদিকে, ডাকাতিয়া নদীর উত্তর তীরে ঘোড়ামারা মাঠ নামক বিশাল সমতল শ্যামল শস্য ক্ষেত্র আছে। সেই মাঠে দুইচার জন বন্ধুসহ যুবক বঙ্কিম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আত্মগঠন করবেন, চরিত্র গঠন করবেন,

ঈশ্বর সাধনা করবেন, যথাসম্ভব অন্য অনেককে এই কাজে উৎসাহ দেবেন। ইহা ১৯১২ কি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

জীবনতরীর লক্ষ্য (১৯০৭-১৯১৭ খৃঃ)

বঙ্কিমের সাত্ত্বিক জীবন যাপনের কথা, জপ-তপে প্রবল আগ্রহের কথা, বিষয় বৈরাগ্যের কথা, সংসার ত্যাগের বাসনার কথা চারিদিকে জানাজানি হল, ঘরে-বাইরে, পাড়া-প্রতিবেশীদের মুখে আলোচনার বিষয় হল। অবশেষে পিতৃদেব একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। পিতা-পুত্রে মতামত বিনিময় হল। একে অপরের যুক্তি খন্ডন করেন। এভাবে চল্‌ল বছর তিনেক। অবশেষে পিতা নিজ হাতে গৈরিক বস্ত্র পুত্রকে পরিয়ে দিয়ে অনুমতি দিলেন, আশীর্ব্বাদ করলেন। নিজে সংসার পাতার জন্য তিনি ধরাধামে আসেন নি, অন্যকে সুখময় সংসার পাতার কাজে সহায়তা করতে তিনি এসেছেন। এসব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার (১৯১৪-১৯১৮ খৃঃ) ঘটনা। বাইরের পৃথিবীতে যেমন যুদ্ধ চলছিল তখন, ঠিক তেমনি তাঁর পরিবারেও যুদ্ধ। মা-বাবার ইচ্ছা ও নিজের ইচ্ছার মধ্যে সংঘাত। অবশেষে জয়ী হলেন পুত্র। বিজয়ী পুত্র ছাড়পত্র পেয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণে মনোনিবেশ করেন। নিজে ত্যাগ ব্রতে, ব্রহ্মচর্যব্রতে, সদাচারব্রতে, অভিক্ষাব্রতে অবিচল রইবেন এবং জাতির মেরুদন্ড দৃঢ়করার ব্রতে নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন- এইরূপ ধ্যেয়নিষ্ঠা নির্ণয় করলেন। দীর্ঘ লম্প দেবার জন্য খেলোয়াড় যেমন পেছন থেকে দৌড়ে আসে, তেমনি যুবকবঙ্কিম এই দশকে (১৯০৭-১৯১৭ খৃঃ) দৃঢ়চিত্তে কোমর বেঁধে নিলেন। ইহা নিষ্ক্রিয়তা নয়, শিকার-উন্মুখ বাঘের প্রতিক্ষা। এই সময়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ডাকাতিয়া নদীর তীর দিয়ে মৃতদেহ পোড়াতে প্রতিবেশীকে সাহায্য করেন যুবক বঙ্কিম। নদী অতিক্রম করতে গিয়ে কুমীরের মুখে পড়েছিলেন। এই সময় বহু গান রচনা করেছেন।

১৯১৯-১৯২১ সালে ভারতে অসহযোগ আন্দোলন চরম আকার ধারণ করল। ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে গান্ধীজী অসম প্রদেশ ভ্রমণ করেন, ফলে অসমে জনজীবনে প্রবল উত্তেজনা দেখাদিল। চাবাগানে কর্মরত হাজার-হাজার কুলি সাহেবদের বাগান ছাড়ল। শেতাঙ্গ শাসকরা গুর্খা সৈন্য নামাল। বহু হতাহত হল। চাঁদপুর ঘাট দিয়ে পালোনোর উদ্দেশ্যে হাজার-হাজার কুলি এল। তাদের সেবা করার জন্য কংগ্রেস রামকৃষ্ণ মিশন ও বঙ্কিম গঙ্গোপাধ্যায় অক্লান্ত শ্রম করেন।

ঘরে বাইরে পরিব্রাজন (১৯১৮-১৯২৭ খৃঃ)

এক বার গৃহত্যাগ করে আর কোন দিন গৃহে প্রবেশ করবেন না, শুধু মাত্র গৃহে প্রবেশ করলেই ব্রতভঙ্গ হল, মা-বাবা,ভাই-বোনদের সাথে সম্পর্ক রাখলেই ব্রাত্য হয়ে

গেলেন- এমন বাহ্যিক ও শুষ্কবিচার করার লোক তিনি নন। অতএব তিনি প্রায়ই পরিব্রাজনে যেতেন আশে-পাশের গ্রামে ও জেলাতে, আবার চাঁদপুরে ও ময়মনসিংহে পিতৃ গৃহে ফিরে আসতেন। প্রচার কাজের সুবিধার্থে তিনি ছোট -ছোট পুস্তিকা রচনা করে, বহু সংখ্যক হাতে নকল করে, সেসব বিক্রয় করতেন অতীব নাম মাত্র মূল্যে । এই দশকের মধ্যে (১৯১৮-১৯২৭ খৃঃ) তাঁর এক-দুই জন বিশ্বস্ত ভক্ত-সহচর-সহায়ক জুটে গেল। ১লা বৈশাখ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ (এপিল ১৯২০ খৃঃ) থেকে তাঁর ভাষণ লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন ঐ অতীব বিশ্বস্ত সহচর-সহায়ক। এইদশকে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ভ্রমণ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাতে আসেন। ১৯২০ খৃঃ থেকে পুস্তিকা মুদ্রণ ও বিতরণ শুরু করেন। এই দশকেই তদানীন্তন ত্রিপুরা জেলাতে গ্রামে-গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, গ্রামের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে পথ নির্মাণ করান, পুরাতন পুষ্করিণীসংস্কার করান, যোগাসন শিক্ষা দেন, চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু করেন। এমনই এক ঘটনাচক্রে কারো বাড়ীর আগুন নিভাতে গিয়ে তিনি অগ্নিদগ্ধ হন। এই সময়েই তিনি উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তগর্ত সুখিন্দা পাহাড়ে গিয়েছিলেন আশ্রম স্থাপন করতে। সেই ঘন বনে বাঘ, ভালুক, সাপের উৎপাতে জীবন বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছিল। তাই সেই স্থান পরিত্যক্ত হল। উড়িষ্যা থেকে ফিরে এলেন ত্রিপুরা জেলাতে। প্রবল উৎসাহে কাজ করতে থাকেন। ফলে অসুস্থ হলেন । প্রায়ই রক্ত বমন হত। তাঁর পিতৃদেব তখন ময়মনসিংহের বাড়ীতে। আনুমানিক ১৩৩২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রুগ্ন ব্রহ্মচারীজী ময়মনসিংহে পিতৃগৃহে বিশ্রাম নেন। এইসময় ময়মনসিংহস্থ একটি আশ্রমে এক রাত্রির জন্য জনৈক পরিব্রাজক সাধুকে রাখতে অনুরোধ করেছিলেন যুবক বঙ্কিম। কিন্তু সেই মঠের অধ্যক্ষের ব্যবহার বঙ্কিমকে ব্যথিত করেছিল।

আশ্রম স্থাপন (১৯২৭-১৯৩৬ খৃঃ)

এই দশকের অধিকাংশ কার্যাবলী ২৪ খন্ড বিশিষ্ট **অখন্ড সংহিতা** নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত আছে। এই সময়ের কিছু পান্ডুলিপি বিনষ্ট হয়েছে। এই দশকে তিনি কর্মযজ্ঞের চরম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে শীর্ষস্থানে আরোহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছে। বৃটিশ উস্কানী পুষ্ট কিছু বিধর্মী গোষ্ঠী দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য মরিয়া হয়ে দাঙ্গা করছিল। ইহার অন্যতম শিকার হয়েছিলেন কর্মযোগী স্বামী স্বরূপানন্দ। তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল একাধিকবার। মৈথিলী ব্রাহ্মণ হরিহর মিশ্র বহু পত্র লিখ্তে-লিখ্তে, বিনম্র প্রার্থনা জানাতে-জানাতে, অবশেষে অশ্রু বিসর্জন করে রাজী করালেন এক বিশাল ভূখন্ড দানরূপে গ্রহণ করে আশ্রম গড়তে। তৎকালীন বিহারের মানভূম জেলাস্থিত পুপুণকী নামক বনাঞ্চল

এইভাবে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভূমিদান হিসাবে স্বীকৃত হল। ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (নভেম্বর ১৯২৭খৃঃ) একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরে তিনি গৃহপ্রবেশ করে পুপুণ্কী আশ্রমের সূত্রপাত করেন। ৭ই মাঘ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (জানুয়ারী১৯৩১খৃঃ) কুমিল্লার উত্তরে-পশ্চিমে মুরাদনগর থানাতে রহিমপুর নামক গ্রামে রহিমপুর অযাচক আশ্রম স্থাপন করা হল। ৮ই বৈশাখ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (এপিল ১৯৩১খৃঃ) মোচাগড়া আশ্রম স্থাপিত হল। আষাঢ় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (জুলাই ১৯৩১খৃঃ) বাঙ্গরা গ্রামে ও মেটংঘর গ্রামে আশ্রম স্থাপনের কাজ শুরু হল। আশ্রম স্থাপন করার জন্য বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু অনুরোধ আসতে থাকে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বিহারে গোরক্ষা আন্দোলন ও গোশালা-নির্মাণ আন্দোলন জোরদার করেন। বিলোনীয়ার দক্ষিণে পরশুরামের পশ্চিমে মরা নদীতে এই দশকেই আশ্রম ও ঔষধালয় স্থাপন করা হল। কসবা থানাধীন ধর্মনগর নামক গ্রামে কর্মমঠস্থাপন করা হল; অধ্যক্ষ ক্ষিরোদ বিহারী চক্রবর্তী। তাই নয়, বাংলা ১৩৩৪ সন থেকে অর্থাৎ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে বন মহোৎসব আন্দোলন প্রবর্তন করেন। চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু করেন এই সময়ে।

চিরক্ষুধার্ত বিশ্বভারতীর জন্য নিত্য অর্থচিন্তা যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে ব্যতিব্যস্ত করত, তেমনি পুপুণকী আশ্রম স্বামী স্বরূপানন্দের রাতের ঘুম কেড়ে নিত। কঠোর শ্রমলব্ধ অর্থ পাঠাতেন পুপুণকী আশ্রমে। সমতল ত্রিপুরাতে স্থাপিত আশ্রম সমূহের অর্থসংকট ও খাদ্য সংকট দুর করতে স্থানীয় ভক্তরা এগিয়ে আসত। কিন্তু পুপুণকী আশ্রমে এমন সহায়তা করতে খুব কম লোকই এগিয়ে আসত, বরং আশ্রমে উৎপন্ন ফসল চুরি হত প্রায়ই।

বিশ্ব যুদ্ধ, দেশ বিভাজন ও দেশত্যাগ (১৯৩৭-১৯৪৭ খৃঃ)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ(১৯৩৯-১৯৪৫ খৃঃ), দেশ বিভাজন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারতে উদ্বাস্তু আগমন স্রোত-প্রভৃতি ঘটনাবলী লক্ষ-লক্ষ লোককে প্রভাবিত করেছিল। স্বামী স্বরূপানন্দও এসবের শিকার হন। কিন্তু আদর্শে অবিচল থাকেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ক্রমেই পূর্ব্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সরে যেতে থাকে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে আশ্রম স্থাপন করা হল। এই দশকের শেষ দিকে তাঁর পিতা -মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়রা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন এবং পিতা-মাতা নদীয়াতে বসবাস করেন। অখন্ড সংহিতা নামক গ্রন্থটির প্রথম থেকে দশম খন্ড এই দশকেই প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দশটি খন্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হল। এই দশকের আরো বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হল কলিকাতাতে ১০৮, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে কয়েকটি স্বনির্ভর প্রকল্প গড়ে তোলা। স্বরূপানন্দ বীজ নিকেতন, স্বরূপানন্দ গ্রন্থ সদন এবং স্বরূপানন্দ

আয়ুর্বেদ লিমিটেড-এই তিনটি প্রকল্প জোর কদমে কাজ করছিল। এইসব প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মহেন্দ্র কুমার বল।মহেন্দ্রবাবু ত্রিপুরার প্রত্যাবর্তন করেন।

অতঃপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন অনিলবন্ধু মজুমদার (১৯২০-)। উভয়েই খন্ডল নিবাসী। কিন্তু প্রকল্পগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। নদীমাতৃক সমতল ত্রিপুরাতে, চাকলা রোশনাবাদে, পূর্ববঙ্গে, দীর্ঘ দিনের পরিচিত পরিবেশে তিনি যে-ভাবে আদরণীয় ছিলেন, তিনি সমাজসেবা করে যে-অনাবিল আনন্দ পেতেন, সেই সামাজিক ও মানসিক স্থিতির অনুপস্থিতি উপলব্ধি করেছিলেন এই সময়ে। সমতল ত্রিপুরাবাসী লোকজন চিন্‌ত তাঁর পরিবারকে, তিনি চিনতেন লোকজনদের। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে ঐ চিরপরিচিত পরিবেশ অনেকটাই অনুপস্থিত। এই প্রকার নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে একটি আশার আলোক পাওয়া গেল। ধর্মনগর কর্মমঠাধীন ছাত্রাবাসের প্রাক্তন ছাত্র রমানাথ রায় ত্রিপুরাতে ভূমিদান করার প্রস্তাব দিলেন । আগরতলার দক্ষিণে, আমতলী থানাধীন, ঈশানচন্দ্র নগর পরগনাধীন বল্লভপুর গ্রামনিবাসী রমানাথ রায়, অশ্বিনীকুমার সরকার ও রজনীকান্ত ভৌমিক ১৩৫৪ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বিশাল ভূখন্ড দানপত্র করে দেন। প্রায় ৩৬ কানি ভূমি এইসেবা প্রকল্পে আছে।

ভাঙ্গা-গড়া (১৯৪৮-১৯৬০ খৃঃ)

এই দশকের ঘটনা বলীর সাথে নদীর গতিবিধি তুলনীয়। নদীর যেমন এ-কূল গড়ে ও-কূল ভাঙ্গে, তেমনি এই সময় কয়েকটি আশ্রম সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মোচাগড়া আশ্রম, মেটংঘর আশ্রম, বাঙ্গরাআশ্রম, পরশুরাম আশ্রম এই দশকে অস্তিত্ব হারাল। রহিমপুর আশ্রম অতি কষ্টে অস্তিত্ব রক্ষা করল। এই সময়ের আশাব্যঞ্জক দিক হল ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ থেকে অর্থাৎ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতিধ্বনি নামক মাসিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হল। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে অযাচক আশ্রমকে বিধিসম্মত ভাবে নিবদ্ধীকরণ করা হল। আবার এই সময়েই অখন্ড সংহিতা গ্রন্থের একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ খন্ড প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হল ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দেই। এই সময়ে স্বামীজী প্রায়ই নদীয়াতে যেতেন বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে দেখাশুনা করতে। সেই সময়ে খন্ডলের অনিলবন্ধু মজুমদার থাকতেন নদীয়াতে এবং হরিদাস ভট্টাচার্য কর্তৃক স্থাপিত ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের নদীয়াস্থিত শাখাতে কাজ করতেন। অনিলবাবু প্রায়ই ঐ বাড়ীতে গিয়ে স্বামীজীর পিতা-মাতার সেবা করতেন। এই সময় থেকে ভারতের অন্যান্য প্রান্তে ভ্রমণের অবকাশ অধিক পেয়েছেন তিনি। এর আগেও অন্যান্য তীর্থে পর্যটন করেছেন, কিন্তু এসময়ে অবকাশ বেশী পাওয়া গেছে। পুস্তক প্রণয়ন অনেক আগে থেকেই শুরু করেছিলেন তবে এই সময় থেকেই পুস্তক রচনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে পেরেছেন। আগরতলাতে,

প্রগতি বিদ্যালয়ের মাঠে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে এক বিশাল সমাবেশে স্বামীজী উদাত্তকণ্ঠে প্রাণমাতানো ভাষণ দেন এবং হাজার-হাজার ভক্তকে দীক্ষা দেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মপুত্র নদীর প্লাবন থেকে ডিব্রুগড়বাসীদিগকে রক্ষার্থে স্বামীজি ডিব্রুগড় যান। এই দশকে তিনি কলিকাতাতে বিশেষতঃ কলেজ ষ্ট্রীটে, বই পাড়াতে বই বিক্রয় করতেন। অভুক্ত থেকেছেন কতদিন! এমনই একদিন "কর্মের পথে" নামক চটি পুস্তিকা বিক্রয় করছেন, এমন সময় কতিপয় আধুনিক ছাত্র এসে তর্ক, বাক-বিতন্ডা এমনকি মারামারি করল স্বামীজীকে। জন্মভূমির প্রবল আকর্ষণে তিনি তিনবার পূর্ব্ব পাকিস্থানে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি পাকিস্থানী গোয়েন্দা বিভাগ কড়া নজর রাখত। শেষবার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেছিল। অতীব ঝুকি নিয়ে, নৌকার মাঝি সেজে, ট্রেনের কুলি সেজে কোনক্রমে সীমানা অতিক্রম করে হিন্দুস্থানের নিরাপদ ভূমিতে পা রাখলেন।

দাঙ্গা, যুদ্ধ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মামলা (১৯৬১-১৯৭১খৃঃ)

ভারত উপমহাদেশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কয়েকটি বিধ্বংসী দাঙ্গা, আক্রমণ, যুদ্ধ, বাংলাদেশের সংগ্রাম এবং অস্বাভাবিক দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি। চীন কর্তৃক ১৯৬২ সালে ভারত আক্রান্ত হল। কাশ্মীরের কোন এক মসজিদে রক্ষিত হজরতের চুল গোপনে সরিয়ে ফেলে ষড়যন্ত্রকারীর সারা ভারতে এবং পূর্ব্ব পাকিস্থানে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ হল। ১৯৭১ সালে পূর্ব্ব বঙ্গে সংগ্রাম্ এবং লক্ষ-লক্ষ লোক ভারতে আশ্রয় প্রার্থী হয়ে এল। এই সব ঘটনাবলীর দ্বারা চিন্তাশীল, দেশপ্রেমিক স্বামীজী প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর কর্মপ্রবাহকে মন্থর করেছিল। তাঁর কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। অখন্ড সংহিতাতে বলা হয়েছে কাগজের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় মূদ্রণ কাজ বিলম্বিত হল। অখন্ড সংহিতার কয়েকটি খন্ডের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও ছাপানোতে বিলম্ব হল ঐ সব কারণে। অখন্ড সংহিতার কয়েকটি খন্ড, যেমন ৬,৭, ৮ এবং ১১নং খন্ড এই দশকে দ্বিতীয় বার মুদ্রণ করা হল। বোকারো ইস্পাত কারখানা গড়ার উদ্দেশ্যে পুপুণকীতে অবস্থিত আশ্রমভূমি অধিগ্রহণ করতে সরকারী আদেশ জারী হল। মামলা চল্‌ল তিন বৎসর। বহু অর্থ ব্যয় হল। মার্কিন পর্যটক ও লেখিকা শ্রীমতী ভার্জিনীয়া মূর কর্তৃক লিখিত এক গ্রন্থে স্বামীজী সম্পর্কে লেখা আছে অন্য অনেকের জীবনীর সাথে। বইটির প্রকাশক হল The Macmillan company, New York. ১৯৫৭ খৃঃ। সেই বইটি দেখানো হল, ফলে পুপুণকী আশ্রম অধিগ্রহণ থেকে বিরত রইল সরকার। খুব সম্ভবতঃ এই দশকেই কলিকাতাতে ও কাশীতে অযাচক আশ্রমের শাখা গঠন করা হল। ১৯৬৮ সালের জুনে কলিকাতাতে কাঁকুড়াগাছিতে গুরুধাম নির্মাণ করা হল। ১৯৬৯ সালে ত্রিপুরার ধর্মনগরে অযাচক আশ্রম সুসজ্জিত করার জন্য বিরাট

বিরাট শ্রম দান করা হল। ১৯৭০ সালে অক্টোবর মাসে আরেক বিরাট শ্রম দান করা হল পুপুণকী আশ্রমে। বিগত মঙ্গল বার, ১০ কার্তিক ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে (অক্টোবর ১৯৭০) বিশাল সমারোপ উৎসব করা হল; তাতে ঘোষণা করা হল যে সংহিতা দেবী হবেন পরবর্ত্রী উত্তরাধীকারীণী । তাঁর হাতে অদ্য দায়িত্ব সমর্পিত হল ।

মহা প্রস্থানের পথে (১৯৭২-১৯৮৪ খৃঃ)

ইহা অন্তিম দশক। সমগ্র অখন্ড সমাজের তথা সমস্ত অযাচক আশ্রমের দায়দায়িত্ব থেকে তিনি এখন মুক্ত । অখন্ড সংহিতা নামক মহাগ্রন্থের প্রায় সবকয়টি খন্ডই এই সময়ে পুনরায় মুদ্রণ করা হল। প্রতি সংস্করণেই প্রকাশিত পুস্তক যৎসামান্য মূল্যে বিক্রয় করা হয়। শুধু তাই নয় প্রায় অর্ধসংখ্যক পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই ভক্তরা ও শিষ্যরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে এক লক্ষ অখন্ড সংহিতা বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত পালন করা হয়েছিল। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারীতে পুপুণকীতে শুভ উদ্বোধন করা হল বহুমুখী বিশ্ববিদ্যালয়।

শরীর হল ব্যাধি-মন্দির। এইআপ্ত বাক্যের ব্যতিক্রম কেউ নয়। স্বামীজীও একাধিক বার রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। হাজার-হাজার মাইল ভ্রমণ, ঘন্টার পর ঘন্টা ভাষণ দান, লক্ষ লক্ষ চিঠি লেখা, অগণিত ভক্তের প্রশ্নোত্তর দান, মাটি কাটা, ইট কাটা,বই লেখা- এসব করতে - করতে তিনি অসুস্থ হয়ে যেতেন। প্রবল জ্বর নিয়ে ভাষণ দিয়েছেন বহুবার।

১৯২১ সালের আসাম থেকে আগত চা বাগানের শ্রমিকদের সেবা করতে করতে তিনি অসুস্থ হয়ে যান। ১৯২৭খৃষ্টাব্দে খুব পরিশ্রমের দরুণ পুপুণকীতে তাঁর রক্তবমন হত। তবুও তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। ১৮ই পৌষ ১৩৩৮বঙ্গাব্দে (জানুয়ারী ১৯৩২খৃঃ) রহিমপুর আশ্রমে স্বামীজীকে হত্যা করতে সচেষ্ট হল ভিন্ন সম্প্রদায়ের কতিপয় যুবক। সেদিন রাত্রেই পরম হিতাকাঙ্খী বিপিন রায়, মহেন্দ্র রায়, সূর্যকান্ত রায়, প্রমুখ ভক্তরা স্বামীজীকে গোপনে অন্যত্র সরিয়ে রাখেন। ১৯শে পৌষ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে, ভোরে রহিমপুর আশ্রমে স্বামীজীর কক্ষে এসে দেখা গেল যে শয্যার বালিস, লেপ, তোষক বল্লমের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। সেই রাত্রে আশ্রমে থাকলে অঘটন ঘটে যেত।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে পাবনাতে এবং জুলাই মাসে বাঁকুড়াতে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে ছিলেন। প্রচন্ড জ্বর তবুও কার্যসূচী বাতিল করেন নি। নির্দিষ্ট দিনেও সময়ে তিনি ভাষণ দিয়েছেন। ডিসেম্বর মাসে নোয়াখালী জিলার লক্ষ্মীপুর থানাতে গেলেন, কিন্তু সেখানকার উকিলদের গ্রন্থাগারে তিনি খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এর চাইতেও

খারাপ অভিজ্ঞতা হল শ্রীহট্টে, সেখানে ২রা মাঘ ১৩৪১ বঙ্গাব্দে (১৬.১.১৯৩৫ খৃঃ) আয়োজিত জনসভাতে প্রগতিবাদী কতিপয় লোক ষড়যন্ত্র করেছিল পঁচা ডিম ছোঁড়ার। ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে শিলচরে স্বামীজী এলেন, জনৈক উকিলের নির্দেশে তাঁর আগমন সূচক বিজ্ঞাপন পত্র ছিড়ে ফেলা হল। ১০.২.১৯৩৫ দিনাংকে তাঁর বই-এর অস্থায়ী দোকান লুণ্ঠিত হল। শ্রীহট্ট থেকে ফেরার পথে রেলগাড়ীতে অপমান সূচক নানা কথা বল্‌ল জনৈক ব্যক্তি। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে নোয়াখালী জিলার গোপালপুরে এবং সন্দীপে ভাষণ দিতে গেলেন। তখনও তিনি অসুস্থ হয়ে যান। তাঁর দেহে কয়েকবার অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল।

অবশেষে কলিকাতাতে, কাঁকুড়গাছিতে, গুরুধামে, শনিবারে ২১ শে এপ্রিল ১৯৮৪খৃষ্টাব্দে, সকাল ৬-৩০ মিনিটে এই মহাজীবনের দেহান্ত হল। দূর দূরান্ত থেকে, অসম, ত্রিপুরা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ থেকে অগণিত ভক্ত ও শিষ্য শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করতে সমবেত হল গুরুধামে। হাজার-হাজার মানুষ কাতারে-কাতারে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রণামাঞ্জলী নিবেদন করল। সাতদিন যাবৎ চল্‌ল ভক্তি নিবেদন। পরবর্তী শুক্রবারে বেলা ২ ঘটিকায় গুরুধামেই সমাধি দেওয়া হল।

স্বামীজী- প্রণীত গ্রন্থাবলী

সুদীর্ঘ ৮০ বৎসরের অধিক সময় স্বামীজী তাঁর শক্তিশালী কলমকে সক্রিয় রেখেছেন। কলম ও কোদাল সমান দক্ষতার সহিত ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর হাতে। কবিতা,গান,চিঠি,প্রবন্ধ, পুস্তক, পুস্তিকা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, দিনলিপি প্রভৃতি তাঁর রচনার অন্তর্গত। তাঁর বিপুল সম্ভার সবটাই প্রকাশিত হয় নি। আংশিক বিনষ্ট, আংশিক চোরের হস্তগত, আংশিক প্রকাশিত, আংশিক পান্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত। বৃটিশ গোয়েন্দার শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে বহু মূল্যবান লেখা সমতল ত্রিপুরাতে গোমতী নদীর বক্ষে বিসর্জন দেওয়া হল এবং কিছু-কিছু লেখা ভূগর্ভে রাখা হয়েছিল। তাঁর সমগ্র রচনা সংরক্ষণ করে প্রকাশ করা যদি যেত, তবে ইহা মহাকাব্যের রূপ নিত। তাঁর লিখিত চিঠির সংখ্যা এত বেশী যে সমগ্র পৃথিবীতে অদ্যাবধি আর কেউ স্বহস্তে এতগুলো পত্র লিখেছেন কিনা সন্দেহ! তাঁর সাহিত্য নিয়ে গবেষণা হওয়া আবশ্যক। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর একটি অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে সংযোজন করা হল —

১. সরল ব্রহ্মচর্য্য,
২. অসংযমের মূল উচ্ছেদ,
৩. জীবনের প্রথম প্রভাত,
৪. আদর্শ ছাত্র জীবন,

৫. আত্ম গঠন, ৬. সংযম সাধনা,
৭. দিনলিপি, ৮. স্ত্রী জাতিতে মাতৃভাব,
৯. প্রবুদ্ধ যৌবন, ১০. কুমারীর পবিত্রতা,
১১. নবযুগের নারী, ১২. গুরু,
১৩. অখন্ড সংহিতা, ১৪. মন্দির,
১৫. মূর্চ্ছনা, ১৬. সমবেত উপাসনা,
১৭. His Holy Words. ১৮. নববর্ষের বাণী,
১৯. বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য, ২০. বিবাহিতের জীবনসাধনা,
২১. সধবার সংযম, ২২. বিধবার জীবন যজ্ঞ,
২৩. কর্ম্মের পথে, ২৪. কর্ম ভেরী,
২৫. আপনার জন, ২৬. পথের সাথী,
২৭. পথের সন্ধান, ২৮. পথের সঞ্চয়,
২৯. সাধন পথে, ৩০. ধৃতং প্রেম্না,
৩১. বন পাহাড়ের চিঠি, ৩২. শান্তির বার্তা,
৩৩. সর্পাঘাতের চিকিৎসা, ৩৪. আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা।

খুব সম্ভবতঃ 'কর্মের পথে' নামক পুস্তিকাটির প্রথম প্রকাশ কাল হল শ্রাবণ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৯২০খৃঃ। যে-সব স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চরমপন্থী কার্যক্রমে অংশ নিতেন, তাঁরা পড়তেন গীতা, পথের দাবী, আনন্দমঠ, 'কর্মের পথে' প্রভৃতি প্রেরণাদায়ক গ্রন্থ। যাঁরা গ্রেপ্তার হতেন, তাঁদের কাছে 'কর্মের পথে' প্রায়ই পাওয়া যেত। তাই ইহার লেখক স্বামী স্বরূপানন্দ একাধিক বার গ্রেপ্তার হয়েছেন। কর্মের পথে গ্রন্থটি এতই প্রেরণাদায়ক ছিল যে অনেক যুবক ঘরবাড়ী ছেড়ে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে, সংযম সাধনা করে দেশমাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিল।

স্বামীজীর উপদেশামৃত

স্বামীজীর বাক্যে, কার্যে, চিন্তায় ঋজুতা, স্পষ্টতা, মানবতা, দেশপ্রেম ও জীবেপ্রেম সুস্পষ্ঠ। তাঁর উপদেশামৃত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ ও মনন করলে বহু বিষয় সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ঠ থেকে স্পষ্টতর হয়, বিচার শক্তি ধারালো হয়, জীবন-বোধ গভীর হয়। তাঁর শ্রীমুখ-

নিঃসৃত বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য আলাদা ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন। সূর্যালোককে উজ্জ্বলতর করার জন্য মাটির প্রদীপ ব্যবহার করা হাস্যকর। তাঁর বাণীর তেজ, দীপ্তি, গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখার অভিপ্রায়ে কিছু-কিছু হিতোপদেশের অংশবিশেষ হুবহু উদ্ধৃতি আহরণ করে বর্ণানুক্রমে সাজানো হল।

১. অখন্ড

অখন্ডেরা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোন ও সাম্প্রদায়িক গন্ডীর ভিতর আবদ্ধ নয়। অখন্ড-নাম ওঙ্কার কৃষ্ণেরও নাম নয়, বিষ্ণুরও নাম নয়, কালীরও নাম নয়, দুর্গারিও নাম নয়,- অথচ ইহা একাধারে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, কালী ও দুর্গা সকলেরই নাম। এই জন্য অখন্ডেরা বৈষ্ণবও নয়, শাক্তও নয়, সৌর নয়, গাণপত্যও নয়, অথচ একাধারে সর্ব্বসম্প্রদায়ের। যে-মানুষ মানুষের সাথে মানুষের মিলনের সূত্র আবিষ্কারেই নিয়তনিরত, যে-মানুষ অতীতের মহত্ত্বকে অস্বীকার না করেও অতীতের ভ্রম ক্রটিকে সংশোধনের সৎসাহস রাখে, যে-মানুষ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বর্তমানকে পরিচালিত করে , যে-মানুষ সকল সম্প্রদায়ের মৌলিক একত্ব বিশ্বাস করে, যে-মানুষ সর্ব্বজীবকে জানে ভাই, সর্ব্ব মানবকে জানে আপন, সর্ব্বদেশকে জানে স্বদেশ, সর্ব্ব ভাষাকে জানে ইষ্টনামেরই বহিঃপ্রকাশ, সকল সংঘকে জানে নিজের প্রতিষ্ঠান, সকল মত ও পথকে জানে নিজের মত ও পথের অন্তভুর্ক্ত সত্য,- সে হচ্ছে অখন্ড।

২. অনুন্নত বর্গ

সভ্যতা নামক সরলতা-বিধ্বংসী কালকূট যাহাদের ভিতরে ক্রিয়া সুরু করিয়া দিয়াছে,তাহাদের অপেক্ষা অসভ্য-নামে পরিচিত অরণ্য জাতিসমূহ তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ সেবাপাত্র। আমাদের গৃহ কোণে কত জাতি অনাদি অতীত হইতে সুরু করিয়া আজ পর্যন্ত গাছের মাথায় মাচা বাঁধিয়া বাস করিতেছে, ব্যাঘ্র-হস্তীকে প্রতিবেশী বলিয়া জানিতেছে, শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত রহিয়া আদিম সারল্যে অনাড়ম্বর ও অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করিতেছে। ইহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া, ইহাদের শ্রমলব্ধ অন্ন নিজেরা কাড়িয়া আনিবার জন্য নয়, নিজেদের চিত্ত দিয়া ইহাদের বিত্ত বর্দ্ধনের জন্য, নিজেদের বিত্ত দিয়া ইহাদের চিত্তের প্রসার বাড়াইবার জন্য ইহাদের ভিতরে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে। রিয়াং, কাইফেং, মলসুং, দারলং, জেমি, মিজো, রূপিনী, ডিমাছা, মিকির, নাগা, আদি করে যত স্থানে যত অবহেলিত মানব-গোষ্ঠী আছে, তাদের মধ্যে আমাদের নিশ্চয় যেতে হবে।

৩. অভিক্ষাব্রত

অভিক্ষাব্রতের যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকে,তবে তা হচ্ছে, এই দৈবরূপী ভূতকে

পুরুষকাররূপী মন্ত্রপূত সর্ষপের বলে জাতীয় জীবনের ঘাড় থেকে নামানো।

৪. আত্মকলহ

আত্মকলহ সর্ব্বদা বর্জন করবে। তোমার আত্মীয় বা প্রতিবেশী তোমাকে কিছু মন্দ কথা শুনিয়েছে বলেই, যদি তুমি তার গৃহে অগ্নিসংযোগ করতে ছুটে যাও, একজন তোমার কুৎসা করেছে বলেই যদি তুমি তার মুন্ডচ্ছেদ করতে যাও, তাহলে জানবে, তোমার নিজ গৃহে অগ্নি-সংযোগের দিনটি বেশী দূরে নয়। তোমার নিজের মুন্ডটি ধরাতলে গড়াগড়ি দেবার তিথিটি সন্নিকটবর্ত্তী হয়ে এসেছে।

৫. আত্ম গোপন

সাধুরা অনেক সময়ে আত্মগোপন করে থাকেন। কারণ নিজেকে জাহির করে ফেল্‌লে অনেক সময়ে অবনতি ঘটে। জীব-কল্যাণ যাঁদের ব্রত,কিছু আত্মপ্রকাশ তাঁদের করতে হয়। অনেক সময়ে সাধক -পুরুষেরা আত্মগোপন করেন, শিষ্য-পরীক্ষার জন্য। কেউ-কেউ আত্মগোপন করবার জন্য নিজের চরিত্রকে প্রকৃত রূপের বিপরীত দেখান। কেউ কেউ মৌনব্রত অবলম্বন করেন।

৬. আর্য সভ্যতা

আর্যসভ্যতা অনার্য্যের উপরে ডাকাতের মত আপতিত হয় নাই, লুন্ঠকের মত রক্ত শোষণ করে নাই। নারীকে তার নিভৃত গৃহকোণ থেকে সবলে আকর্ষণ করে টেনে আনে নাই, গৃহে-গৃহে অগ্নি সংযোগ করে নাই। অসির ঝনঝনা নয়, ত্যাগের বিষাণ সেখানে কম্বুস্বরে বাজছে। যুদ্ধাশ্বের ক্ষুরধ্বনি নয়, তপস্বীর নীরব প্রাণায়ামের গোপন বায়ু সঞ্চার সেখান প্রাণস্পন্দন। ভোগ্যা যুবতীর সংগ্রহ নয়, বিলাস-বাসনা চরিতার্থতাকারী মণিরত্ন আহরণ সেখানে প্রার্থনীয় নয়। কীর্ত্তি নহে, যশ নহে, মান নহে, প্রতিপত্তি নহে, জীব-কুল-কুশলার্থে আত্মদানের সামর্থ্যই সেখানে পরম ঈপ্সিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এইটাই ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার শাশ্বত ও অবিকৃত রূপ। এইরূপের বিভা আছে, কিন্তু প্রখর দীপ্ততা নাই, এই রূপের শোভা আছে, কিন্তু দর্পিত অহমিকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নাই।

৭. আর্য সমাজ

আর্য সমাজ দিয়াছেন সৎসাহস, ব্রাহ্ম-সমাজ দিয়াছেন স্বাধীন চিন্তা-ক্ষমতা। স্বামী বিবেকানন্দের কর্মও মিশন দান করিয়াছে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা। এঁদের নামে আমরা জয় ধ্বনিই ত' দিলাম, কিন্তু সাহস করে এঁদের আচরণ অনুসরণ করলাম না। তারই জন্য বিরাট-বিরাট মহাপুরুষের আবির্ভাবও জাতীয় জীবনে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন হচ্ছে

আদর্শ-অনুসরণের, গল্প-গুজবের নয়।

৮. আশা

দুরাশা, দুরাকাঙ্খা সত্যই কুহকিনী,মায়াবিনী,সর্ব্বনাশসাধিনী,কিন্তু আশাই ত দুর্ব্বলকে বল সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে, আশাই ত অলসকে কর্ম্মোদ্দমে চঞ্চল করে তোলে। এ ক্ষেত্রে আশাকে মৃত-সঞ্জীবনী সুধা বলে জ্ঞান করা উচিৎ।

৯. আশ্রম

আশ্রমাদি স্থাপনের দ্বারা জনহিত সাধনের চেষ্টা এবং আত্মশুদ্ধির অনুশীলন খুবই আনন্দজনক, লাভজনক ও সমর্থনযোগ্য । কিন্তু আশ্রম স্থাপনের মানে যদি হয়ে দাঁড়ায় গৃহস্থের গলগ্রহ হওয়া, তবে বড় বিপদ। প্রথম বিপদ নৈতিক। দ্বিতীয় বিপদ আর্থিক । যে-কোন সৎপ্রতিষ্ঠানকে অদূর ও সুদূর উভয়বিধ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

আশ্রমকে চরিত্রগঠনের একটি যন্ত্র বলিয়া মনে করি। যে-প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসিয়া অলসের আলস্য দুর হইবে না, বাক্যবীরের বাকবাহুল্য কমিবে না, অসাধকের সাধন-রুচি সৃষ্ঠ হইবে না, অসংযমী সংযম শিখিবে না, যে- প্রতিষ্ঠানের সংশ্রবে আসিয়া দায়িত্ব জ্ঞানহীনের কর্তব্যবোধ জাগিবে না, পরমুখাপেক্ষীর স্বাবলম্বন আসিবে না, অগঠিত-চরিত্র বিমনা বালকের মানসিক আত্মকর্তৃত্ব, দৃঢ়সংকল্প ও চারিত্রিক সম্পদ লাভ হইবে না, তেমন প্রতিষ্ঠানকে আশ্রম বলিয়া অভিহিত করা আর আশ্রম কথাটার অপমান করা এক কথা।

১০.আশ্রমবাসীর লক্ষ্মণ

সাধনে অনুরাগ, ব্রহ্মচর্য-রক্ষণে যত্ন, বহু ভাষিতা-প্রশমনে প্রয়াস, পরোপকারে প্রবৃত্তি, আত্মপ্রশংসায় বিরতি, পরদোষ দর্শনে অরুচি, নিয়ত কর্মশীলতা ও আত্মপরীক্ষায় অনালস্য -যর্থাথ আশ্রমবাসীর লক্ষ্মণ বলিয়া জানিও।

১১. আড়ম্বর

আড়ম্বরের গুণও আছে, দোষও আছে। গুণটা হচ্ছে এই যে, আড়ম্বর দেখে সাধারণ লোক আকৃষ্ট হয়। দোষটা হচ্ছে এই যে, আড়ম্বর একবার শুরু হলে বিনা আড়ম্বরে আর কাজ করতে মন চায় না । আড়ম্বরে আর আড়ম্বরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত জীবনটা একটা ভড়ং-এ পরিণত হয়।

১২. ইতিহাস

কেন কোন্ যুগে কোন্ জাতি উন্নতি পথে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ পা-পিছলে পড়ে গেল, আবার সহস্র পদস্খলন সত্ত্বেও কি করে কোন্ যুগে কি উপায়ে অন্য এক দেশ পৃথিবীর বুকে স্ফীত বক্ষে সরল মেরুদণ্ডে দৃঢ়চরণে উঠে দাঁড়াল, সেই ইতিহাস পড়তে-পড়তে অন্তরে উদ্দীপনা জাগে। যে-কোন দেশের বৈষয়িক, বাণিজ্যিক, শৈল্পিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক উন্নতি-অবনতির ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে আমরা আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী উপদেশের সন্ধান পেতে পারি ।এই জন্যই ইতিহাস-পাঠ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে কর্তব্য । ইতিহাস-জ্ঞান-বর্জিত বৈজ্ঞানিক তার বিজ্ঞান-সাধনাকে যুগোপযোগী কাজে লাগাতে অক্ষম হয়। ইতিহাস-জ্ঞান-বর্জিত দার্শনিক তার দর্শন-তত্ত্বকে সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসমর্থ হয়। সকল দেশের ইতিহাস থেকেই মানুষ সঙ্কট-মোচনের নানা ইঙ্গিত সংগ্রহ কত্তে পারে, কিন্তু নিজের দেশের ইতিহাস ভাল করে জানা না থাকলে ভিন্ন দেশের শিক্ষাকে কাজে লাগাবার পথোদ্‌ঘাটন সম্ভব হয় না।

১৩. ঈশ্বরে বিশ্বাস

মানুষের যত প্রকারের উপকার তুমি করতে পার, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপকার হচ্ছে তাঁকে ঈশ্বর বিশ্বাসের শক্তিতে সঞ্জীবিত করা। প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তি বিশ্ববাসী জীবমাত্রের প্রতি করুণাময়, প্রেমময়, স্নেহময় হয়।

১৪. উপবাস

কেউ-কেউ উপবাস করেন একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্য ।কেউ করেন চিত্ত শুদ্ধির জন্য। কেউ করেন শরীরের সুস্থতা সম্পাদনের জন্য। কেউ করেন লোকের উপর নৈতিক চাপ দেবার জন্য, অর্থাৎ তাদের বিচার ও কর্তব্যবুদ্ধিকে জাগরিত করার জন্য, কেউ করেন লোকের উপর অবৈধ চাপ দিয়ে তাদের স্বার্থ-হানিকর কাজে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদিগকে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করতে। এ উপবাস জুলুম-বাজির নামান্তর। কেউ করেন টাকা আদায়ের জন্য, কেউ করেন নাম-যশ বৃদ্ধির জন্য,কেউ করেন ক্রোধ বশতঃ, কেউ করেন অপরের অনিষ্ট কামনা নিয়ে।

১৫. উপাসনা

উপাসনার বল যেন আমাদের মধ্যে অটুট থাকে। সমবেত উপাসনাই আমাদের বল ও ভরসা। নাচ, গান, বক্তৃতা প্রভৃতি নানারূপ উপসর্গ জুটাইয়া আমরা যেন ইহার অক্ষত

দেহে ক্ষতের সৃষ্টি না করি। পক্কান্ন ভোগ দান, অন্নকূট সাজানো, প্রহরে প্রহরে বিগ্রহের মস্তকে শরবৎ, ডাবের জল, দুগ্ধ প্রভৃতি সিঞ্চন, ঘন্টায় ঘন্টায় ভোগ সরানো এবং তজ্জনিত হৈ-চৈ প্রভৃতি অনাবশ্যক আড়ম্বরকে ঠাঁই গাড়িতে দিও না।

১৬. একান্নবর্তী পরিবার

পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে বা গুণে আমাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ এতই বেড়ে যাচ্ছে যে, দুই ভাই এক পরিবারে বাস করতে পাচ্ছে না। দুই বধু দুই দেশ থেকে, দুই বংশ থেকে এসেছে,পরস্পর মিল্‌তে পাচ্ছে না এবং নিজ-নিজ স্বামীদিগকে ভাইদের কাছ থেকে আলাদা থাকার প্ররোচণা যোগাচ্ছে। আজকাল নানা স্থানে সমবায় সমিতির কথা হচ্ছে একান্নবর্তী পরিবার হচ্ছে এই সমবায়ের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

১৭. ঐক্য

যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে পরস্পরের অবিশ্বাস নেই, অনাস্থা নেই, সন্দেহ নেই। যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিজের সুখ-সুবিধার চেয়ে অপরের সুখ-সুবিধার দিকে বেশী লক্ষ্য দেবে। যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে নিজের দেহ-মনকে সম্পূর্ণ রূপে কর্ম্মক্ষম রাখবার জন্য নিম্নতম সুবিধা যত টুকু দরকার, দাবী মাত্র ততটুকুর,সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী এর উর্দ্ধে যাবে না। যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে পরস্পরের তুচ্ছ ত্রুটি বা খুঁটিনাটি পার্থক্যের উপরে জোর দেবার মত সঙ্কীর্ণতা কারো মনে থাকবে না। ঐক্যরূপ সূর্য্যের উদয় হলে, আত্ম- অবিশ্বাসরূপ অন্ধকার দূর হয়, দুর্ব্বলের মনে সাহস জাগে।

১৮. কলহ

কলহ-বর্জ্জিত সংসারে উন্নতি হয় তাড়াতাড়ি। যেখানে ঝগড়া-কলহ আছে, সেখানে হইতে ভাগ্যলক্ষ্মী সভয়ে পলায়ন করেন। কলহ বর্জ্জিত সমাজে প্রত্যেকের পূর্ণ প্রতিভায় বিকাশের প্রকৃষ্ঠ সুযোগ ঘটে, এবং কলহ -পরায়ণ ব্যক্তি বা জাতি-সমূহ আত্মকলহ করিয়া নিজেদের শক্তি ও প্রতিভার অপচয় করে। পরধর্ম্মের প্রতি আক্রোশের ভার নিয়া যাহারা নিজ ধর্ম প্রচারে আগ্রহী, তাহারা অনেক সময়ে অকারণ-কলহের কারণ সৃষ্টি করে। ভিন্ন রাজনৈতিক সঙ্ঘের প্রতিপত্তি নাশ করিবার জন্য যাহারা সত্য, অহিংসা ও সুবিচারের পথ পরিহার করিয়া চলে, তাহারা দীর্ঘস্থায়ী কলহের বীজই বপন করে।

১৯. কর্ম্মী

যতক্ষণ তুমি নিরহঙ্কার, ততক্ষণই তুমি কর্ম্মী। অহঙ্কার আসিল কি, তোমার কর্ম্মিত্বও

গেল, যোগ্যতাও গেল, প্রভাব-শক্তিও নাশ পাইল। সহকর্মীদিগকে ভালবাসিবে না, অথচ তাহাদিগকে দিয়া কাজ করাইয়া লইবে, ইহা ভ্রান্ত বুদ্ধির পরিচায়ক। যাঁহারা সৎকর্মী, চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ-নিজ স্থানে বারংবার আনয়ন করাও এবং তাঁহাদের অর্জিত সুমহান জ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করাও।

২০. কৃতজ্ঞতা

সর্ব্বধর্মের মূল সূত্র হওয়া উচিত কৃতজ্ঞতা । কেউ কিছু করেছে আমার জন্য, এটা যেন আমি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত না হই। জগতের প্রতিটি প্রাণী অপর প্রতিটি প্রাণীর কাছে কোনও না কোনও প্রকারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঋণে দায়গ্রস্ত।

২১.কৃষি

কৃষির আয় অতি পবিত্র আয় । কোনও মানুষকে প্রতারিত না করিয়া, কাহারও মুখের গ্রাস কাড়িয়া না নিয়া, নিজের সম্মান অটুট অক্ষত রাখিয়া, স্বকীয় চরিত্রে একটি মাত্র কলঙ্ক-রেখাও পড়িতে না দিয়া অন্ন-অর্জণ একমাত্র কৃষকেই করিতে পারে। ভূমি-লক্ষ্মীর সেবা এই জন্যই আর্য্য ঋষিরা স্বহস্তে করিতেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে করিতেন।

২২. গুরু

ভারতের গুরু যথার্থ গুরু। শিষ্যের প্রাণের সুপ্ত শক্তিকে নিজের জাগ্রত শক্তির অদৃশ্য স্পর্শ দিয়া নিদ্রোত্থিত করেন। এখানেই ভারতীয় গুরুর কৃতিত্ব ও অমরত্ব। যতদিন শিষ্য উন্নত সংস্কারের অধিকারী না হইবে, ততদিন তাহাকে উন্নত তত্ত্ব দান করা গুরুর সাধ্যাতীত। গুরু দেখিবেন, শিষ্যের সর্ববিষয়িনী পূর্ণতা হইতেছে কিনা। পরস্ব-অপহারী দস্যুবৃত্তিধারী নররাক্ষস সৃষ্টিও যেমন তাঁহার লক্ষ্য হইবে না, তেমনি আবার কম্বল-কৌপীনধারী বৃথাতীর্থচারী বৈরাগীর দল গড়াও তাঁহার লক্ষ্য হইতে পারে না। একদেশদর্শিতা গুরুত্ব-ধর্মের বিরুদ্ধ-শক্তি। সর্বদর্শিত্ব, সমদর্শিত্ব এবং সম্যগ্‌দর্শিত্বই সদ্‌গুরুর লক্ষণ।

২৩. গোরক্ষা

ভারতীয় সভ্যতার মূল গোমাতা। গরুর গোবর দগ্ধ করিয়া ফেলিও না, তাহাকে সারে পরিণত করিয়া ক্ষেতের কৃষিতে লাগাও। নবজাত গোবৎসকে অযত্ন করিও না, তাহাকে শৈশবকালে প্রচুর মাতৃদুগ্ধ সেবন করিতে দাও। গোধনই গৃহস্থের প্রথম ধন, কৃষিক্ষেত্র দ্বিতীয় ধন, নগদ টাকা গৌণ ধন।

২৪. গ্রামের শত্রু

অস্বাস্থ্য গ্রামের শত্রু, দারিদ্র্য গ্রামের শত্রু, অশিক্ষা গ্রামের শত্রু, কিন্তু সবচেয়ে বড় শত্রু দলাদলি। কর্তৃত্ব লিপ্সাই দলাদলির মূল উৎস। আত্মাভিমান থেকেই দলাদলি হয়। আদর্শহীনতাই দলাদলিকে সহজে পাকিয়ে তোলে।

২৫. চরিত্র

একটা সুনির্দ্দিষ্ট মহৎ কাজ নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে সুদীর্ঘকাল, অবিরাম, অবিশ্রাম করে যাওয়ার রুচি, ধৈর্য্য, সাহস ও সামর্থ্যের নাম চরিত্র। কথায়-কথায় মত-পরিবর্তন চরিত্রের লক্ষণ নয় । নিজের চিন্তা ও আচরণের ত্রুটিকে ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে দেখে যাওয়া চরিত্রবত্তার প্রধান লক্ষণ। চরিত্রের প্রথম কথা আত্মবিশ্বাস। অবিরাম, অবিশ্রাম, অক্লান্ত পৌরুষে, দ্বিধাহীন ধৈর্য্যে, কুণ্ঠাহীন প্রাণে তোমাকে যে নিয়ত চলবার যোগাবে প্রবৃত্তি, প্রেরণা ও ভরসা, তারই নাম চরিত্র।। চরিত্রের কোমলতায় যে পেলব, সে পরের দুঃখে, পরের বিপদে, পরের ক্লেশে নিজেকে দুঃখিত, বিপন্ন ও ক্লিষ্ট বলে অনুভব করে। এমন যে মানুষ, সেই ত পূর্ণ মানুষ। চরিত্রহীন জাতি চির-পরাধীন থাকে। চরিত্রের আবশ্যকতা সব যুগেই ছিল, আছে, থাকবে।

২৬. চাই

তোমাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা যেন ক্লীব, কাপুরুষ, পঙ্গু, দুর্বল, অনাথ ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে না জন্মায়। তাই, যদি পারো, জীবন-গঠন করো ভগবৎ-প্রীত্যর্থে, নিজের ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য নয়। ভারতীয় জীবনের আদর্শ হচ্ছে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলা। সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং — কেবল শাস্ত্রের মন্ত্র হয়েই পড়ে থাকবে, প্রাচীন ঋষিদের এইটি কখনো অভিপ্রায় ছিল না। অতীতকে ভুলে যেও না।

২৭. ছোট কাজ

ছোট-ছোট কাজের ভার পাইয়া যাহারা মনঃক্ষুন্ন হয় না, পরন্তু প্রাণপণ যত্নে তাহা সুচারু-রূপে সম্পাদন করে শ্রীভগবান আস্তে-আস্তে তাহাদের হাতে বড়-বড় কাজ তুলিয়া ধরেন।

২৮. জন্ম নিয়ন্ত্রণ

প্রত্যেক জাতিরই আর্থিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে, নবজাতকের সংখ্যাবৃদ্ধি-প্রশমনের চেষ্টা কর্তব্য।। জন্ম সংখ্যা হ্রাসের আন্দোলন বর্তমান সময়ে এদেশে হিন্দুদের মধ্যে

হচ্ছে। অথচ ভারতে হিন্দুরা এখন ক্ষীয়মান জাতি।। হিন্দুদের পক্ষে জন্মশাসনের আন্দোলন নিতান্তই কৃত্রিম ও নিষ্প্রয়োজনীয়।

২৯. জাতীয় চরিত্র

একটি জাতির চরিত্রের উন্নতি তার সৎসাহস, ধৈর্য্য, সততা এবং ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষমতা দিয়ে ধরা পড়ে। জাতি যখন বড় হয়, তখন সে শিল্পে, সাহিত্যে, অর্থনীতিতে, স্বাস্থ্যসম্পদে, দীর্ঘায়ুতে এবং অন্যান্য সহস্র রকমে যুগপৎ উন্নতি করবার চেষ্টা করে।

৩০. জাতীয় জাগরণ

আশা-ভরসাহীন জাতি অকাল-বার্দ্ধক্যে নুয়ে পড়ে। অকাল-বার্দ্ধক্য অকালমৃত্যু আনয়ন করে। এজন্য জাতির চিন্তাশীল অংশের উচিত হচ্ছে এমন উপায় অবলম্বন করা, যার দ্বারা হৃতাশের প্রাণে আশা জাগে, ভরসাহীনের বুকে ভরসা আসে। ইতিবাচক উপদেশ ও প্রেরণা দিয়ে জাতির মন থেকে ভীতি-বিহ্বলতা, আলস্য-জড়তা ও পঙ্গুতা যাঁরা দূর করেন, তাঁরাই দেশের প্রকৃত বান্ধব।

৩১. ত্যাগ

দেশের যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীদের মনে যখন ত্যাগবুদ্ধির প্রবল বন্যা আসে, মানিতে হইবে যে, তখন দেশের সুবর্ণ-যুগ চলিতেছে। কিন্তু দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুত্ব অধঃপতন ঘটিলে, সকলের অজ্ঞাতসারে মানুষের মনের সকল ত্যাগবুদ্ধি জলবদ্বুদের ন্যায় অভাব-সমুদ্রে মিলাইয়া যায়।

৩২. ত্রিদণ্ড

ত্রিদণ্ড একটি বিশেষ সংকল্পের প্রতীক্। ত্রিদণ্ড-ধারণ মানে ত্রিবিধ সংযম পালন। বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড, কায়দণ্ড- এই ত্রিবিধ দণ্ড বা সংযম পালনে সংযম; হস্তধৃত দন্ড সেই দণ্ডের বা সংযমের স্মারক।

৩৩. দুর্নীতি

সাহিত্যে, শিল্পে, বিদ্যাচর্চায়, জীবনসংগ্রামে, শিক্ষায় বা জনসেবায় আমরা কদাচ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিব না, — এইটি আমাদের পণ হওয়া উচিত। এই বিষয়ে বোধশক্তি আমাদের উদ্দীপিত হওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন। আমরা যেন চক্ষু লজ্জায় পড়ে, সামাজিক দুর্নীতি বিস্তারে পরোক্ষ সহায়তা কদাচ না দেই।

৩৪. দেশপ্রেম

আপনাদের প্রত্যেকের এই দেশের প্রতি অবশ্য করণীয় কর্তব্য রয়েছে। একজনও এই কর্তব্যের দায় থেকে নিজেদিগকে অনায়াসে মুক্ত ভাবতে যেন চেষ্টা না করেন। এই দেশের মাটিতে জন্ম নিয়ে দেশমাতৃকার ঋণ পরিশোধের চেষ্টা যাঁরা করবেন না, তাঁরা কর্তব্যজ্ঞানহীন মূঢ় এবং হীন কাপুরুষ। তাঁরই জন্য এই চরিত্র গঠন-আন্দোলন।

৩৫. দেবালয়

দেবালয় নিজেই একটি প্রচণ্ডশক্তি। তাস-পাশা না খেলে, পরচর্চা না করে, যদি দেশের সবগুলি হরিসভা ও চণ্ডীমণ্ডপে সৎকর্মের ও সৎচিন্তার অনুশীলন চল্‌তেই থাকে, তাহলে এই এক-একটি ধর্মস্থানে দেশের মানুষের চরিত্র সাত্ত্বিকভাবে গড়ে উঠতে বাধ্য।

৩৬. ধর্মনীতি ও রাজনীতি

রাজনীতিতে আর ধর্মনীতিতে বড় বাগড়া। উভয়ের প্রকৃতি আলাদা। ধর্মের কাজ সর্বজীবে সমদর্শিতা সৃষ্টি করে, জীবে-জীবে ঐক্য সাধন। ধর্মের কাজ জীবের জীবত্ব ঘুচিয়ে তাকে শিবত্ব দান। রাজনীতির কাজ হচ্ছে নাগরিক অধিকার আদায় করা। ঘৃণা, দ্বেষ ও মিথ্যার অনুশীলন ছাড়া রাজনীতি-চর্চা বড় কঠিন। রাজনীতিকেরা অধিকাংশ সময়েই ভাষার লালিত্যে ঘৃণা-দ্বেষ-অসত্যকে ঠিক বিপরীত ব্যাখ্যা দিয়ে কাজ করে থাকেন।

আমার বিশ্বাস, ভগবৎ-প্রেমিক পুরুষ যেদিন দেশের দুঃখে ব্যথিত হবেন, আর স্বদেশ-প্রেমিক পুরুষ যেদিন ভগবানের মুখপানে তাকিয়ে চলবেন, সেদিন ভারতবর্ষ তার প্রকৃত দুঃখ কটাক্ষে দূর করতে পারবে।

৩৭. ধর্মান্তর

ইন্দ্রিয়সুখের লোভে পড়ে যারা ধর্মান্তর গ্রহণ করে, তাদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ — চারিটিই যায়, একটিকেও তারা পায় না। একজন ভারতীয়কে খৃষ্টান বা মুসলমান করার অধিকার যদি খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মগুরুদের থাকে, তবে একজন অহিন্দুকে হিন্দু করে নেওয়ার অধিকারও হিন্দু ধর্মগুরুদের নিশ্চয়ই থাকবে।

৩৮. নারী-নৃত্যের বিরোধিতা

জাতির চরিত্রচ্যুতি আস্তে-আস্তেই হয় এবং যখন সে প্রকাশ্য রূপ পরিগ্রহ করে,

তখন তা হয় অতীব ভয়ঙ্কর। সঞ্জীবনীর সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, তাই তিনি নারী-নৃত্যের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে লেখনী ধারণ করেছেন। আমি অদূর ভবিষ্যতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তাই আমার কণ্ঠ নারী-নৃত্যের বিরুদ্ধে গর্জ্জন করছে।

৩৯. নারী শক্তি

কল্পনা করে দেখ ত সেই সহস্র-সহস্র অভাগিনী নারীর কথা, যাদের নাদির শাহ বা তৈমরলং পায়ে হাটিয়ে দিল্লী থেকে পারস্য দেশে নিয়ে গিয়েছিল, যারা পথে-পথে ভারত-আক্রমণকারী বর্ব্বর সৈন্যদের দ্বারা বারংবার উৎপীড়িতা হয়েছিল, যারা বাকী জীবৎ-কালটুকু বিভিন্ন খরিদ্দারের হাতে পড়ে-পড়ে সকল মানুষের অজ্ঞাতসারে চূড়ান্ত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

স্ত্রীজাতির মধ্যে থেকেই আজ এমন সব মহিলা-দধীচির উদ্ভব সম্ভব করতে হবে, যাঁরা অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বজ্রের উপাদান হয়ে থাকবেন। অশিক্ষিতা নারী পশু থেকে যাচ্ছে, শিক্ষিতা নারী বিবি হচ্ছে। এর প্রতীকার তোমরাই করবে।

৪০. নাস্তিক

নাস্তিক নানা-প্রকার, যথা — প্রমাণ নিষ্ঠ নাস্তিক, প্রত্যক্ষ-নিষ্ঠ নাস্তিক, অনুমান-নিষ্ঠ নাস্তিক, আপ্ত-নিষ্ঠ নাস্তিক, দরিদ্র-নিষ্ঠ নাস্তিক, অভিমানী নাস্তিক, সুবিধাবাদী নাস্তিক।

৪১. নৈবেদ্য

প্রসাদ বিতরণ কালে প্রসাদ সুবিধাজনক ভাবে বিতরিত হইতে পারে এবং ব্যয় অল্প পড়ে, সেই দিকে তাকাইয়াই নারিকেলের নাড়ু এবং খৈয়ের মোয়াকে বাধ্যকর করিয়াছি।

৪২. পল্লী সম্পদ

মহাত্মারা ভারতের পল্লী-সম্পদ। তাঁরাই আমাদের অজ্ঞাতসারে সমগ্র জাতিটার মেরুদণ্ডটাকে শক্ত করে দিচ্ছেন। কর্ম্মীলোক আর এক পল্লী-সম্পদ। কিন্তু কর্ম্মীলোকেরা সব গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে ভীড় করছেন, গ্রামগুলি অকেজো, নির্ব্বোধ, আত্মকলহ-পরায়ণ, অকুশল-কৌশলী লোকের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

৪৩. পল্লী- সেবা

পল্লী সেবার শ্রেষ্ঠউপায় হল পল্লীর মধ্যে পবিত্র চিন্তার প্রসার সাধন। সরল, সহজ,

সাবলীল স্বচ্ছন্দ-গতিতে প্রবাহিত জীবকল্যাণমূলক স্বাধীন ও নির্বিরোধ চিন্তা। নিঃস্বার্থ যাঁর চিত্ত, আর সংযত যাঁর মন, একটি গ্রামের ভিতরে বসে থেকে যদি তিনি মুখের কথাটিও না কন, তবু তাঁর শুদ্ধ চিন্তা সকলের অশুদ্ধ জড়তার অবসান-পথ রচনা করতে সমর্থ হয়।

৪৪. পতন

ঋষির পতন কামে, রাজার পতন ক্রোধে, ব্রাহ্মণের পতন লোভে, আর বক্তার পতন অহংকারে।

৪৫. পরনিন্দা

পরনিন্দা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। পরনিন্দাকে মহাপাপ বলে জানবে, মহানরক বলে জানবে। নিন্দায় নিন্দা বর্দ্ধিত হয়। মহোৎসবের খিচুড়ী খাবে আর বৈষ্ণবধর্মের নিন্দা করবে — এসব অতীব অসমর্থনীয় আচরণ। যার ধ্যান নিজ ইষ্টকে নিয়ে যত জমে, তার পক্ষে পরনিন্দার সম্ভাবনা ও প্রবৃত্তি তত কমে যায়।

৪৬. প্রতিষ্ঠান

যে-কোন প্রতিষ্ঠানই গড়তে যাও না কেন, ভাবের দিক্ দিয়ে তোমাকে হতে হবে খাঁটি এবং সমভাবের ভাবুকদের একত্র জড় করা হবে প্রয়োজন। আশ্রমটির চারপাশে কর্মীনামধারী বা পৃষ্টপোষকরূপী অনেক-অনেক লোকই এসে জড় হলেন, কিন্তু তাঁদের কারো-কারো ভাবের ঘরে হয়ত দস্তুরমত ফাঁকি থেকে গেল। জানবে, এটি একটি বিপজ্জনক অবস্থা। দেখ্‌তে না দেখতে, কর্তৃত্ব নিয়ে, নেতৃত্ব নিয়ে, টাকা-কড়ি আদান-প্রদান নিয়ে, উৎসবের বা সভা-সমিতির কর্মতালিকা নিয়ে, পরিশেষে ব্রহ্মচারীদের কাপড়-জামা-কৌপীন নিয়ে পর্য্যন্ত রাম-রাবণের যুদ্ধ বেঁধে যাবে।

যার যেটুকু প্রাপ্য সম্মান, সেটুকু তাকে দিও, কিন্তু নিজে সম্মানের জন্য লোলুপ হয়ে নিজের মূল্য কমিয়ে দিও না। কারো সঙ্গে শত্রুতা কোনও অবস্থাতেই রাখবে না। নিজেকে কদাচ স্থানীয় লোকের কলহ-বিবাদের সঙ্গে জড়িয়ে দেবে না। অন্তরে বিনয় না থাকলে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, দূরদৃষ্টিও কমে, বুদ্ধিশুদ্ধিও ক্রমে-ক্রমে লোপ পায়। নিজেকে জনসমাজের তুচ্ছ ও নগণ্য এক সেবক জ্ঞান করে, নিরহঙ্কার-চিত্তে নিজ ব্রত নিজের চরিত্রবলে উদ্‌যাপন কর। নিরপেক্ষ ও সরল অন্তঃকরণে জীবনের পথ চল।

৪৭. প্রেরণা সৃষ্টি

আশ্রম গড়া অতি তুচ্ছ কাজ। মানুষের মনে উন্নতিমুখিনী প্রেরণা সৃষ্টি করে যাওয়া,

তার চেয়ে লক্ষ গুণ বড় কাজ।

৪৮. প্রার্থনা

পরমেশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিবার অভ্যাস একটি মহাশক্তির উৎস। হে ভগবান, আমাকে ধন দাও, জন দাও, মান দাও, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি দাও — এই প্রার্থনা করিবে না। প্রার্থনা করিবে— তুমি তোমার সৃষ্টিকে সুন্দর ও মহান করিয়া তোল, প্রত্যেকটি প্রাণীকে উন্নতি মুখাভিমুখী কর। প্রার্থনা করিবে, মানুষের সহিত মানুষের দূরত্ব বিদূরিত কর, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও মিথ্যাশ্রয় চিরতরে অবসান লাভ করুক।

৪৯. পাহাড়ী

আজই তোমাদিগকে পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। পাহাড়ীরা জাতির জঞ্জাল নহে, তাহারা সমাজের সম্পদ। আদিম যুগের সরলতা লইয়া আজও যে তাহারা ক্ষুধা ও অজ্ঞানতার সহিত যুদ্ধ করিয়া পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়া আছে, ইহা এক আশ্চর্য ব্যাপার। আদিম যুগের সেই সরলতাকে আধুনিক যুগের কর্মনিপুণতার সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া ইহাদের মধ্যে অভ্যুদয়ের এক নূতন চন্দ্রিকার সৃষ্টি করা সম্ভব।

৫০. বন্দেমাতরম্

বন্দেমাতরম্ মন্ত্র যাহার দেশাত্মবোধকে জাগরিত করিয়াছে, তাহার পক্ষে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সাধনা করা অতি সহজ। রাজনীতি তুমি কর আর না কর, নিজ জন্মভূমিকে মাতা বলিয়া ভাবিবার তোমার প্রয়োজন আছে। দেশকে যাহারা মাতা বলিয়া গণনা করে, তাহাদের দৃষ্টিতে দেশবাসী প্রত্যেক পুরুষ ও নারী তাহার ভ্রাতা এবং ভগিনী।

৫১. বন্ধু

যারা ভালবাসতে শেখায়, তারাই বন্ধু। যারা দ্বেষ করতে শেখায়, তারা শত্রু। যারা স্নেহ, মমতা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পথে টেনে নেয়, তারাই বন্ধু। যারা ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, প্রতিশোধ ও অধৈর্য্যের দিকে টেনে আনে, তারা শত্রু। যারা সংযম, সাহস, শৌর্য্য দেয়, তারা বন্ধু। যারা অসংযত, ভীরু দুর্বল করে, তারা শত্রু। যারা সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জনে প্রেরণা দেয়, তারা বন্ধু। যারা মিথ্যার সাথে আপোষ করতে প্রবৃত্তি দেয়, তারা শত্রু।

৫২. বিচার বিভ্রান্তি

তোমার চক্ষু বা তোমার বুদ্ধি তোমাকে প্রতারিত করতে পারে, কিন্তু সাধন-লব্ধ

প্রজ্ঞা কাউকে প্রতারিত করে না। শত-শত বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রকৃত উপায় হচ্ছে সুতীব্র সাধনা। সাধনের ফলে যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয়, তার কাছে বিদ্বানের বিদ্যার, তার্কিকের তর্কের, কথকের কথার এবং ব্যাখ্যাতার ব্যাখ্যার ভুলচুক ধরা পড়ে।

৫৩. বিদ্যা

জীবনের যে-পথেই যাও, বিদ্যা-অর্জনকে সহকারী করে নিও। বিদ্যা-অর্জনকেও একটি তপস্যা বলেই মনে করো। অতীতকালে 'স্বাধ্যায' তপস্যারই অঙ্গ ছিল। নিজেরা বিদ্যা-অর্জন কর এবং প্রত্যেক নর-নারীকে বিদ্যাধনের অধিকারী কর। বিদ্যাশিক্ষা না করাটাই একরকমের পাপ।

৫৪. বিপ্লব

বিপ্লবের ফল সুদূর প্রসারী। শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে স্থাপত্যে, সমাজনীতিতে, জীবনযাপনরীতিতে, চিন্তায় এবং কর্মে বিপ্লবের প্রভাব সুদূর প্রসারী। জাতির শিরোদেশ থেকে পদনখাগ্র পর্যন্ত এমন কিছু নাই, যাকে বিপ্লব স্বস্থানচ্যুত করে না, এবং সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয় না। বিপ্লবের এই সর্বগ্রাসী সর্বনাশা মূর্তি দেখে, ধীরস্থির বুদ্ধির লোকদের হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়। সব কিছু বিপ্লবিত করে ডুবিয়ে দেয় বলেই তার নাম বিপ্লব।

৫৫. বিবাহিত জীবন

বিবাহিত জীবনের সাতটি ভিন্ন ভিন্ন দশা আছে, যথা — সশঙ্ক দশা, মুহ্যমান দশা, উন্মাদিত দশা, বিচারিত দশা, বিরক্ত দশা, সংযত দশা, দিব্য দশা।

৫৬. বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের মতন এমন নিখাদ নিষ্কলঙ্ক জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ভারতবর্ষে অতীতে কারো ছিল না এবং এখনো কারো নাই।

৫৭. বৈষ্ণবদের পঞ্চরস

শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্য রস, মধুর রস বা কান্ত রস — এই পঞ্চরসতত্ত্ব বৈষ্ণব-শাস্ত্রে কথিত আছে, বোঝাবার সুবিধার জন্য। বাস্তবিক রস কখনো পাঁচটা নয়। রস একটা। রসেই পরমাত্মার পরিচয়।

৫৮. ব্যাভিচার

তোমরা সর্ববিধ ব্যভিচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হও। উন্নতিলিপ্সু জাতি কোনও পাপ বা বিলাসিতার সঙ্গে আপোষ রাখতে পারে না। রণদুর্দ্ধর্ষ মনোবৃত্তি নিয়ে ব্যভিচারকে সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত কর। তার শ্রেষ্ঠউপায় শিক্ষা ও চরিত্রবল।

৫৯. ব্রহ্মচর্য

প্রাচীন আর্য্য-ঋষিদের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্কল্প করার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের উন্নতির গতি বেড়ে গেল। ব্রহ্মচর্য্যকে উপহাস করে যেসব মানুষ, তাদের জন্তু-পর্যায়ের বলে জানবে। বীর্য্য ধারণত' ব্রহ্মচর্য বটেই, কিন্তু কুকথা না বলাও ব্রহ্মচর্য, কুচিন্তা না করাও ব্রহ্মচর্য; কুচিত্র না আঁকাও ব্রহ্মচর্য; কাউকে কুচিত্র না দেখানও ব্রহ্মচর্য, অপরকে কুচিন্তার হাত থেকে রক্ষা করাও ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য ভারতীয় সভ্যতার শুদ্ধতম আদর্শ বা মেরুদণ্ড। ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শাশ্বত স্তম্ভ হইতেছে ব্রহ্মচর্য। কায়িক সংযম, বাচিক সংযম, দৃষ্টি সংযম, শ্রুতি সংযম, মনঃসংযম প্রভৃতি সর্বপ্রকার সংযমই ব্রহ্মচর্যের উপাঙ্গ। ব্রহ্মচর্য স্পর্শমণি স্বরূপ।

৬০. ব্রাহ্ম সমাজ

ব্রাহ্ম সমাজের লোকদের সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও সাধুতা এক সময়ে এমন প্রসিদ্ধ ছিল যে, কোনও বিচারালয়ে এঁরা কেউ সাক্ষ্য দিতে গেলে বিচারকেরা বল্‌তেন— এঁর পক্ষে সত্যপাঠ বা শপথের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ইনি ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মোরা মিথ্যা কথা বলেন না।

৬১. ভাগ্যবান্‌

সেই প্রকৃত ভাগ্যবান্‌, যে বৃদ্ধবয়সেও বলিতে পারে— যৌবনে শক্তির অপচয় করি নাই। অর্থের অপব্যয় ঘটাই নাই, কাজের সময় বৃথা বহিয়া যাইতে দেই নাই, এমন ব্যক্তির সুদীর্ঘ জীবন স্বর্গসুখ- সমন্বিত হয়।

৬২. ভারত

সমগ্র জাতি আজ অবসাদ-জড়তা গ্রস্ত। এর মূল কারণ হচ্ছে বাহুবলে অবিশ্বাস, আত্মশক্তিতে অনাস্থা। দৈবের ঘাড়ে চেপে আমরা স্বর্গে যেতে চাই, পায়ে হেঁটে যুধিষ্ঠিরের মত হিমালয়ের চড়াই-উৎরাই ভাঙ্গতে চাই না। অভিক্ষাব্রতের যদি কোন মহৎ-উদ্দেশ্য থাকে, তবে তা হচ্ছে, এই দৈবরূপী ভূতকে পুরুষকাররূপী মন্ত্রপূত সর্ষপের বলে জাতীয়

জীবনের ঘাড় থেকে নামানো।

৬৩. মন্ত্র

প্রত্যেকটি শব্দ এক-একটি কোহিনূর। অপব্যয় করতে নেই। শব্দ মাত্রেই এক একটি মন্ত্র। মন্ত্র মাত্রেই এক-একটি শব্দ। শব্দ যখন মনন-অভিমুখী এবং বারংবার স্মরণীয় হয়, তখন সে হয় মন্ত্র। মন্ত্র যখন প্রকাশ-অভিলাষী এবং বাইরের লোকের সহিত সংস্পর্শের অভিসারী হয়, তখন সে হয় শব্দ।

৬৪. মণ্ডলী

মণ্ডলী স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাকে সুনিশ্চিত করে দেওয়া এবং নিয়মিত উপাসনা পরিচালনা করা। উপাসনাটি যদি সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, তাহলে অন্যান্য সৎকার্যের অনুষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি স্বভাবতঃই সৃষ্ট হবে। পারস্পরিক প্রীতির মাধ্যমে ঐক্য সাধিত হবে।

৬৫. মানুষ

সৎলোক, সাধু স্বভাবের মানুষ খোঁজ কর। যাঁরা পরস্ব-অপহরণ করেন না, যাঁরা সত্যশীল থাকবার চেষ্টা করেন, যাঁরা নিজেদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেও দশজনের স্বার্থকে সেবা দেবার চেষ্টা করেন, যাঁরা পরোপকারী, যাঁরা ইন্দ্রিয়-সংযমে চেষ্টিত — এমন মানুষদের সঙ্গে যদি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে নাও পার, তবুও তাঁদের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনেই তোমার অনেক উপকার হবে।

৬৬. মৌনব্রত

মৌনের শক্তি অভাবনীয়। আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের মত সে শক্তি হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। বাক্যকে সংযত কর এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তির সঞ্চয় রাখো। তুব্‌ড়ীর মত সব শক্তি এখনি নিঃশেষিত করে দিও না। মৌন অবস্থায় যা দেখবে, যা শুনবে, যা ভাববে, তা দীর্ঘকাল মনের উপর ক্রিয়াশীল থাকে। কারণ মৌনের ফলে মন একাগ্র হয়। মৌনব্রত নেওয়া হয় মনকে যাবতীয় কুবিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য।

৬৭. যৌবন

সুখময়, শান্তিময়, তৃপ্তিময়, আত্মপ্রসাদময় বার্দ্ধক্যের চিত্র যদি মনে অঙ্কিত করিয়া থাক, তাহা হইলে যৌবনকে তদনুরূপ পরিচালন করিতে প্রয়াসশীল হও। সকলেই দীর্ঘায়ু

চাহে, কিন্তু বার্দ্ধক্য চাহে না। যৌবনের মিতাচার, যৌবনের পরিণামদর্শিতা, যৌবনের হিসাবপ্রিয় সন্তর্পণ পদসঞ্চার বার্দ্ধক্যকে বার্দ্ধক্য-ভার হইতে মুক্তি প্রদানে সমর্থ হয়।

৬৮. রাজনীতি

অধার্মিকের হাতে রাজনৈতিক মহানায়কের রাজদণ্ড পড়লে, তিনি নিজের চরিত্র-ভ্রংশতার দরুণ সাময়িক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভুলের দ্বারাও সমগ্র জাতির সুদীর্ঘকালের দুর্ভাগ্য রচনা করতে পারেন। রাজনীতি বড় জটিল নীতি৷ এর অনেক কথাই সুবিধাবাদ। এতে চরিত্রের সততা বা সত্যনিষ্ঠা কমে যায়।

৬৯. শক্তি

শক্তির উৎস বহুবিধ। জ্ঞানই শক্তি। বুদ্ধিই শক্তি। ঐক্যই শক্তি। চেষ্টাই শক্তি। সংগ্রামই শক্তির উৎস। আত্মবিশ্বাসই শক্তির উৎস। সংযম, ব্রহ্মচর্য ও চরিত্রবলই সর্বশক্তির মহত্তম উৎস।

৭০. শান্তি

ত্যাগ ও সংযমের পথই শান্তির পথ, আনন্দের পথ। লোভ ও লালসা জগতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। অসংযম ও সম্ভোগেচ্ছা মানুষকে পাগল করিয়া তুলিয়া মাত্রাহীন অমিতাচারে আসক্ত ও নির্জ্জীব করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের সর্বসম্পদ অপহরণ করে। ত্যাগ ও সংযমের সহিত পরমেশ্বরের নাম যুক্ত কর।

৭১. শিক্ষা

ছাত্র-শিক্ষার মূল কথা পিতৃ-মাতৃ শিক্ষা। শিক্ষক আর অধ্যাপকেরা সৎ জীবন যাপন কচ্ছেন কিনা, তারও প্রভাব তথা প্রতিক্রিয়া বারংবার ছাত্রদের উপর এসে প্রতিফলিত হবে। তাই সংশোধন শুধু ছাত্রদেরই নয়, শিক্ষাদাতা ও জন্মদাতা উভয়েরই প্রয়োজন। আমাদের দেশের শিক্ষাবিষয়ক প্রাচীন চিন্তা এই তিনটির দিকে সমান দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করেছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক হতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক ও জৈবিক উদ্দেশ্য অন্ন-অর্জন করার যোগ্যতা লাভ করা, জীবন সংগ্রামে পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা, সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করা। তারপরে উদ্দেশ্যটিই হচ্ছে জ্ঞান লাভ করা, সদ্-অসৎ বিচার করে অসৎকে বর্জন ও সৎকে চেনার ক্ষমতা লাভ করা, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে চিনে নেওয়া, মনুষ্য-জন্ম লাভের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা। কিন্তু তার

চেয়েও বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন চরিত্রলাভ করা যার ফলে সৎকে চেনার পরে হাজার প্রলোভনেও মন টলে গিয়ে অসৎ পথে চলবে না।

৭২. শিশু-শিক্ষা

শিশুদিগকে শিশু মাত্র মনে করিয়া উপেক্ষা করা উচিৎ নহে। বটের বীজটা ছোট, কিন্তু তাহার সম্ভাব্যতা ছোট নহে। আজিকার অবোধ, অক্ষম অপরিণত শিশু কালিকার বর্ষীয়ান নেতা বা প্রাজ্ঞ কুলপতি। প্রত্যেকটি বালক-বালিকার বিরাট সম্ভাব্যতার দিকে তাকাইয়া, তাহার কাণে ছোট-ছোট আকারে বড়-বড় কথা প্রবেশ করাইবে।

সমাজপতিরা সমাজ শাসন করিতে পারেন, মানুষ গড়িতে পারেন না। রাজনৈতিক নেতারা ভোটের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারেন, শাসন ক্ষমতা অধিকার করিতে পারেন, কিন্তু তোমরা যাহা পার, তাহা করিতে পারেন না। তোমাদের নিজেদের ভিতর আত্মবিশ্বাসের প্রচুর অভাব রহিয়াছে বলিয়াই তোমরা এই শিশুগুলির ভাবী জীবনের অপরূপ কোনও গরিমা বা মহত্ব সম্পর্কে কল্পনাপরায়ণ হইতে পারিতেছ না। বিশ্বাস কর যে, তোমরাই বাল্মীকি, তোমরাই ব্যাসদেব।

৭৩. শিষ্য

একটি দিয়াশলাই দিয়া প্রদীপ ধরাইলে, দিয়াশলাই গুরু, প্রদীপ শিষ্য। প্রদীপে সলিতা ও তৈল না থাকিলে, শত দিয়াশলাই পুড়িলেও জ্বলিত না। এই হিসাবে শিষ্যই প্রধান, গুরু অপ্রধান। আবার দিয়াশলাই না হইলে, শত সলিতা বা তৈল থাকিলেও আলো হইত না। এই হিসাবে গুরু প্রধান, শিষ্য অপ্রধান। চিরকাল জগতে গুরু শিষ্যকে এবং শিষ্য গুরুকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে।

৭৪. শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলা আর আজ্ঞাবহতা সংঘের প্রাণ। কর্তৃত্বলিপ্সা সঙ্ঘের ধ্বংসের সিঁড়ি। ক্ষুদ্র কাজেও শৃঙ্খলা প্রয়োজন।

৭৫. শ্রম

জগতে পরিশ্রমেরই জয়-জয়কার চতুর্দ্দিকে। আলস্যের কোন জয়ধ্বনি নেই। পেট ভরে খেতে চাও, পরিশ্রম কর। ভাল কাপড় পরতে চাও, পরিশ্রম কর। সুনিদ্রা লাভ করতে চাও, পরিশ্রম কর। স্বাস্থ্যবান হতেচাও, পরিশ্রম কর। লোক-সম্মান পেতে চাও, পরিশ্রম কর। দশজনকে সুখী করতে চাও, পরিশ্রম কর। দেশের ইতিহাস বদ্‌লে দিতে

চাও, পরিশ্রম কর। মহাজাতি সৃষ্টি করতে চাও, পরিশ্রম কর। তবে তালে-বেতালে শ্রম করলে চলবে না।

৭৬. সংগঠন

মহৎ ব্রত, মহৎ পণ, সবার গোড়ায় সংগঠন। কোথায় কি আছে অজ্ঞাত উপাদান, অব্যবহৃত উপাদান, অবজ্ঞাত উপাদান, অপব্যবহৃত উপাদান তার খোঁজ, সঞ্চয়, আদর আবশ্যক। ইহা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা - ঐসব উপাদানের ভিতরে সম্পূর্ণ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তৃতীয় কথা - ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উত্তম, অধম অধিকারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রাণে একটি মাত্র লক্ষ্য লাভের জন্য উন্মাদনা সৃষ্টি করতে হবে। হাতে কাম, মুখে নাম।

৭৭. সংগীত

গান শিখিতে চাহ খুব ভাল কথা। সৎ সঙ্গীত শিখিতে চেষ্টা করিও। নর-নারীর যৌন মিলনের আবেদনপূর্ণ সঙ্গীতের শিক্ষা, অনুশীলন ও প্রচার সম্পর্কে সংযত বা একেবারেই বিরত থাকিও। মনের ভিতরে সুপ্ত পশুটাকে অমনিই ত সারা দিন সারা রাত্রি কত উত্তেজনা সরবরাহ করিতেছ। তাকে আবার সঙ্গীতের মোহিনী মায়া দিয়া মুগ্ধ করিয়া ষোল কলা জাগ্রত করিয়া কি লাভ ? সঙ্গীত প্রাণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য, অপরের মনে দিব্যরস সঞ্জননের জন্য ; ইন্দ্রিয়-বিকার সৃষ্টির জন্য নহে।

৭৮. সংস্কৃত

সংস্কৃত ভাষার বিরাট ও গৌরব-উজ্জ্বল একটা অতীত আছে। স্মরণাতীত কাল থেকে সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে। সংস্কৃতের মেজাজ সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। এই মেজাজটুকুর জন্য সংস্কৃত ভাষা বিশ্বহিতকারী।

সাহিত্যিক উচ্চচিন্তার জগতে বিচরণ করিতে হইলে বাংলা, হিন্দী, গুজরাতি, মারাঠী, তামিল আদি কয়েকটি ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে ভারতীয় সারস্বত বন্দনার পুষ্পপাত্র পূর্ণ হয় না। আর, ইংরাজী না জানিলে যেমন বর্তমানে বিশ্ব সাহিত্যের দুয়ার খোলা যায় না, সংস্কৃত না জানিলে তেমনি লক্ষ বছরের প্রাচীন ভারতবর্ষকে চেনা যাইবে না। নানারূপ বিপত্তিকর ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতই লক্ষ বছরের অতীতকে সগর্বে এদেশে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছে ; একাজ মিশরের প্রাচীন ভাষা করিতে পারে নাই, মিট্টানির ভাষাও নহে, ব্যাবিলনের ভাষাও নহে। প্রাচীন সংস্কৃত যেভাবে আজ পর্যন্ত আধুনিক সংস্কৃতে এবং সর্বাধুনিক বাংলায় বাঁচিয়া আছে, প্রাচীন গ্রীক বা ল্যাটিন ভাষা আধুনিক

গ্রীক বা ইটালিয়ান ভাষার ভিতরে সেভাবে নাই, অর্থাৎ আজও সংস্কৃত ভাষা জীবিতই আছে।

শ্রবণ-রসায়নী ভাষা এই সংস্কৃত ততকাল থাকবে, যতকাল হিমালয় আছে। ততকাল সংস্কৃত থাকবে, যতকাল ভারত মহাসাগর আছে। বসুধৈব কুটুম্বকম্-এটাই এর সার বানী। সংস্কৃতের যেদিন মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে, সেদিন এই রত্নমালা থেকে একটি দুটি করে নক্ষত্রবৎ উজ্জ্বল মহামাণিক্য আলগা হয়ে ছিঁড়ে খসে পড়তে পারে।

৭৯. সাংবাদিকতা

সাংবাদিকতাকে ব্যবসায়ের দৃষ্টিতে কদাচ দেখবেন না। দেশের প্রকৃত হিত কিসে হতে পারে, সেইটাই আপনাদের আগে দেখা কর্তব্য। সংবাদের চমক সৃষ্টি করে, কাগজের বিক্রয়-সংখ্যা বর্দ্ধনই কদাচ আপনাদের লক্ষ্য হতে পারে না।

৮০. সাধন

মন্ত্র লয়, কিন্তু তার না করে সাধন
ব্রত লয়, কিন্তু তাহা না করে পালন।
বীজ কিনে, কিন্তু তাহা না করে বপন
গ্রন্থ কিনে, কিন্তু নাহি করে অধ্যয়ন।
মন্দির গড়িয়া তাহে না করে অর্চ্চনা
গাভী কিনি তারে নাহি দেয় তৃণ-কণা।
বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে না করে রক্ষণ
বৃক্ষ রুপি নাহি করে সলিল-সিঞ্চন।
মূলধন লভি নাহি করে ব্যবসায়
অলক্ষিতে সেই জন অধঃপথে ধায়।।

৮১. সাবধানতা

সাবধান থাকার মানে কাউকে সন্দেহ করা নয়, সাবধান থাকার মানে হচ্ছে নিজের কোন দুর্বলতার দরুণ নিজেই নিজের পক্ষে ক্ষতিজনক কিছু যেন করে না বসি। নিজেকে আত্মরক্ষায় অক্ষম বলে ভাববার দরকার নেই। কিন্তু আত্মরক্ষায় সুসমর্থ ব্যক্তিরাও অনেক

সময়ে জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলগুলি করে থাকে হঠাৎ ভুলে। হঠাৎ কোনো ভুল না করি, তার জন্যই চাই সতর্কতা। সতর্কতা পাপ নয়, অপরাধ নয়, দোষও নয়। সতর্কতা একটা গুণ। নিজের চরিত্রের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অতন্দ্র প্রহরায় থাকার নাম সতর্কতা।

৮২. সাধু

সাধু চিনিবার একাধিক উপায় আছে, যথা —

ক) যাঁকে দেখলে প্রাণের ভিতর আপনা আপনি ইষ্টনাম হতে থাকে, তিনি সাধু। খ) যাঁকে দেখ্‌লে জীবে প্রেম জন্মে, তিনিই সাধু। গ) যাঁকে দেখলে সংশয়-নাশ হয়, তিনিই সাধু। ঘ) যাঁর সঙ্গ করলে সংশয়- নাশ না হোক নতুন সংশয় জন্মে না, তিনিই সাধু। ঙ) সাধুর প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে এই যে, তিনি সাধন করেন।

৮৩. সাহিত্য

কোন সাহিত্য-কর্ম দ্বারা কোনও জাতি বড় হয় না। সাহিত্যানুরাগ, সাহিত্যসৃষ্ঠির দক্ষতা এবং সাহিত্যের সুপ্রসার-সাধন কোনও জাতির চিন্তাশক্তির দ্রুত ধারণক্ষমতার প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু সৎ সাহিত্য যে - সকল কল্যাণময় নির্দ্দেশ ও ইঙ্গিত প্রদান করিয়া থাকে, তদনুযায়ী জনে- জনে নিজেদের আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও বাহ্য কর্মচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় লাগিয়া যাইতে পারিলে জাতি বড় হয়।

৮৪. স্বাধীনতা

আমরা সাধু-সন্তেরা স্বাধীনতাকে উপনিষদীয় মন্ত্রের ভাষায় চিন্তা করি। অর্থাৎ আমরা চাই আত্মার স্বাধীনতা। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে, অন্তরের স্বাভাবিকস্ফূর্ত্তি পদে- পদে প্রতিহত হয়, বাধা পায়, মন পঙ্গু থাকে, প্রাণ জড়বস্তুতে পরিণত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাওয়ার আগে, পাওয়ার পরে, সর্বসময় আমাদের চারিত্রিক উন্নতি অব্যাহত থাকা প্রয়োজন।

আজ দেশ ও জাতির বড়ই দুর্দিন, তোমাদের সত্য মানুষ হতে হবে। মানুষের পোষাকপরা কতকগুলি জন্তুর বিচরণে মাতা বসুন্ধরা বড়ই পরিক্লান্তা হয়েছেন। আজ তোমাদের এমন হতে হবে, যাদের চরণ স্পর্শে ধরিত্রীর সর্ব পাপ নিবারিত হয়, সর্ব পাপ দূরীভূত হয়, সর্ব ক্লেশ নাশ হয়।

স্বামী স্বরূপানন্দের চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত সার

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিকশিত নব জাগরণ বঙ্গদেশ থেকে বহুমুখী রূপ নিয়ে বহুদূর বিস্তার লাভ করেছিল। এই আন্দোলন ছিল বিশাল,বিচিত্র, জটিল, কুটিল, বহুমুখী এবং সুদুরপ্রসারী। বহু সমাজসংস্কারক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, স্বাধীনতাসংগ্রামী, শিক্ষাবিদ্, সাধুসন্ত ইহাতে অংশ নেন। ফলে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিতে গভীরতা, তীব্রতা ও ব্যাপকতা এল। আন্দোলনকারী পথিকৃৎদের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যপ্রণালী একরূপ ছিল না। তবে অধিকাংশ মনীষীর মূল লক্ষ্য ছিল দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ করা। অবশ্য ইহার পাশাপাশি, অন্য একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিপদগামী, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী আন্দোলন ক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল।

১। যাঁদের শুভ-আবির্ভাবে শান্তি- সম্প্রীতি ও সংহতি-মূলক মুখ্য ধারাটি পরিপুষ্ট হয়েছিল, স্বামী স্বরূপানন্দ নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ব্যক্তি ও সমাজকে, অর্থনীতি- সমাজনীতি-ধর্মনীতি ও রাজনীতিকে, ধনী ও নির্ধনকে বিভিন্ন বর্ণকে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে খন্ডিত দৃষ্টিতে দেখেন নি, বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত করেন নি, একের বিরূদ্ধে অপরকে প্ররোচণা দেন নি।

২। প্রাচীন ভারত, বর্তমান ভারত এবং ভাবী ভারত-এই তিন কালের ভারতের মধ্যে এক অখন্ড সত্তার প্রবাহমান ধারা তিনি লক্ষ্য করেছেন। নানা বৈদেশিক আক্রমণের অন্ধকার ইতিহাস তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। কোন একটি বিশেষ কালকে অতীব প্রশংসা করা বা তীব্র ভাষায় নিন্দা করা তাঁর আদতে ছিল না।

৩। ভারতের শাশ্বত বাণীকে পুনঃপুনঃ প্রচাব করতে যে-সব দূত বারে-বাবে এসেছেন ভারত-ভূখন্ডে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বামী স্বরূপানন্দ। কিন্তু প্রশ্ন হল-সেই বিশেষ বাণীটি কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সেই বিশেষ বাণী একটি মাত্র নয়, একাধিক। তন্মধ্যে তিনটি বানী ছিল স্বামী স্বরূপানন্দের অত্যন্ত প্রিয়। এই তিনটি বাণী হল-অভিক্ষা, ব্রহ্মচর্য এবং চরিত্রগঠন। এই ত্রিবিধ বাণীকে তিনি অতি উচ্চগ্রামে স্থাপন করে প্রচার-প্রসার করেছেন। কোন-কোন মনীষী স্বীয় জীবনের চাইতে প্রিয় আদর্শকে অধিক গুরুত্ব দেন। সেই আদর্শ বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে পারে। স্বামীজির নিকট চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য ও অভিক্ষা হল শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বুদ্ধদেব বলতেন যে, করুণাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব তিনসত্য করে বলেছেন, কলিযুগে হরি-নাম একমাত্র সার। স্বরূপানন্দ বলতেন চরিত্রই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। স্বরূপানন্দ বলে গেলেন সব যুগেই চরিত্রই একমাত্র সার। তলীহীন ডুলা মাছ ধরে রাখতে অক্ষম, চরিত্রহীন লোক মহৎ কিছু অর্জন করতে ও ধরে

রাখতে অক্ষম।

৪। সমাজে বিদ্যমান বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেই, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার প্রয়াস ভারত চিরকাল করে আস্ছে। বেদের ঋষি আহবান করেছিলেন সমাজস্থ লোকের চলন-বলন,বিচার-বুদ্ধি যেন একরূপ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব(১৪৮৬-১৫৩৩ খৃঃ) আহ্বান করেছিলেন সকলে যেন সংকীর্তনে যোগদান করে। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১ খৃঃ) আহ্বান করেছিলেন সকল সাধক যেন মাতৃমন্দিরে মিলিত হয়। স্বরূপানন্দ (১৮৮৭-১৯৮৪ খৃঃ) আহ্বান করেছিলেন সকলে যেন সমবেত উপাসনাতে যোগদান করে । ডাঃ হেডগেওয়ার (১৮৮৯-১৯৪০ খৃঃ) আহ্বান করেছিলেন সকলে যেন শাখাতে অংশ নেয়। স্বামী প্রণবানন্দ (১৮৯৬-১৯৪১ খৃঃ) আহ্বান করেছিলেন সকলে যেন হিন্দু মিলন মন্দিরে মিলিত হয়।

৫। মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসনে যাঁরাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন,তাঁরাই কোন-না কোন জনহিতকর কাজ করেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে আবির্ভূত এমন কয়েকজনের নাম প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে । রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খৃঃ) সতীদাহ প্রথা নিবারণ করে বিখ্যাত হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর(১৮২০-১৮৯১খৃঃ) বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা নিবারণ করে এবং বিধবা বিবাহ পুনরায় চালু করে প্রখ্যাত হয়েছেন। সহস্র বৎসর যাবৎ উপেক্ষিত সনাতন হিন্দু ধর্মকে স্বমহিমায় স্থাপন করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬ খৃঃ)অমর হয়ে থাকবেন। বিবেকানন্দ(১৮৬৩-১৯০২ খৃঃ) সেবাপ্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য শ্রদ্ধা পাবেন। স্বামী প্রণবানন্দ (১৮৯৬-১৯৪১খৃঃ) তীর্থসংস্কারের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। স্বরূপানন্দ শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবেন ক্লীবত্ব, কাপুরুষতা ও পরমুখাপেক্ষীতা দূর করার আন্দোলনের জন্য । তাঁকে মহাপুরুষ বলে শ্রদ্ধা করব এই কারণে যে, তাঁর বাক্যে, কায্যে, চিন্তায়, আমাদের আত্ম-উন্নতির সঠিক পথ-নির্দ্দেশ পাই।

৬। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খৃঃ), কেশবচন্দ্র সেন(১৮৩৮-১৮৮৪ খৃঃ) এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫ খৃঃ) ছিলেন ভারতে পাশ্চাত্য ভাবধারাকে স্বাগত জানানোর পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খৃঃ) স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খৃঃ) এবং মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খৃঃ)ছিলেন পাশ্চাত্যে ভারতের ভাবধারা প্রচারের পক্ষপাতী। স্বামী স্বরূপানন্দ ছিলেন মধ্যপন্থী।

৭। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯ খৃঃ) ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের নেপথ্যে নায়ক। তিনি কোন মিছিল করেন নি । কাউকে হত্যা করেন নি । কোন বিরাট আন্দোলন পরিচালনা করেন নি, কোনদিন কারাবাস করেন নি। অথচ তাঁর মত একজন খাঁটি স্বদেশী বড়ই দুর্লভ। তাঁর স্বাদেশিকতায় ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও ক্ষত্রীয়ের তেজ ছিল।

স্বরূপানন্দও ছিলেন আপাদমস্তক স্বদেশী । তাঁর স্বাদেশিকতায় চতুবর্ণের গুণাবলীর সমাহার ছিল।

৮। সারা পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদের বাজার বড়ই চড়া। জাতীয়তাবাদ নিয়ে রমরমা ব্যবসা-বাণিজ্য চল্‌ছে। জাতীয়তাবাদের গতি-প্রকৃতি বিচার করে ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক হল উগ্র বা বিকৃত জাতীয়তাবাদ, আরেক হল শান্ত বা প্রকৃত জাতীয়তাবাদ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ, গান্ধী এবং স্বামী স্বরূপানন্দ ছিলেন শান্ত জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। এই ধরণের জাতীয়তাবাদ হল আন্তর্জাতিকতার সোপান স্বরূপ। তাঁরা আশা করতেন, পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক যেন আত্মনির্ভর, আত্ম মর্যাদাসম্পন্ন ও পরমতসহিষ্ণু হয়।

৯। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩ খৃঃ) বহু মুখী প্রতিভার জন্য বিখ্যাত। তিনি যৌবনে পল্লী উন্নয়নের কাজে মেতে থাকতেন। বঙ্গদেশের 'ক্ষয়িষ্ণু জেলাগুলির উন্নতির উপায়' শীর্ষক প্রবন্ধে অধঃপতনের কারণ ও উত্তোরণের উপায় নির্ণয় করেছেন। তিনি বাঁকুড়া জেলার পরিস্থিতি নিয়ে খুব চিন্তাভাবনা করেছেন। স্বামী স্বরূপানন্দ সমগ্র পূর্ব বঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলাতে ঘুরে-ঘুরে দেখেছেন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ, অন্ধপুকুর পরিস্কার করা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা, প্রভৃতি কাজ করেছেন এবং করিয়েছেন।

১০। মানুষের অধঃগতির কারণ কি ? মানুষের দুঃখ -দুর্দশার জন্য দায়ী কে ? এই প্রশ্নের উত্তর নানা জন নানা ভাবে দিয়েছে । কেউ-কেউ মনে করে যে, ধনীরাই গরীবদের শোষণ করে। কেউ বলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরাই এজন্য দায়ী। স্বামী স্বরূপানন্দ এই সব উত্তরের আপাতঃ সত্যতা স্বীকার করলেও গভীর সত্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, এজন্য গভীর কারণ দায়ী। সেই কারণটি হল মানুষের ব্যক্তিগত অপদার্থতা, অলসতা, পরমুখাপেক্ষীতা, পরচর্চা, পরনিন্দা, চরিত্রহীনতা।

১১। মনীষী বলে স্বীকৃত হন তাঁরাই , যাঁরা দেশবাসীর জন্য কাঁদেন, দেশবাসীর জন্য তন-মন-ধন সৎব্যবহার করে দেন। তাঁরাই মনীষী বলে পূজিত হন যাঁদের স্বদেশপ্রেম অন্যদেশের পক্ষে ভয়-ভীতির কারণ হয় না । তাঁরাই মনীষী বলে বিশ্বনন্দিত হন, যাঁদের সমগ্র জীবনযাত্রা শাশ্বত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মানদন্ডে স্বরূপানন্দ হলেন ভারতের অন্যতম মনীষী। তিনি দেশবাসীকে কাঁদান নি । তিনি নিজেকে নিয়ে মেতে থাকেন নি। তিনি পরদুঃখকারী নন, তিনি পরদুঃখভাগী।

১২। Jack of all trades,but master of none বলে একটি কথা ইংরাজীতে বহুল প্রচারিত। স্বরূপানন্দ সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্য কি করা যায় ? তিনি নানা বিধ পেশাতে

মনোনিবেশ করেন নি, যে- কয়টিতে হাত দিয়েছেন সে-সব কয়টিতে তিনি সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। তিনি দুই হাতে চিঠি লিখতেন, তাঁর লিখিত চিঠির সংখ্যা অগণিত। তিনি খুব ভাল টাইপ করতেন। তিনি অতি উন্নত মানের ঔষধ তৈরী করেছেন। তাঁর স্থাপিত বড় বড় আশ্রম তাঁর অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করছে। তিনি বহু কবিতা লিখে গেছেন। তাঁর রচনাতে যেমন প্রাণ আছে, তেমনি মননশীলতা আছে। দৈহিক বয়সের চাইতে মানসিক বয়স অগ্রগামী ছিল তাঁর ক্ষেত্রে। যোগাসনে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন।

১৩। অনুন্নতবর্গের উন্নতির জন্য চিন্তাবিদ্‌রা,সমাজসেবকরা ও রাষ্ট্রনায়করা বিভিন্ন ধরণের পন্থার কথা নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন ধরণের সংরক্ষণ ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধাদান মুখ্য উপায় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। স্বামী স্বরূপানন্দ এই বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে এই পদ্ধতি আপাততঃ মধুর, কিন্তু পরিণামে বিষময় হবে। ভারতে স্বাধীনতার অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ যে-পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তাতে তাঁর মতামতের সত্যতা কিছুটা বলে প্রমাণিত হয়। তিনি অনুন্নতবর্গের উন্নতি চেয়েছিলেন, সেই চাওয়ার মধ্যে ফাঁকিবাজি ও গলাবাজি ছিল না। তাদের উন্নতির জন্য তাঁর নির্দেশিত পথ হল আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান, স্বাবলম্বন ও চরিত্রবলের পথ। তারা যেন পরগাছা হয়ে না যায়-এই ছিল তাঁর বাসনা।

১৪। Albert Schweitzer কর্তৃক লিখিত পুস্তক Indian thought and its Development প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে;প্রকাশক Henry Holt & Company, New York. এই বইতে ২২৭ পৃষ্ঠায় লেখক মহাত্মাগান্ধী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন [illegible] before has any Indian taken so much interest in concrete realities as Gandhi. অর্থাৎ বাস্তব সমস্যাবলীর প্রতি গান্ধীজি যতটা দৃষ্টি দিয়েছেন, এর আগে এত বেশী আর কেউ দেয় নি।

এই উক্তি আংশিক সত্য, সর্বাংশে সত্য নাও হতে পারে। যাই হোক, স্বামী স্বরূপানন্দও মানুষের খুঁটি-নাটি বহু বিধ সমস্যার প্রতি প্রখর দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং সমাধানের উপায় বলে দিয়েছিলেন।

১৫। কোন-কোন সাধুসন্তের চিন্তায় ইহজগতকে অস্বীকার (World negation) এবং আধ্যাত্মিকতাকে অতীব প্রাধান্য দান লক্ষ্যনীয়। অধিকাংশ গৃহীর জীবনচর্চায় ঘোরতর সংসার-আসক্তি (World affirmation) এবং আধ্যাত্মিক দেউলেপনা (Spiritual bankruptcy) লক্ষণীয়। দয়ানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, স্বরূপানন্দ, প্রণবানন্দ প্রমুখ- এই উভয়বিধ চিন্তাধারাকে অপছন্দ করতেন। বস্তুগত জগৎ ও ভাবগত জগতের সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা, দৈহিক কামনা-বাসনাই যেন জীবনের সর্ব্বস্ব হয়ে না দাঁড়ায়। উদ্দেশ্য

ও উপায় যেন মহৎ হয়। ব্যক্তির উন্নতি নীতিহীন হয়ে সমাজকল্যাণের পরিপন্থী যেন না হয়। ব্যক্তি যেন গৃহস্থ থেকে প্রবুদ্ধ নাগরিকে উন্নীত হয়। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য যেন পরিহার করে।

১৬। মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খৃঃ) প্রেম-অর্থ-যশ-এই তিনের পেছনে ছুটে-ছুটে কেলেঙ্কারী করে বসেছিলেন। হতাশাগ্রস্থ মধুসূদন শেষটায় আত্মবিলাপ করলেন। সেক্সপিয়ারের (১৫৬৪-১৬২৬ খৃঃ) তাঁর মেকবেথ নামক নাটকে দেখিয়েছেন কি ভাবে সীমাহীন, নীতিহীন উচ্চাকাঙ্খা মানবজীবনকে বিপর্যস্ত ও শুন্যগর্ভ করে ফেলে। স্বরূপানন্দ মায়া-মরীচিকার পেছনে জীবন-যৌবন বিনষ্ট করেন নি এবং উচ্চাকাঙ্খা দ্বারা তাড়িত হন নি। তাঁর জীবন ছিল ঋজু, কঠিন ; কিন্তু শুন্যগর্ভ ছিল না।

১৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে এবং মনুসংহিতাতে বর্ণিত কর্মদর্শন অত্যন্ত উন্নতমানের। মানুষ যেন সৎ উদ্দেশ্যে নিয়ত সৎ কর্ম করে যায়। এমন কর্মকে গীতাতে বলা হয়েছে যজ্ঞ, মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে ঋণ। সমাজস্থ মানুষের প্রবণতা একরূপ নহে, কেউ কর্ম-প্রধান, কেউ জ্ঞান-প্রধান, কেউ ভক্তি- প্রধান । যে ভক্তিমার্গী, তার ভক্তি যেন জ্ঞান দ্বারা পরিশোধিত, কর্ম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। একই কথা জ্ঞানমার্গী ও কর্মমার্গী সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য । এইসূক্ষ্ম বিচারটিকে একটি কবিতাতে স্বামী স্বরূপানন্দ চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি -এই ত্রিধারার মিলন ও সামঞ্জস্য আবশ্যক; অন্যথায় একক ভাবে জ্ঞান বা ভক্তি অঙ্গহীন, মরুভূমির বালি বা শুকনা ফুলের ডালি সদৃশ।

১৮। ভক্ত কবির (১৪২৫-১৫১৮খৃঃ)বহু দোঁহা রচনা করে গাইতেন। একটি বিশেষ দোঁহার মর্মার্থ হল এই যে, অতীব দীর্ঘদেহী তালগাছ সাধারণতঃ তলদেশে ছায়া, ফল,ফুল দিতে অক্ষম, তেমনি কোন সাধক যদি সাধনজগতে অতীব উচ্চস্তরে আরোহণ করেন, তবে আমজনতা উপকৃত হয় না । সমতল ত্রিপুরার ধারে-পাশে এমনই এক অতি উচ্চ মার্গের সাধক ছিলেন, তাঁর নাম শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী(১৭৩০-১৮৯০ খৃঃ)। স্বামী স্বরূপানন্দ তদ্রুপ ছিলেন না। তিনি বটের মত ছায়া, আমগাছের মত ফল এবং শিউলী গাছের মতঅজস্র ফুল দিয়ে গেছেন।

১৯। বৃটেন অতীতে কয়েকবার বিদেশী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। শেষ আক্রমণ হয় ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্মান্ডির উইলিয়াস কর্তৃক। আগে-পরের প্রায় সব দেশী-বিদেশীরা এক দেহে লীন হল । অতঃপর হাজার বৎসর যাবৎ বৃটেন নিরবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা ভোগ করছে। তাই সেদেশের জাতীয় জীবনে ও চরিত্রে অধঃপতনের ধারা প্রায় রুদ্ধ। অপরপক্ষে, ভারতবর্ষ প্রায় তেরশত বৎসর (৬৪৭-১৯৪৭ খৃঃ) পরাধীন ছিল। তাই ভারতীয় সমাজের

বৈষয়িক ও নৈতিক, দৈহিক ও মানসিক অপূরণীয় ক্ষতি হল। সেই ক্ষতিগ্রস্থ সমাজকে সুস্থ-সবল করার জন্য নানা জন নানা ভাবে চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে বঙ্গদেশে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও ষড় গোস্বামী প্রভৃতির তিরোধনের পর গৌড়ীয়-গগনে অন্ধকার যুগ নেমে এল। বহু অপসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হল, যেমন আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী প্রভৃতি। বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এইসব অপসম্প্রদায়কে সুনজরে দেখতেন না। দত্ত বংশোদ্ভূত স্থিতধী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (১৮৩৮-১৯১৪ খৃঃ) এবং ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর (১৮৭৪-১৯৩৭ খৃঃ) বহুমুখী বিপুল শ্রম দ্বারা বিশুদ্ধ ভক্তি প্রদায়িনী ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তুলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ তাঁদের অক্লান্ত শ্রমের ফল। স্বামী স্বরূপানন্দের ধর্মীয় আন্দোলন মূলতঃ সংস্কার পন্থী আন্দোলন। সরস্বতী ঠাকুরের ও স্বরূপানন্দের কর্মধারার মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। উভয়েই চেয়েছিলেন যেন সমাজ কুসংস্কারমুক্ত হয়, অপসংস্কৃতিমুক্ত হয়, সমাজ যেন যুক্তিনির্ভর, কর্মনির্ভর, জ্ঞাননির্ভর, স্বাবলম্বী হয়।

দেশ-বিদেশের কোন-কোন কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক-ধর্মগুরু-সমাজসংস্কারক-এর বাণীর ও জীবনের মধ্যে সুসামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। উচ্চকোটির উপদেশ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা একই ব্যক্তিতে লক্ষ্য করা যায়। তৎসত্ত্বেও প্রচার-প্রসারের ফলে ঐসব ব্যক্তিরা সমাদৃত। গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল সম্বন্ধে সারা বিশ্বে বহু পন্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক অগণিত পুস্তক ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যত পুস্তক লিখেছেন,তাঁর সম্বন্ধে ততোধিক গবেষণা-পুস্তক রচিত হয়েছে। ফলে এইসব মনীষীদের জীবন ও বাণী অমর ও অক্ষয় হয়ে আছে। একই যুক্তিতে,স্বামী স্বরূপানন্দের বহুমুখী প্রতিভা ও প্রভাবকে চিরস্মরণীয় করার জন্য যত বেশী চর্চা হয়,গবেষণা হয়, পুস্তক রচনা হয়, ততই শুভ ও স্বাগতযোগ্য।

ইহুদি সন্তান Franz kafka (১৮৮৩-১৯২৪ খৃঃ) ছিলেন উপন্যাস রচয়িতা ও ছোট গল্প রচয়িতা। তিনি উন্নতমানের দার্শনিক নন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা ছিল তাঁর রচিত ও অপ্রকাশিত সব পান্ডুলিপি যেন পুড়ে ছাই করে ফেলা হয়, কেননা তাতে মূল্যবান কিছুই নাই। কিন্তু তাঁর হিতাকাঙ্খী বন্ধু Dr. Max Brod এই নির্দেশ অবজ্ঞা করে The Trial, The castle, America -এই তিনটি প্রবন্ধ পরবর্তীকালে (১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৭খৃঃ) প্রকাশ করেন। এই তিনটি রচনাই লেখককে করল বিখ্যাত। এহেন অবজ্ঞাই তাঁকে করল অমর। ইহা কি অবজ্ঞা, নাকি শ্রদ্ধা? ❑

নৃপেন্দ্র চন্দ্র দে

সংগীত সাধক নৃপেন্দ্র চন্দ্র দে আগরতলা নগরের অন্তর্গত বনমালীপুর নামক গ্রামে সোমবারে, রাধাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। সঠিক জন্মসন নির্ণয় করা কঠিন। ১৮৯৭ খৃষ্ঠাব্দের ১২ ই জুন অতীব ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে। তাতে ত্রিপুরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয় । আগরতলার রাজবাড়ী ধ্বসে পড়ল। বালক নৃপেন তা সচক্ষে দেখেছেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ১০ বৎসর। জন্মাষ্ঠমীর অব্যবহিত পরে শুক্লপক্ষে অষ্টমীতে শ্রীরাধার আবির্ভাব উপলক্ষে রাধাষ্ঠমী পালিত হয়। এসব বিচার করে মনে হয়, তাঁর জন্ম ১২৯৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের ১ম সপ্তাহে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ খৃষ্ঠাব্দে।

কুমিল্লার ঠাকুরপাড়া নিবাসী সাগরচন্দ্র ও ঈশ্বরী দেবীর মোট ৬ জন সন্তান, যথা দেবেন্দ্র, যোগেন্দ্র, নিরঞ্জন, বিপিন,হিরন্ময়ী ও নৃপেন্দ্র। নৃপেন্দ্র সর্ব কনিষ্ঠ। সাগরচন্দ্র গান-বাজনা ভালবাসতেন, শিবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁর, তাঁর মাথায় জটা ছিল। এই সব গুণের জন্য মহারাজ বীরচন্দ্র কর্তৃক আগরতলায় আশ্রয় পান সাগরচন্দ্র। সাগরচন্দ্র ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মারা যান। নৃপেন্দ্র চন্দ্রের আক্ষেপ অনুসারে অতি ঘনিষ্ট লোক কর্তৃক প্রতারিত হয়ে মাতা ও পুত্র পথে বসলেন। পিতার মৃত্যু ও আত্মীয় কর্তৃক প্রতারণা বিধবা ঈশ্বরী দেবী ও বালক নৃপেন্দ্রকে রুঢ় বাস্তবের নিকটে নিয়ে এল। গরু চড়ানো ও দুধ বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতেন মাতা ও পুত্র। সেই সময় তর্কভূষণ ভূবন পন্ডিত ও তাঁর স্ত্রী অভয় ও আশ্বাস দিয়ে, সৎ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামক বিখ্যাত জনপদের অন্তর্গত বাংগুরা নামক গ্রামে বাস করতেন সংগীতাচার্য রামকানাই এবং শিবপুর নামক গ্রামে বাস করতেন আলাউদ্দিন। রামকানাই হলেন গুরু, আলাউদ্দিন শিষ্য । আচার্য রামকানাই আসতেন আগরতলায় এবং থাকতেন রাজপ্রভুর বাড়ীতে। প্রভু হরিলাল গোস্বামীর বৈঠকখানাতে সংগীতের আসর বসত। রামকানাই খুব পান খেতেন।

বালক নৃপেন্দ্র জন্মসূত্রে পেয়েছেন সংগীত-প্রতিভা। যখনই রামকানাই আগরতলায় এসে প্রভুর বাড়ীতে আসর জমাতেন, তখনই এই বালক বাইরে বারান্দায় চুপচাপ বসে গান -বাজনা শুনতেন। শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন। এই ভাবে কয়েক আসর যাবার পর ,বালকের ঐকান্তিক আগ্রহ স্বীকৃত হল। তরুণ নৃপেন্দ্রকে গুরু রামকানাই আস্তে-আস্তে কাছে টানতে লাগলেন।

গুরুর কাছ থেকে এস্‌রাজ বাদ্য শিক্ষা করে, নিজে ছোট-খাট শিক্ষক হলেন। কতিপয় বিদ্যার্থী মিল্‌ল । মাথা পিছু মাসে ৫্ টাকা করে গুরুদক্ষিণা পেতে লাগলেন। এভাবে কয়েক বছর চল্‌ল।

এমন সময়ে লখনৌ থেকে গান-বাজনা শিক্ষা করে এলেন পুলিন দেববর্মন । উভয় শিল্পীর মধ্যে পরিচয় ও সদ্ভাব হল। পুলিন বাবু উদ্যোগী হলেন সংগীত বিদ্যালয় স্থাপনে। উমাকান্ত বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুর-এর ধারে একটি দালান কোঠা আছে। তাতে শুরু হয়েছিল বোধজং বিদ্যালয়, বোধজং বিদ্যালয় নিজস্ব বাড়ীতে গেলে পর, ঐ ছোট দালানটি খালি হয়। তাতে শুরু হল সংগীত বিদ্যালয়। দীর্ঘ দিন তাতে বিদ্যালয় ছিল।

পরে ত্রিপুরার রাজবংশী কাপ্তান যোগেন্দ্র দেববর্মন এর বাড়ী কিনে সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করে দেন শিক্ষা অধিকর্তা গোবিন্দ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। কিছু দিনের মধ্যে কলিকাতা থেকে ননী বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক দুই জন বিশেষজ্ঞকে এনে পরীক্ষা করিয়ে পুলিন বাবুকে অধ্যক্ষ এবং নৃপেন্দ্রবাবুকে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন শিক্ষা অধিকর্তা গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে উত্তর ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করেছেন, দীক্ষা নিয়েছেন শ্রীশ্রী ১০৮ অনন্ত দাস কাঠিয়াদাস বাবাজীর কাছ থেকে। তাঁর জন্মের শতবর্ষপরে, ১৯৮৭খৃষ্টাব্দের ১১ই মে আগরতলা পুরসভা তাঁকে মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছে।শিক্ষা অধিকর্তাকে অনুরোধ করে তিনি কয়েকজনকে চাকুরী পাইয়ে দিয়েছেন। তারা কদাচিৎ খোঁজ-খবর নেয় অথচ যাদের জন্য কিছু করেন নি তারাই শেষ বয়সে দেখাশুনা করেছে । এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অমিয়মুকুল দে, কল্পনা ধরচৌধুরী, অর্চনা ধরচৌধুরী। তাঁর স্বরচিত একটি গান খুবই প্রিয়। গানটিতে তিনি নিজেকে সংগীতের সেবক বলে পরিচিত দিয়েছেন এবং প্রতারকদের ক্ষমা করেছেন। ❑

সাধু প্রজ্ঞানাথ

সমতল ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত খন্ডল পরগণাতে, পশ্চিম বসন্তপুর -নিবাসী গোবিন্দ চক্রবতী ও বাসন্তী চক্রবর্তী নামক দম্পতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন হরমোহন চক্রবর্তী। হরমোহন পরে আশ্রমিক জীবনে সাধু প্রজ্ঞানাথ নামে খ্যাত হন। তাঁর আয়ুস্কাল হল ২রা শ্রাবণ ১২৯৬ থেকে ২৭ শে বৈশাখ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৮৮৯-১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ।

বংশ পরিচয়

কয়েক প্রজন্ম আগে এই ব্রাহ্মণ পরিবার বগুড়া অঞ্চলে বাস করত। বগুড়ার অবস্থান হল পুর্ব্ব বঙ্গের উত্তরাংশে। ব্রহ্মপুত্র নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বে ময়মনসিংহ, পশ্চিমে বগুড়া । উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে, খুব সম্ভবতঃ মহারাজ ঈশানচন্দ্র মানিক্যের রাজত্বকালে (১৮৪৯-১৮৬২ খৃঃ) এই ব্রাহ্মণ পরিবারের জনৈক পূর্ব্ব পুরুষ ত্রিপুরাতে আসেন। রাজার কৃপায় নিষ্কর ভূমি ও চাকুরী জুটে গেল। বগুড়া থেকে আগত, তাই বগুড়ি বাড়ী নামে পরিচিত হল এই বাড়ী । প্রায় শত বৎসর পশ্চিম বসন্তপুরে থাকার পর, ভারত বিভাজন হেতু তাঁরা ত্রিপুরার পার্ব্বত্য ভূভাগে আশ্রয় নেন।

ঈশান চন্দ্র মাণিক্যের কৃপাধন্য, ভাগ্যান্বেষী ব্রাহ্মণ কালক্রমে ঘর-বাড়ী করে প্রতিষ্ঠিত প্রজা হলেন। তাঁর পুত্র বা পৌত্র হলেন কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র অভয়চরণ ও চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমারের পুত্র সতীশ, রতীশ ও যতীশ। রতীশের পুত্র ভবতোষ, পরিতোষ, প্রাণতোষ, মহিতোষ ও মিহিরতোষ। ভবতোষের পুত্র বিমান। ভবতোষ খ্যাতনামা শিক্ষক।

কমলাকান্তের দাদার একমাত্র পুত্র, নাম গোবিন্দ (আঃ ১৮৬৫-১৯৪৬ খৃঃ)। গোবিন্দ যাত্রাগান করতে ভালবাসতেন। তাই লোকমুখে তিনি গোবিন্দ অধিকারী নামে পরিচিত ছিলেন। গোবিন্দের দুই পুত্র, হরমোহন ও মোহিনীমোহন। হরমোহন হয়ে যান সাধু। মোহিনীমোহন হয়ে যান গৃহী ও বিচক্ষণ আমলা। মোহিনী মোহনের পাঁচপুত্র, অমল, বিমল, অরুণ, সজল, দীপক।

একদিকে হরমোহন ও মোহিনীমোহন এবং অপর দিকে সতীশ, রতীশ ও যতীশ হলেন জেঠাতো-খুড়াতো ভাই। ভবতোষের জেঠা হলেন হরমোহন। হরমোহনের নিকটতম

প্রতিবেশী ছিলেন বসন্ত কুমার রায় (১৮৮৫-১৯৬৩ খৃঃ) রতীশের পুত্র ভবতোষ ও বসন্তের পুত্র নির্মল। ভবতোষ ও নির্মল দিলেন হরমোহন সম্বন্ধে তথ্যাদি।

বাল্য কাল

হরমোহনের শৈশব, বাল্য,কৈশোর ও প্রথম যৌবন গ্রামের বাড়ীতে, যৌথ পরিবারে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি যে-বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসরে আনন্দমোহন রায় দ্বারা কুমিল্লাতে বৃটিশ শাসনাধীন ভিক্টোরিয়া মহাবিদ্যালয় (১৮৮৯খৃঃ) স্থাপন করা হল। বালক হরমোহন দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন না। বরং একলা, নীরবে থাকতে চাইতেন। দীন-দুঃখী, ফকীর -বৈরাগী এলে একটু বেশী করে ভিক্ষা দিতে পছন্দ করতেন। পরদুঃখকাতরতা ও দানশীলতা হল তাঁর অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষা

খন্ডল পরগণাতে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। বিদেশী শাসনের প্রতিকূলতা বশতঃ স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ত্রিপুরাতে কয়েক শতাব্দী যাবৎ এঁরা আশ্রয় নেন। ত্রিপুরার রাজারা ছিলেন গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক । খন্ডলে ছিল বহু টোল। কোন এক টোলে হরমোহন পড়াশুনা করেছিলেন। নিকটেই কুমিল্লাতে মহাবিদ্যালয়; সেখান থেকে তিনি কলাবিভাগে স্নাতক হন।ইহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালের কথা । সে সময় একই গ্রাম নিবাসী তিন যুবক স্নাতক হন, এঁরা হলেন হরমোহন চক্রবর্তী, হরিশ চন্দ্র সেন ও কালী শংকর মজুমদার। উত্তরবর্তী অনন্তপুর নিবাসী সারদাচরন সরকাব (১৮৮৭-১৯৮৩ খৃঃ) হলেন সমগ্র খন্ডলে সম্ভবতঃ প্রথম এম.এ. অনেক পরে শল্যা-নিবাসী আবদুল আজিজ হলেন খন্ডলবাসী মুসলমান সমাজের প্রথম স্নাতক। স্নাতক হবার পর, হরমোহন ভিন্ন পথে চলে গেলেন।

দীক্ষা

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী অর্জন আন্দোলন,প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-প্রভৃতি ঘটনাবলী হরমোহনের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তিনি রাজনীতির চাইতে ধর্মনীতিকে অধিক শ্রেয়ঃ মনে করতেন। তাই স্নাতক হবার পরই কালক্ষেপ না করে কলিকাতাতে গেলেন। কলিকাতাতে গঙ্গা তীরে, নীমতলা শ্মশান ঘাটে, কোন নির্জন স্থানে বসে-বসে ধ্যান করতেন। বাড়ীতে কারো অনুমতি না নিয়ে চুপচাপ ঘর ছাড়াতে বাড়ীর সকলেই চিন্তিত। অবশেষে লোক পাঠিয়ে অনেক খুঁজে কলিকাতা থেকে ধরে আনা হল হরমোহনকে। বাড়ীতে আসার পর, তিনি দেবালয়েই বেশী সময় থাকতেন

মৌনব্রত অবলম্বন করে। কথাবার্তা হত কাগজেকলমে লিখে। পৈত্রিক ঘর-বাড়ী,পুকুর,ভূসম্পত্তি কে ভোগ করবে? উত্তর এল, অনুজকে দিয়ে দিতে। মাতৃদেবীর একান্ত ইচ্ছা পুত্রকে পুকুরের তাজা মাছ রান্না করে খাওয়াবেন। পুত্র রাজী হলেন। রান্নার পর পুত্র শুধু একনজর দেখলেন।

এই সময়ে তিনি স্বপ্নে দর্শন পেলেন এক নগ্ন সাধুর। স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে, পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে গৃহত্যাগ করেন। ঘুরতে-ঘুরতে গোরক্ষপুর গেলেন,গোরক্ষনাথের মন্দিরে উপস্থিত হলেন। নিজের স্বপ্নের কথা বলাতেই, মঠের সাধুরা পাঠালেন গম্ভীরনাথজী মহারাজের নিকট। স্বপ্নে যাঁকে দেখলেন, সেই মহাত্মার চেহারার সহিত গম্ভীরনাথজীর চেহারার সাদৃশ্য দেখে ভাল লাগলো। এবং সেখানেই দীক্ষা নিয়ে কিছুকাল গুরু-সান্নিধ্যে বাস করেন, সাধন-ভজন প্রণালী শিক্ষালাভ করেন।

পরিব্রাজন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রহ্মচারী হরমোহন ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন। নানা সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন। উত্তরাখন্ডস্থিত প্রায় প্রতিটি তীর্থ তাঁর নখদর্পণে ছিল। এমন কি মানস সরোবর দর্শন হয়েছিল এই সময়ে এবং এই বয়সেই। পরিব্রাজনকালে সর্পকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন সাধুদের দ্বারা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পর ঐ সাধুরাই টেনে তুলে আনল। দীর্ঘকাল হিন্দীভাষী অঞ্চলে পরিব্রাজন করতে-করতে তিনি মাতৃভাষা বাংলা অপেক্ষা হিন্দী ভাষাতে অধিক পারদর্শী হয়ে গেলেন। এই সময়েই কোন ভক্ত বা দানবীর তাঁকে অষ্টধাতু নির্মিত একটি মহামূল্যবান মাঝারি আকারের পাত্র দেন। এটি ছিল তাঁর প্রিয় এবং ভ্রমণসাথী। তিনি ঐ পাত্র-পরিমিত খাদ্য ভোজন করতেন। এই সময়ে তিনি একবার আসেন কুমিল্লাতে। খবর পেয়ে বহু আত্মীয়-স্বজন দেখতে গেলেন কুমিল্লাতে দীঘির পাড়ে।

আশ্রমিক জীবন

প্রায় দুই দশক পরিব্রাজনের পর এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আয়ুক্রম হবার অব্যবহিত আগে-পরে তিনি এক স্থানে নির্জনে, নীরবে সাধন-ভজন করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর পছন্দসই স্থান হল দুর্গম গঙ্গোত্রী। তেহরী গাড়োয়ালভুক্ত উত্তর কাশীর অন্তর্গত গঙ্গোত্রী প্রায় জনমানবশুন্য। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই স্থান মৌন মহান। সেই স্থানে পাথর খোদাই করে আশ্রম স্থাপন করতে হলে দেহবল, মনোবল, সাধনবল অত্যাবশ্যক। তিনি যে-আশ্রমে থাকতেন, তার নাম যোগাশ্রম। শীতের প্রকোপ, খাদ্যের অনিশ্চয়তা, বস্ত্রের স্বল্পতা, উপেক্ষা করে রয়ে গেলেন ঐ যোগাশ্রমে, দুই দশকের মতো সময়।

এই সময় তিনি কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পুস্তকগুলোর নাম হলো ১। উত্তরাখন্ড তীর্থযাত্রা, ২। প্রজ্ঞা সাঙ্খ্য, ৩। নাথযোগ এবং ৪। ভক্তি সঞ্জিবনী। প্রথম দুটি বই হিন্দীতে, তৃতীয়টি ইংরাজীতে, এবং চতুর্থটি বাংলাতে লেখা। তৃতীয়টি ১৯৫০ সালে এবং চতুর্থটি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত। এই সব পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও অর্থব্যয় কি ভাবে হল তা জানা যায় নি।

যোগাশ্রমে বসে যখন তিনি আসন ধরে ফেলেছেন, তখনও পৈত্রিক বাড়ীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। উভয় পক্ষই চিঠিতে যোগাযোগ রাখত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁর পিতৃদেব রোগ শয্যায় শায়িত। বাড়ী থেকে চিঠি গেল। তিনি উত্তরে বল্লেন যে, ধান-চাউল দান করলে পিতৃদেব শান্তিপাবেন। তাঁর নির্দ্দেশে চাউল দান চল্ল কয়েক দিন। এই দৃশ্য দেখে রোগী আনন্দ পেলেন। যে দিন দান শেষ হল, সেদিনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইহা ১৯৪৬ সালের ঘটনা। ভবতোষ (১৯২৫-)বিবাহ করেন ১৯৫৩ সালে তাঁর স্ত্রী দীপালী (১৯৩৬-) প্রায়ই শুকনো খাবার ডাকযোগে পাঠাতেন জেঠাশ্বশুরকে। আমসত্ত্ব, কাঠালসত্ত্ব, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি পেয়ে তিনি খুব খুশী হয়ে পত্র দিতেন। গোবিন্দ ভোগ চাউলকে খন্ডলে বলে তিলক কচ্‌চরী। ইহার চিড়া খুব সুঘ্রাণযুক্ত। ভবতোষের পুত্রকন্যা হলে পর, সংবাদ পেয়ে তিনি আশীর্ব্বাদ করতেন পত্রযোগে। একদিন ভুল বশতঃ বাড়ীতে নিত্যপূজিত ঠাকুরের শয্যা দেওয়া হয় নি। প্রজ্ঞানাথ ধ্যানযোগে জানতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ পত্র দেন। যোগাশ্রমে থাকাকালীন তাঁর আত্মীয়-স্বজন কেউ কোন দিন যায় নি; এজন্য একটু অভিমান ছিল। কেবল যতীশ ও তারাপদ তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ❑

বড়মাতা মহারাণী প্রভাবতী দেবী

উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত তীর্থরাজ প্রয়াগের বাসিন্দা রাণা পদ্মজং বাহাদুর কানোয়ার (১৮৫৮-১৯০৬ খৃঃ) হলেন প্রভাবতী দেবী (১৮৯০-১৯৭১খৃঃ)-এর এবং রাণা বোধজং বাহাদুর কানোয়ার (১৮৯৪-১৯৪৬ খৃঃ) এর পিতা। পরবর্তী কালে প্রভাবতী দেবী হলেন ত্রিপুরার মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের প্রথমা মহারাণী।

রাণা পরিবার হল রাজপুতানার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত সূর্যবংশীয় ক্ষত্রীয়। আরবীয়, আফগান, তুর্কী, পাঠান, মোঘল দ্বারা উত্তর -পশ্চিম ভারত বার-বার আক্রান্ত হলে পর, রাণারা অনেকেই যুদ্ধ করেছেন, কেউ মরেছেন, কেউ অন্যত্র সরেছেন। এমনই এক রাণা পরিবার নেপালে এলেন এবং নেপালের রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতিতে অবদান রেখেছেন। উত্তরাধিকার ও রাজবাড়ীর রাজনীতির জটিল-কুটিল কলহে রাণা পদ্মজং নেপাল ছেড়ে প্রয়াগে (এলাহাবাদে) বসতি স্থাপন করেন।

প্রভাবতী দেবীর জন্মস্থান হল প্রয়াগ, তাঁর জন্মসন আনুমানিক ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। জন্মলগ্নে অশুভ গ্রহ-লগ্ন থাকায় শিশুকন্যাকে বিক্রয় করে দেওয়া হল। রাণা পরিবারের গৃহ চিকিৎসক ছিলেন জনৈক বাঙালী চিকিৎসক। ক্রেতা হলেন ঐ চিকিৎসক। পালক পিতার গৃহে প্রভাবতী আদরে যত্নে লালিত-পালিত হন, লেখাপড়া শিক্ষা লাভ করেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করেন। অবশেষে পালক পিতা ও জন্মদাতা পিতার যৌথ প্রয়াসে বাঙালী ভাষাভাষী ত্রিপুরার রাজপরিবারে প্রভাবতীর বিবাহের আয়োজন। তখন তাঁর বয়স আনুমানিক নয় বৎসর মাত্র। বিবাহের দিন ছিল ২৮শে ফাল্গুন ১৩০৮ ত্রিং অর্থাৎ মার্চ, ১৮৯৯ খৃঃ। পাত্র হলেন যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোর। বীরেন্দ্র কিশোরের জন্ম ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। বীরেন্দ্র কিশোরের পিতা-মাতা হলেন মহারাজ রাধাকিশোর এবং মহারাণী তুলসীবতী। কন্যাপক্ষের ইচ্ছা কন্যাদাতার বাসভবনে, প্রয়াগে, বিবাহপর্ব সমাপ্ত করার, এদিকে বরপক্ষের ইচ্ছা আগরতলাতেবিবাহপর্ব সমাধা করার। অবশেষে, আগরতলা নগরে এক বিশাল ভূমিখণ্ড ক্রয় করেন কন্যাপক্ষ এবং সেখানেই নিজ ভূমিতে কন্যাদান করেন। এই ভূখন্ড খোস বাগান নামে পরিচিত। এ মহামূল্যবান ভূমি যৌতুকরূপে কন্যাকে দেওয়া হল। কন্যাযাত্রী ত্রিপুরায় আসার সময় শ্রী নিবাস রায়চৌধুরীর (আঃ ১৮৫৭-১৯১৬) পরামর্শ অনুযায়ী আখাউড়া থেকে আগরতলা পর্যন্ত দীর্ঘপথের দুইধারে সারিবদ্ধভাবে লোক দাঁড় করানো হল স্বাগত জানাতে। খোসবাগানকে পরিচ্ছন্ন করা, সাজানো, কন্যাযাত্রীদিগের থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করার জন্য শ্রীনিবাসকে দায়িত্ব

দেন মহারাজ রাধাকিশোর। ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের পৌষমাসে (ডিসেম্বর ১৯০৩ খৃঃ) প্রভাবতীর এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, কিন্তু শিশু মারা গেল। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সন্তানও মারা গেল। অতঃপর প্রভাবতীর আগ্রহে প্রভাবতীর অনুজা অরুন্ধুতি দেবীর সহিত যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোরের বিবাহ হল নভেম্বর, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। অরুন্ধুতির পুত্র হলেন বীর বিক্রম (১৯. ৮. ১৯০৮-১৭. ৫. ১৯৪৭ খৃঃ)। অরুন্ধুতি দেবী শিশু পুত্রকে দিদির কোলে তুলে দিয়েছিলেন।

প্রভাবতীদেবী ত্রিপুরায় ছিলেন ৭০ বছর যাবৎ। তন্মধ্যে প্রায় ৬০ বৎসর ধর্মকর্ম নিয়ে, জনহিতকর কাজ নিয়ে কাটিয়েছেন। রাজবাড়ী কর্মকোলাহল থেকে তিনি দূরে থাকতেন, ঐ সবের মধ্যে নিজেকে জড়াতেন না। তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত জনহিতকর কাজের একটি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ তালিকা নীচে প্রস্তুত করা গেল ঃ

১) বীরেন্দ্র কিশোর জীবিত থাকতেই, প্রভাবতী দেবী তীর্থ পর্যটন করেছেন একাধিকবার। রামেশ্বরম যাবার সময় রেলগাড়ীর একটি গোটা কামড়া ভাড়া করা হল। ঐ কামড়াটিকে বিশাল পর্দা দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছিল। তিনি তীর্থে গেলেন, তাতে লোকহিত কিভাবে হল ? রাজবাড়ীর বহু চাকর-বাকর, সেবক-সেবিকা তাঁর সাথে যাওয়ার আবদার করল, তিনি সকলকে নিয়ে যান, সমস্ত খরচ তিনিই বহন করেছেন।

২) চট্টগ্রামের উত্তরাংশে অবস্থিত চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সীতাকুন্ডনামক তীর্থে অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির নির্মাণ করে দেন প্রভাবতী দেবী।

৩) আগরতলা নগরের দক্ষিণভাগে এক বড় ভূখণ্ড কিনে, তাতে ধর্মশালা নির্মাণ করে দেন প্রভাবতী দেবী। ১৯৩০ সনের জানুয়ারীতে এই কাজ শুরু করান।

৪) শিববাড়ী নির্মাণ হল আর এক মহৎ কীর্তি, ধর্মশালা যেখানে নির্মাণ করান, সেখানেই শিববাড়ী অর্থাৎ শিবমন্দির নির্মাণ করে দেন।ইহা ১৯৩০ সনের মে-জুন মাসের ঘটনা।

৫) আগরতলার পূর্ব প্রান্তে রাণীর বাজার নামক জনপদ আছে। মহারাণী তুলসীবতী কর্তৃক স্থাপিত বলেই ইহা রাণীর বাজার নামে পরিচিত। তুলসীবতী ছিলেন মনিপুরী মহিলা। রাণীর বাজারের নিকটেই নলগড়িয়া নামক গ্রামে অনেক মনিপুরী লোক বাস করেন। তাদের অনুরোধে প্রভাবতী দেবী তথায় একটি নাটমন্দির নির্মাণ করে দেন।

৬) ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাজনকে কেন্দ্র করে আগে-পরে বহু দাঙ্গা হয়েছিল। বহু হিন্দু ভিটামাটি ছাড়া হল এবং কেউ-কেউ ত্রিপুরায় আশ্রয় নিল। তিনি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু

পরিবারের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতেন। কিছু-কিছু অনাথ বালক-বালিকাকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারীতে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ত্যাগীরশ্বরানন্দ ও স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ মহারাজ উদ্বাস্তুদের সেবাকাজ উপলক্ষে আগরতলায় এসেছিলেন এবং বড় মাতার ব্যবস্থাপনায় শিববাড়ীর ধর্মশালাতে থাকার সুযোগ-সুবিধা পান।

৭) কতিপয় অনাথ বালিকাকে ভরণ-পোষণ দিয়েছেন, অধিকন্তু পূর্ণ মর্যাদায় পাত্রস্থ করেছেন।

৮) তিনি চিত্রাঙ্কন বিদ্যায়, আলোকচিত্র গ্রহণে পারদর্শিনী ছিলেন। রাজবাড়ীর বালক-বালিকারা, মহিলারা, আশ্রিতা বালিকারা যাতে এই চারুকলা আয়ত্ব করতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টার ক্রটি তিনি করেন নি।

৯) রাজ অন্দর মহলের ভেতরেই, পশ্চিম প্রান্তে, দেওয়ালের অভ্যন্তরে ছিল রাধাশ্যামসুন্দর মন্দির। সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক নানাবিধ নাচগান করাতেন প্রভাবতী দেবী। নাচগানের মহড়া দেওয়াতেন, নাচগান মঞ্চস্থ করাতেন, পুরস্কার দিতেন ভাল শিল্পীকে।

১০) রাজবাড়ীর জোড়া দীঘির পূর্ব তীরে নাটমন্দির নির্মাণ করে দেন প্রভাবতী দেবী। উদ্দেশ্য হল আগরতলার ভক্তবৃন্দ যেন ভাগবতী কথা শুনার সুযোগ-সুবিধা পায়। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে ঝাঁজড়ি দেওয়া পর্দার আড়ালে বসে বড়মাতা প্রভাবতী দেবী ভাগবৎ পাঠ শুনতেন। সাধারণ ভক্তরা শুনত পাঠকের সামনে বসে।

১১) বড়মাতার নাট মন্দিরে বহু পাঠক শাস্ত্র পাঠ করতেন। বড় মাতা মহারাণীর আগ্রহে ও অর্থব্যয়ে কতিপয় নামজাদা মহাত্মারা এখানে এসেছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হলেন গৌর গৌবিন্দ ভাগবৎ স্বামী, স্বামী কেবলানন্দ, প্রাণ গোপাল গোস্বামী, স্বামী কৃষ্ণানন্দ প্রমুখ।

১২) মহারাজ বীর বিক্রমের অন্যতম পুত্র মহারাজকুমার সহদেব বিক্রমকিশোর (১৯৩০-) ১৯৬২ সালে স্থাপন করেছিলেন ধর্ম মহাসংঘ। তাঁর উদ্দ্যেশ্য ছিল মহৎ। তিনি পাহাড়ী গ্রামে গীতামন্দির নির্মাণে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, বৈষ্ণব সম্মেলন করালেন একাধিকবার। সহদেব বিক্রমকিশোর এই সব জনহিতকর কাজে অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা পেয়েছেন প্রভাবতীর কাছ থেকে।

১৩) ভারত ধর্মমহাসভা নামে একটি ধর্মীয় সংস্থা উত্তর ভারতে গড়ে উঠেছিল।

সনাতন হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে লোককল্যাণ করাই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার সাধারণ সম্পাদক পদে সহদেব বিক্রমকিশোর কিছুকাল কাজ করেছেন। বড়মাতা মহারাণী ছিলেন ইহার পৃষ্ঠপোষিকা।

১৪) শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দ (১৮৯০-১৯৬৮ খৃঃ) ছিলেন নিত্যসিদ্ধ সাধক, পরম বৈষ্ণব, কৃতবিদ্য চিকিৎসক, চট্টগ্রামের অন্যতম রত্ন। প্রভাবতীর আগ্রহে এই মহাত্মা বহুবার ত্রিপুরায় এসেছিলেন। প্রভাবতী কুঞ্জবনে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করেন এবং সেই ভূমি দিতে চাইলেন কৃষ্ণানন্দজীকে। কৃষ্ণানন্দজী অনীহা প্রকাশ করেন। অতঃপর সহদেব বিক্রমের মধ্যস্থতায় সেই ভূমি দান করা হল ভোলাগিরি মহারাজের (১৮৩২-১৯২৯ খৃঃ) শিষ্য হরানন্দ মহারাজকে।

১৫) রাধাশ্যামসুন্দর মন্দির নির্মাণ প্রক্রিয়া হল তাঁর অন্তিম কীর্তি। ১৯৬০ এর দশকের একেবারে শেষদিকে তিনি এই কাজে হাত দেন। রাজবাড়ীর অভ্যন্তরে পশ্চিম প্রান্তে ছিল এই বিগ্রহ। সেখানেই তিনি নাচগান করাতেন, রাসলীলা করাতেন। এই মন্দিরের জীর্ণদশা অদ্যাপি বিদ্যমান। এই জীর্ণ মন্দির থেকে বিগ্রহকে সরানো হল নব নির্মিত মন্দিরে। নব নির্মিত মন্দির হল রাজবাড়ী থেকে সোজা দক্ষিণে অবস্থিত শিববাড়ী মন্দির প্রাঙ্গণে। ১৯৩০ সালে এখানেই তিনি গড়ে ছিলেন ধর্মশালা ও শিববাড়ী। সেই একই চত্বরে, প্রায় চল্লিশ বৎসরের মাথায় গড়লেন রাধাশ্যামসুন্দর মন্দির।

১৬) ফুটবল খেলায় উৎসাহ দিতেন প্রভাবতী দেবী। পিতার নামে পদ্মজং শীল্ড চালু করেছেন। সেই ক্রীড়া প্রতিযোগীতা বাবত প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে যান।

বড়মাতা মহারাণী এত ধর্মকর্ম, দান-দক্ষিণা করতে অর্থ পেলেন কোথা থেকে ? তাঁর আয়ের উৎস কি কি ছিল ? পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন নগদ অর্থ এবং খোস বাগান নামক ভূখণ্ড। শাশুড়ীর কাছ থেকে অর্থাৎ মহারাণী তুলসীবতীর কাছ থেকে পেয়েছেন রাণীর তালুক। এই রাণীর তালুকের অবস্থান হল আগরতলার পূর্বে রাণীর বাজারে। ধর্মশালা, শিববাড়ী, রাধাশ্যামসুন্দর মন্দির- এই সবের ব্যয় বাবত অর্থের বন্দোবস্ত করে গেছেন রাণীর তালুক থেকে। এবং একটি অছি পরিষদ গঠন করে গেছেন। তিনি একবার কলিকাতা গেলেন, সাথে ছিল প্রচুর অলংকার। সেই সব অলংকার বিক্রয় করতেই গিয়েছিলেন। সেই মণিমঞ্জুষা চুরি হয়ে গেল।

প্রভাবতী দেবী ও অরুন্ধুতি দেবী এক প্রকৃতির ছিলেন না। প্রভাবতীর মধ্যে ছিল মায়া-মমতার স্নিগ্ধতা ও ধর্মের পবিত্রতা। অরুন্ধুতি দেবীর মধ্যে ছিল বুদ্ধির প্রখরতা এবং ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা। অন্তিমকালে শেষবারের মতো পুরীধামে বেড়াতে যান; পথের

ক্লান্তিতে অসুস্থ হয়ে কলিকাতায় ফিরেন, বালীগঞ্জের ত্রিপুরার রাজবাড়ীতে থাকেন। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইহা ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের একেবারে শেষদিগের ঘটনা। ❑

কুতুব ফকির, কৈলাস পাগলা, গোবরা পাগলা

এই তিন সাধকের জন্ম-মৃত্যু, বংশ পরিচয়, আশ্রম, সাধন প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিশেষ কোন তথ্য জানা সম্ভব হয় নি। মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রম কিশোর যতটুকু শুনেছেন, তাই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বলা কাহিনীই এই প্রতিবেদনের ভিত্তি।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের জন্ম শীতকালে (৩. ১১.১৮৮৩ খৃঃ) এবং মৃত্যু বর্ষাকালে (১৩. ৮. ১৯২৩ খৃঃ)। অসুস্থ বীরেন্দ্র কিশোরকে চিকিৎসা করার জন্য বহু চিকিৎসক আহুত হন। কিন্তু কোন আশার আলো পাওয়া গেল না। সেই সময় রসমন টিলা, জগহরিমুড়া, যোগেন্দ্রনগর, আড়ালিয়া প্রভৃতি স্থান গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তাতে বাঘ, ভালুক, হাতী বাস করত। ঐ সব বনে ও হাওড়া নদীর তীরে থাকতেন কুতুব ফকির। কুতুবের গায়ে থাকত শতছিন্ন জামাকাপড়। অসুস্থ রাজাকে আশীর্বাদ করলে রাজার রোগ সেরে যাবে — এই বিশ্বাসবশতঃ রাজার সিপাহী বিনন্দিয়া কুতুবকে খোঁজে আনতে গেল। বন তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেল। ঝড়-তুফানের মধ্যেই কুতুব একাকী এলেন রাজবাড়ীতে এবং অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, রাজাকে দেখেন নি, আশর্বাদ করেন নি। অপরাহ্ন ১ ঘটিকায় রাজা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কুতুব সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।

কৈলাস পাগলা থাকতেন কামান চৌমুহনীর উত্তরে অবস্থিত চৌমুহানীর বারান্দায়। কৈলাসের গায়ে থাকত শত ছিন্ন জামা কাপড়। প্রায় প্রতি নিঃশ্বাসে এক বিশেষ জিগির (হরিবোল, হরিবোল) বের হত কৈলাসের মুখ হতে। বরিশাল নিবাসী জ্ঞানী, গুণী, তপস্বী শ্রীমৎ স্বামী বিজয়ানন্দ মহারাজ ছিলেন আগরতলা নিবাসী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির গুরুদেব। একদিন গিরীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় শিষ্য বরিশালে গুরুগৃহে যাবেন। আগরতলায় যে-স্থান থেকে গাড়ী ছাড়ে, সেখানে আসতে দেরী হল, এদিকে গাড়ী যথাসময়ে ছেড়ে দিল। অনুতপ্ত গিরীন্দ্রবাবু গেলেন কৈলাস পাগলার নিকট। কৈলাস বলে দিলেন যে গাড়ী এখনই ফেরৎ আসবে, তারপর যাবে। কিছুক্ষণ পর গাড়ী ফেরৎ এল। বরিশাল গুরুগৃহে পৌঁছার পর, স্বামী বিজয়ানন্দ এই ঘটনার কথা হুবহু বলে দিলেন এবং কৈলাস পাগলার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। শিষ্যরা অবাক্ হলেন, গুরুদেব কিভাবে জানলেন এই খবর। ❑

শ্রীমৎ স্বামী হংসরাজ সোহংমণি

শ্রীমৎ স্বামী হংসরাজ সোহংমণি মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন পূর্ব বঙ্গের পূর্ব প্রান্তে আখাউড়া ও মোগড়া নামক বিখ্যাত জনপদের অন্তবর্তী মণিঅন্ধ নামক গ্রামে। তাঁর জন্মতিথি হল ১৩০০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস, শুক্লা একাদশী (১৮৯৪ ইং)। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ যোগী। তাঁর পিতার নাম জয়চন্দ্র যোগী। তাঁরা হলেন দেবনাথ নামক বিখ্যাত সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায় শিবের উপাসক।

বালক সুরেন্দ্র গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। কিন্তু কৈশোরে পিতৃহারা হন। তাই পড়াশুনায় অধিক অগ্রসর হতে পারেন নি। সংসারে বিধবা মা ও একমাত্র সন্তান সুরেন্দ্র। বালক সুরেন্দ্র কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করেন। তাঁত বুনা শিখে গামছা ও অন্যান্য কাপড় বুনে বিক্রয় করে অতি কষ্টে সংসার চালাতেন। বিবাহের জন্য বারংবার অনুরোধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদয় সাধুর বালবিধবা নাতিনকে সুরেন্দ্র ঘরে আনেন। বালিকাকে পুত্রবধু হিসেবে পেয়ে মাতা খুশী হন। দেড় বৎসরের মধ্যেই উভয় মহিলা মারা যান।

সুরেন্দ্র ছিলেন সহজাত সাত্ত্বিক গুণের অধিকারী। তিনি দৈবী সম্পদ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবে সেসব গুণের স্ফুরণের জন্য অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। মাতুল গয়াচরণ, শিক্ষাগুরু রামসুন্দর দাস, শিক্ষাগুরু ভগবান চন্দ্র, সাতমোড়া নিবাসী সাধক মনমোহন দত্ত (১২৮৪-১৩১৬ বাং) কালিকচ্ছ নিবাসী সাধক আনন্দমোহন নন্দী (১২৩৯-১৩০৭ বাং) প্রমুখ মহাত্মারা সেই অনুকুল পরিবেশ রচনায় প্রভূত সাহায্য করেছেন। দিনে তাঁত বুনতেন, রাত্রে কীর্তনের আসরে যোগ দিতেন, গান বাজনা করতেন। হাতে কাম, মনে রাম।

সুরেন্দ্রনাথ যৌবনারম্ভে স্বীয় দীক্ষা গুরুর সন্ধান পান। ইহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন ঘটনা। তাঁর দীক্ষা গুরুর নাম শ্রীমৎ স্বামী হরিহর গিরি। গুরুর আখড়া ছিল ঢাকা জিলাতে। তিনি পরিব্রাজনে গেলে শিষ্যবাড়ীতে থাকতেন না, থাকতেন কোন মঠে, মন্দিরে, দেবালয়ে। খবর পেয়ে ভক্ত, শিষ্যরা আসত, দেখা করত, সৎ উপদেশ পেত। সমাজের নৈতিক মান উন্নয়নে এইসব মহাত্মাদের অবদান অপরিসীম।

হরিহর গিরি মহারাজের কাছে থেকে দীক্ষান্তে, সুরেন্দ্রের মনে ভাবান্তর হল লক্ষ্যনীয়। নির্জনে, বনে, জঙ্গলে মৌন থাকতে লাগলেন। সাংসারিক গৃহকর্ম ত্যাগ করলেন। এভাবে কয়েক বৎসর অতীত হল। অতঃপর অসম প্রদেশের কামাখ্যা তীর্থ দর্শনে গেলেন। কামাখ্যা থেকে ফিরে গৃহে প্রবেশ করেন নি। মাতুল বাড়ির পুকুরের

পাড়ে আসন পেতে বসলেন। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত করে ঢাকার নিকটবর্তী লাঙ্গলবন্দ নামক স্থানে বসবাসকারী শ্রীশ্রী ললিতানন্দ সোহংবাবা নামক সিদ্ধপুরুষ দর্শনে গেলেন। মণি-কাঞ্চন যোগ হল। ললিতানন্দ হলেন সুরেন্দ্রের সন্ন্যাসগুরু। গুরুপ্রদত্ত নাম হল স্বামী হংসরাজ সোহংমণি।

অতঃপর গোসাইস্থলী, মণিঅন্ধ, মোগড়া, গঙ্গাসাগর, কমলাসাগর, বাধারঘাট, মোহনপুর, ব্রজনগর প্রভৃতি স্থানে তিনি সাধন ভজন করেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্থানে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় এবং হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। তখন তিনি অতিকষ্টে, অতি গোপনে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় চলে আসেন। তাঁর সাধন-জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

তিনি দীর্ঘাকৃতি, গৌরাঙ্গ, জটাধারী সুপুরুষ ছিলেন। তিনি আমিষভোজী ও স্বল্পাহারী ছিলেন। কাছিমের মাংস ও তাজা মাছ ছিল তার প্রিয়। পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি নির্বিকার ছিলেন।

তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী, অদ্বৈতবাদী, জ্ঞানমার্গী, বাকসিদ্ধ, দিব্যদ্রষ্ঠা, ও অন্তর্যামী ছিলেন। ভোগী, লোভী, বিষয়ী, অবিশ্বাসী ও কুতর্কীদের নিকট তিনি সহজে ধরা দিতেন না, স্বরূপ প্রকাশ করতেন না। মন্ত্র দিতে, শিষ্য করতে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। ক্ষেত্র প্রস্তুত না হলে দীক্ষা দিতেন না। তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি ও তপোবলে নানা লোক উপকৃত হয়েছে। তাঁর ভেতর নির্বিকল্প সমাধিভাব ও মৌনভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁর তিরোভাব দিবস হল ২৫. ১১. ১৩৮৫ বাংলা (১০. ৩. ১৯৭৯ ইং)। ❑

শ্রীশ্রী অনন্ত সাধু বাবাজী মহারাজ

সমতল ত্রিপুরাতে, শ্রীহট্ট জেলাতে হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোয়ালজোর নামক গ্রামে পিতা গণেশ এবং মাতা পুণ্যময়ী-এর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন শ্রীমান অনন্ত। ইনি উত্তর কালে শ্রী অনন্ত সাধু নামে খ্যাত হন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

বালক অনন্তের বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন অতিবাহিত হয়েছে শ্রীহট্টে। তাঁর আবির্ভাব তিথি হল রাত্রিকাল, বুধবার, ১৬ই আশ্বিন ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ অক্টোবর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ। তাঁর তিরোভাব কাল হল শুক্রবার, ২৭শে শ্রাবণ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ আগষ্ট, ১৯৮২ খৃষ্টাব্দ। অনন্ত অন্তর্মুখী, শান্তশিষ্ঠ, স্বল্পবাক্ বালকরূপে ছোটবেলা থেকেই পরিচিতি লাভ করেন। দেব-দ্বিজে ভক্তি পরায়ণতা কিশোর বয়সেই প্রকাশ পেল। তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন।

উদাসীন, ভাবুক প্রকৃতির পুত্রকে গৃহমুখী, সংসারমুখী করার উদ্দেশ্যে পিতা, মাতা আয়োজন করলেন বিবাহের।১৩২৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। ইহা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। পাত্রীর নাম প্রমীলা বালা। প্রমীলাবালার পিত্রালয় হল পার্বত্য ত্রিপুরার কল্যাণপুর নামক গ্রামে। কালক্রমে অনন্ত ও প্রমীলাবালা হলেন কয়েকজন পুত্র কন্যার পিতা-মাতা। সংসারের ভরণ-পোষণের জন্য সরকারী চাকরী নিয়েছিলেন। ডাক বিভাগের হরকরা পদে কয়েক বৎসর কাজ করে ছেড়ে দেন।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই, যুবক অনন্ত ভারতীয় পরম্পরা অনুযায়ী দীক্ষা নেবার মনস্থ করলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা গুরুর নাম হল রুক্মিনীমোহন গোস্বামী। গুরুর নির্দেশিত পথ এবং নিজের ঐকান্তিকতা মিলে-মিশে সাধন ভজন চলল।

ভারত বিভাজন জনিত কারনে অন্য অনেকের মতো, তিনিও ত্রিপুরাতে চলে আসেন। ত্রিপুরার উত্তর প্রান্তে কমলপুর মহকুমাতে তিনি আশ্রয় নেন। স্বীয় অধ্যবসায়, উদ্যম, ও সাধন-ভজন বলে তিনি কমলপুরে প্রতিষ্ঠিত নাগরিকে পরিণত হন।

কালক্রমে তাঁর মধুর স্বভাব ও সাধন-ভজনের কথা জানাজানি হল ত্রিপুরাতে। ভক্ত-শিষ্য জুটতে লাগল। তিনি না ছিলেন পুরাপরি গৃহী, না ছিলেন পুরাপুরি সন্ন্যাসী। ইহ জগতকে অস্বীকার করে পরজগৎকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। উভয় জগতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা তাঁর জীবনে ও আচরণে দেখা যায়।

তিনি জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি এই ত্রিবিধ মার্গের প্লাবন আন্‌তে পারেন নি। তাঁর যশ-খ্যাতি দিগন্তব্যাপী নয়। কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র পরিসরে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি এই তিন সত্ত্বা সমন্বিত ক্ষুদ্র প্রদীপটি জীবন্ত রেখেছিলেন। তাঁর উপলব্দির গভীরতা ও আন্তরিকতা পাওয়া যায় তাঁর বাণীতে। অতি সহজ, সরল ভাষায় তিনি কয়েকটি উপদেশ দিয়ে গেছেন, যেমন —

১) অতিথিদের সেবা করিবে।

২) অপকারীর অপকার করিবে না।

৩) কপট্, কলহপ্রিয়, পরশ্রীকাতর ও লোভীর সঙ্গ ত্যাগ করিবে।

৪) কোন কাজে অধীর বা আগ্রহশুন্য হইবে না।

৫) কাহারো মনে আঘাত দিবে না।

৬) বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বয়োবৃদ্ধ, যশস্বী ও সিদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট যাইবে।

৭) দেব মন্দিরে, দেহ মন্দিরে অনাচার করিবে না।

৮) পূর্ণিমা তিথিতে কীর্তন করিবে।

৯) সাধুসঙ্গ, শাস্ত্র সঙ্গ, নামসঙ্গ করিবে। ❑

কুমার দীনমণি প্রভু

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সুসন্তান কুমার দীনমণি দেববর্মণ আগরতলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবন, আয়ুষ্কাল, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা সম্ভব হয় নাই।

দীনমণি প্রভুর পিতৃ পরিচয় নিম্নরূপ - মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য-এর রাজত্বকাল হল ১৮৬২খৃঃ হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। বীরচন্দ্রের একাধিক রাণী ও বহু পুত্র-কন্যা ছিল। বীরচন্দ্রের পুত্রদের নাম হল যথাক্রমে — রাধাকিশোর, দেবেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, সমরেন্দ্র, ত্রিপুরেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, মহেন্দ্র, বিমল চন্দ্র, ব্রজবিহারী। বীরচন্দ্রের পঞ্চম পুত্রের নাম ত্রিপুরেন্দ্র। রাধাকিশোর ও ত্রিপুরেন্দ্র ছিলেন খুব সম্ভবতঃ একই মায়ের সন্তান। ত্রিপুরেন্দ্র হলেন দীনমণি-এর পিতা। রাধাকিশোর ছিলেন যুবরাজ, সমরেন্দ্র ছিলেন বড় ঠাকুর। পরবর্তী রাজা হবার প্রশ্নে রাধাকিশোর ও সমরেন্দ্র-এর মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল। অবশেষে রাধাকিশোর রাজা হলেন। (১৮৯৬-১৯০৯খৃঃ)

কুমার দীনমণি পারিবারিক কলহে লিপ্ত হলেন না। সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করে, তিনি গৃহত্যাগী হলেন। তিনি মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে সাধন ভজন করে জীবন অতিবাহিত করলেন।

মহারাজ রাধাকিশোরের পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর হলেন পরবর্তী রাজা (১৯০৯খৃঃ-১৯২৩ খৃঃ)। বীরেন্দ্র কিশোরের দুইজন খ্যাতনামা রাণী হইলেন প্রভাবতী দেবী ও অরুন্ধতি দেবী। প্রভাবতী দেবীকে লোকে বলতবড় মাতা মহারাণী। বড়মাতার দেবর হলেন দীনমণি প্রভু। বড়মাতা একবার তীর্থযাত্রা করলেন এবং দীনমণির সহিত সাক্ষাৎ করলেন। বড়মাতা কিছু টাকা দিতে চাইলেন দীনমণিকে। দীনমণি বিনম্রভাবে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। বড় মাতা স্বচক্ষে দেখলেন যে দীনমণি সাধন-ভজন নিয়ে পরম সন্তোষে আছেন।

বীরেন্দ্রকিশোরের জন্মসন হল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। অনুজ দীনমণি আনুমানিক ১৫ বৎসরের ছোট। তাহা হলে দীনমণি আনুমানিক ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ❑

শ্রীমৎ স্বামী দয়ালানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী দয়ালানন্দ পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জামালপুর নামক গ্রামে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা ফাল্গুন বুধবার (১৮৯৯ ইং)জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রাক্তন নাম শিবচরণ ভৌমিক। তাঁর পিতা -মাতার নাম রাজচন্দ্র ভৌমিক ও নিত্যময়ী দেবী। ইহারা দেবনাথ নামক বিশাল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

শৈশবে শিবচরণ দীর্ঘদিন জ্বরে ভোগেন এবং পাঁচ বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন। পিতা দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। বালক শিবচরণ খেলাধূলা করে সময় কাটাতেন; মাত্র তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। যৌবনারম্ভে স্বর্ণকারের কাজ করে ধন উপার্জন করেন এবং আঠারো বৎসর বয়সে বিবাহ করেন।

পিতার উপদেশে প্রায় প্রতিদিন গীতা পাঠ করতেন। এছাড়া, গান বাজনা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। কবিগান, যাত্রাগান, পালাগান, ভজন-কীর্তন যেখানে হত সেখানে যেতেন। এমনই এক আসরে, প্রশ্নোত্তরে জনৈক কবি বললেন যে, কয়লার ময়লা ঘুচে জ্বলন্ত অগ্নিতে দিলে। এ কথাটি তাঁর অন্তরে তড়িৎ প্রবাহের মত কাজ করল। ষড় রিপু জনিত কালিমা ঘুচার জন্য সৎগুরুর আশ্রয়ে সাধন-ভজন অত্যাবশ্যক বলে দৃঢ় বিশ্বাস হল। তিনি অধীর আগ্রহে গুরুর সন্ধান করতে থাকেন। অচীরেই গুরু পেয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্য বিবেকানন্দ; আরেক শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। বিবেকানন্দের সমসাময়িক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য হলেন স্বামী দেবেনানন্দ। দেবেনানন্দের শিষ্য হলেন শিবচরণ, অর্থাৎ দয়ালানন্দ। দেবেনানন্দ থাকতেন আখাউড়াতে, তিতাস নদীর পশ্চিম পাড়ে, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সাধনা কুটির নামক আশ্রমে।

দীক্ষা লাভ করার পর শিবচরণের অন্তরে বিষয়-বৈরাগ্য, গুরুর চরণে আত্ম সমর্পণের ঐকান্তিক আগ্রহ তীব্রতর হল। তিনি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন সংসার ত্যাগ করার। সদস্যরা অনুমতি দিল না, বরং সকলেই সংসারত্যাগী হয়ে শিবচরণের অনুগামী হতে চাইল। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর, অবশেষে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা রাত্রে গোটা পরিবার রওনা হল গুরুর আশ্রম অভিমুখে। পিতা, মাতা, কাকা, কাকীমা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র সহ শিবচরণ এলেন গুরুর আশ্রমে। সেদিন মোট ১৭ জন লোক ছিলেন যাত্রাপথে। এই ১৭ জনের বংশতালিকা নীচে সংযোজিত হল।

বংশলতিকা
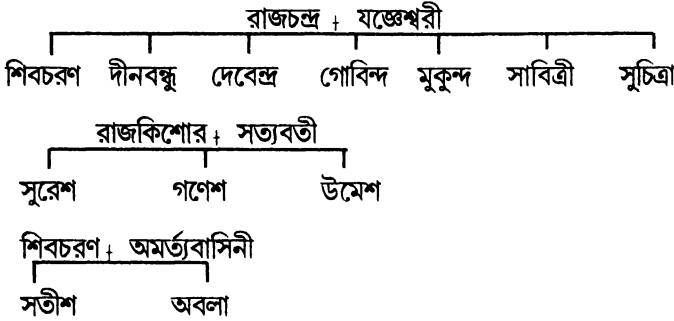
শিবচরণ = দয়ালানন্দ। দীনবন্ধু গৃহী ছিলেন। দেবেন্দ্র = দীনানন্দ।

গোবিন্দ = দ্বারকানন্দ। মুকুন্দ = অদ্বৈতানন্দ। সুরেশ = দ্বিজানন্দ।

গণেশ = দর্শনানন্দ। উমেশ = দীনেশানন্দ।

রাজচন্দ্র ও রাজকিশোর ছিলেন সম্পর্কে ভাই।

১৩৩৬ বাংলার ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে ময়মনসিং ছেড়ে, চলে এলেন আখাউড়াতে গুরুধামে। ১৩৩৯ বাংলার ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে আখাউড়াস্থ গুরুধাম ছেড়ে, এলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে সুরেন্দ্র বণিকের বাড়ীতে। ১৩৪০ বাংলার ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়েএলেন আগরতলাতে, হরেন্দ্র মালাকারের বাড়ীতে। ১৩৪১ বাংলার ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে চলে আসেন শিবনগরে দুর্গাচরণ চৌধুরীর বাড়ীতে। ১৩৪৩ বাংলার ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে ধলেশ্বরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনা কুটির নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালের ঘটনা।

সপ্তবর্ষ ব্যাপী (১৯৩০-১৯৩৬ ইং) গৃহহারা হয়ে থাকার পর আবার আশ্রমিক গৃহ পেয়ে (১৯৩৭ ইং) পরবর্তী ২৫ বৎসর (১৯৩৮-১৯৬২ ইং) বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেছেন এই সন্ত-পরিবার। এই পঁচিশ বৎসর হল রামকৃষ্ণ সাধন কুটিরের সুবর্ণ যুগ, বা দিগ্বিজয়ের যুগ। আগে শুধু একটি পরিবারের ১৭ জন লোক নিয়ে আশ্রম ছিল। সুবর্ণযুগে ভিন্ন বর্ণ ও বংশ থেকে এলেন স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী জ্ঞানানন্দ, স্বামী জগদানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ। দান, দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য তাঁরা অনেকেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তেন। পূর্ব বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরায় প্রতি বছর আশ্বিণ, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ - এই পাঁচ মাস দান সংগ্রহে যেতেন স্বামীজিরা। দান

সংগ্রহকারীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী দয়ালানন্দ, দীনানন্দ, দ্বারকানন্দ, দ্বিজানন্দ, দর্শনানন্দ, দীনেশানন্দ, অভেদানন্দ, প্রেমানন্দ, জ্ঞানানন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। স্বামী অদ্বৈতানন্দ আশ্রমে রয়ে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপ্রমুখের দায়িত্ব পালন করতেন। স্বামী দয়ালানন্দের বিষয়বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ম। ভিক্ষালব্ধ অর্থের যোগক্ষেম করতে, গঠনমূলক কাজে লাগাতে, মূলধনী আয় বাড়াতে তিনি দক্ষ ছিলেন। আগরতলার পূর্ব দিকে, কয়েক ক্রোশ দূরে, ইচামুয়া এবং রাধাকিশোর নগর নামক গ্রামে কৃষিভূমি কিনে দুইটি খামার গড়ে তোলা হল। এই ভাবে স্থায়ী ও নিশ্চিত উপার্জনের ব্যবস্থা করে, আশ্রমে ঘর বাড়ী, মন্দির পাকা করা হল, অতিথিশালা, ছাত্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, সংস্কৃত টোল গড়ে তোলা হল। ভজন, কীর্তন, গান, বাজনা, পূজা-পার্বণে, এই আশ্রম ছিল আগরতলার মধ্যে সেরা প্রতিষ্ঠান। এই আশ্রমের দুর্গাপূজার বিশেষত্ব ছিল জীবন্ত মানুষকে দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সাজিয়ে পূজা করা হত এবং বহু লোককে খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়া হত। দয়ালানন্দের বাক্যে-কার্যে-চিন্তায় সমাজ সেবার ভাব খুব প্রবল ছিল।

অতঃপর অধঃপতনের পালা শুরু। কিছু লোক স্বামী দয়ালানন্দের বিরুদ্ধে নানা রকম অপবাদ রটাতে থাকল। অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ আনল। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ ইং পর্যন্ত চলল বাদানুবাদ। বিচারালয়ে সেই অভিযোগ নাকচ হল। কিন্তু এতে স্বামীজির মনে আঘাত এল। তিনি এবার অন্যভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। রাধাকিশোর নগরস্থ খামার বিক্রয় করে সেই টাকা নিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গেলেন ১৯৬৭ সালে। সেখানে ৭০ কানি ভূমি কিনে গড়ে তুললেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনালয়। এই আশ্রমেই তিনি ১৩৭৬ বাংলার ১লা ফাল্গুন (১৯৭০ ইং) দেহত্যাগ করেন। দয়ালানন্দ প্রস্থান করার পর, অন্যান্য স্বামীজিরাও মনোবল হারিয়ে ফেলেন এবং অন্যত্র চলে যান। ফলে এক কালের কর্ম মুখর, জমজমাট আশ্রম, এখন জনহীন ছাড়াবাড়ী সদৃশ। ❑

নিত্যদাস বাবাজী

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা নগরে আনুমানিক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মনিপুরী বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ধূম্রজিৎ সিংহ। ধূম্রজিৎ পরবর্তী জীবনে নিত্যদাস বাবাজী নামে খ্যাত হন এবং রাজস্থানে নাথদ্বার নামক তীর্থে সাধন-ভজন করেন।

মণিপুর ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে অতীতে বহুবার সংঘর্ষ হয়েছিল। মহারাজ মারজিৎ সিংহের রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশ কর্তৃক মণিপুর অধিকৃত ও অত্যাচারিত হয় একটানা দীর্ঘ সাত বৎসর ব্যাপী (১৮১৯-১৮২৫খৃঃ)। ইয়ান্দাবো চুক্তি (১৮২৬খৃঃ) দ্বারা বৃটিশ সরকার মণিপুরকে রাহুমুক্ত করল। সপ্তবর্ষ ব্যাপী সংকটকালে অসংখ্য মণিপুরী আশ্রয় নিল অসম, বঙ্গদেশ, ত্রিপুরা প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যে। ধূম্রজিতের পূর্বপুরুষ এভাবে ত্রিপুরায় আসেন। রাজকুমার বুদ্ধিমন্তজিৎ সিংহ (আঃ১৮৭৮-১৯৪৭)হলেন ধূম্রজিতের পিতা। মাতার নাম দুর্লভী। বুদ্ধিমন্তজিৎ ছিলেন তিন পুত্রের পিতা, তিনপুত্রের নাম হল যথাক্রমে — ধূম্রজিৎ, কমলজিৎ এবং ইন্দ্রজিৎ। বুদ্ধিমন্তজিৎ এতবেশী কারিগরী বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন যে পিতৃদত্ত আদিনাম আঙুসেনা অপেক্ষা নতুন নাম (বুদ্ধিমন্তজিৎ) অধিক পরিচিত হল। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার শিল্পাশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক। উত্তরাধিকারসূত্রে, সহজাতপ্রবণতা হিসাবে, কারিগরী দক্ষতা লাভ করেছিলেন ধূম্রজিৎ। ধূম্রজিৎ ছিলেন ত্রিপুরার রাজবাড়ীর ঘড়িসমূহের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক। বুদ্ধিমন্তজিৎ একটি ঘড়ির দোকান দিয়েছিলেন, দোকানের নাম বি. এম. সিংহ এন্ড কোম্পানী। ইহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সামান্য আগে বা পরের উদ্যোগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বুদ্ধিমন্তজিৎ ও ধূম্রজিৎ প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন ঐ দোকানের মাধ্যমে। তখন আগরতলাতে কাগজী মুদ্রার ছড়াছড়ি।

ধূম্রজিৎ বিবাহ করেছিলেন। স্ত্রীর নাম কমলিনী। তাঁদের ছিল চার কন্যা এবং একপুত্র । তাদের নাম যথাক্রমে তরুণী, পরমেশ্বরী, বিমলা, নির্মলা, এবং মনিসেনা। একমাত্র পুত্র মনিসেনা কৈশোরে অকালে মারা যান। ধূম্রজিতের প্রথমা কন্যা তরুণী-এর স্বামী হলেন কুলচন্দ্র সিংহ (১৭.৬.১৯২০ খৃঃ -)। কুলবাবু ত্রিপুরার উচ্চপদস্থ কর্তব্যনিষ্ঠ রাজকর্মচারী (১৫.৪.১৯৪৭-৩১.৩.১৯৮০ খৃঃ) ছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ -এর অন্তর্বর্তীকালে (১৯১৫-১৯৪৫ খৃঃ) আগরতলাবাসী উত্তেজনা, চাঞ্চল্য, প্রচুর অর্থাগম, চৈত্রমেলা, জুয়া, বাঈজী নাচ, যাত্রাপালা ইত্যাদির মধ্যে দিন কাটাত। বিখ্যাত গ্রামোফোন কোম্পানী এইচ. এম.ভি. তখন বাজারে

কলের গান ছেড়েছে। ত্রিপুরেশ মজুমদার আগরতলাতে ঐ সব এনে বিক্রয় করতেন। বীর বিক্রমের কাকা রণবীর কর্তা ছিলেন প্রথম ও প্রধান গ্রাহক। ধূম্রজিৎ ও রণবীর ছিলেন মিত্র। ধূম্রজিতের মাধ্যমে রণবীর কর্তা ঐ সব গান কিনতেন। কর্নাজুন সংবাদ, নিমাই সন্ন্যাস, সিরাজুদ্দোল্লা পালা শুনতে লোকের খুব ভীড় হত। নিমাই সন্ন্যাস পালা শুনে ধূম্রজিৎ কাঁদতে-কাঁদতে গড়াগড়ি যেতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়তেন। টাকার পেট্‌রাতে মাঝে-মধ্যে পদাঘাত করতেন। তারপর পুত্রশোক, অতঃপর পিতৃশোক (১৯৪৭ খৃঃ)। রাজবাড়ীর ঘড়ি দেখাশুনার দায়িত্ব দিলেন অনুজ ইন্দ্রজিৎকে; ঘড়ির দোকান দিলেন জনৈক জ্ঞাতি ভ্রাতাকে; পরিবারের দায়িত্ব দিলেন জামাতা কুলচন্দ্রকে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে একদিন রাত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। একমাত্র ইন্দ্রজিৎ সংগে ছিলেন, ইন্দ্রজিৎ আখাউড়ায় গিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলেন। পরদিন জানাজানি হল। অনুজ কমলজিৎ বৌদিকে সাথে করে বিমানে পরদিনই চলে গেলেন কলিকাতায়। শিয়ালদহে অপেক্ষা করতে থাকলেন। এমন সময় ধূম্রজিৎ বগলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ নিয়ে গাড়ী থেকে যেই বের হলেন, অমনি কমলজিৎ ধরে ফেললেন। অনেক কথাবার্ত্তা হল। অবশেষে দাদা ও বৌদিকে তীর্থযাত্রায় পাঠিয়ে চারশত টাকা হাতে দিয়ে কমলজিৎ একা গাড়ী করে আগরতলায় ফিরেন। কয়েক মাস তীর্থ পর্যটন করে স্বামী -স্ত্রী বাড়ী ফিরেন। অবশেষে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিয়ে ধূম্রজিৎ একাকী গৃহত্যাগ করে চলে যান।

গৃহত্যাগী হয়ে তিনি কখন, কোথায় ছিলেন, কার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন, কি ভাবে খাওয়া- দাওয়া করতেন- ইত্যাদি জানা যায় নি। গৃহত্যাগের পর তিনি মাত্র সাত বৎসর বেঁচে ছিলেন। কাশীধামে কিছু দিন ছিলেন। তখন মশার উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে মশারীর জন্য আগরতলায় চিঠি লিখেন। পরিবারের লোক জন কাল বিলম্ব না করে ডাকযোগে একটি মশারী পাঠিয়ে দেন।

অন্তিম কালে কয়েক বৎসর তিনি রাজস্থানের নাথদ্বার নামক তীর্থে ছিলেন। শ্বেত পাথরের পাহাড় হল নাথদ্বার তীর্থ। সাধনজীবনে তিনি নিত্যদাস বাবাজী -এই নাম প্রাপ্ত হন। নাথদ্বার আশ্রমের ঘরের তালা-চাবি সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে নিত্যদাস বাবাজী সুরাহা করে দিতেন। তাই লোকেরা বল্‌ত চাবি বাবাজী। নাথদ্বারে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের গোড়াতে শীতকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখানেই শেষ কৃত্য সমাপন করেন ভক্তরা। ❑

পঞ্চশ্রী ভক্ত হরিদাস ব্রজবাসী গোস্বামী

পঞ্চশ্রী ভক্ত হরিদাস ব্রজবাসী গোস্বামী ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত জম্পইজলা এলাকার দেবচরণ বৈরাগীপাড়া নামক গ্রামে আনুমানিক ৫০০৩ কলি যুগাব্দে (১৯০১ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ভক্ত হরিদাসের পূর্ব নাম ছিল হরিসাধন কলই। তাঁর পিতার নাম মোহনদাস ব্রজবাসী গোস্বামী। ইহারা কিরাত জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ত্রিপুরী ক্ষত্রিয়। মোহনদাসের তিনপুত্র এবং এক কন্যা। ইহাদের নাম যথাক্রমে দালাচন্দ্র, মাখনচন্দ্র, হরিসাধন এবং ভক্তলক্ষ্মী। হরিসাধনের দুই স্ত্রী, দুইপুত্র এবং এক কন্যা।

পিতা মোহনদাস নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। বড় ভাই দালাচন্দ্র ছিলেন সন্ন্যাসী। পিতা ও দাদার সান্নিধ্যে কৈশোরেই হরিসাধনের ভজন, কীর্তন, একাদশী পালন, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদিতে হাতেখড়ি হয়। বাল্যশিক্ষা, ধারাপাত পর্যন্ত বাড়ীতেপড়ে, আগরতলা আসবেন উচ্চশিক্ষার্থে, এমন সময় দালাচন্দ্র মারা যান। তাই উচ্চশিক্ষার্থে আগরতলা আসা হল না। দাদার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখে, তাঁর অন্তরে বৈরাগ্যভাব তীব্র হল। ঘর-বাড়ী ছেড়ে বদরিকাশ্রমে যাবার মনস্থ করে হিন্দি শিখতে চাইলেন। ১২ বৎসর যাবৎ রান্না করা ভাত-তরকারী খান নি, বনে জংগলে, খামার বাড়ীতে, জুমক্ষেতের টংঘরে নির্জনে সাধনা করেছেন। ফল মূল ঝর্ণার জল আহার করেছেন। পিতা-মাতাও গ্রহবিপ্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। হরিসাধন গুরুজনদের পায়ে পরে কান্নাকাটি করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁরা সন্ন্যাস নিতে অনুমতি দেন নি, তাই বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বিবাহ বন্ধনের পরও, তিনি প্রায়ই নির্জনে বনে জঙ্গলে গিয়ে উপাসনা, যোগাসন, ধ্যান করতেন। এই ভাবেই তিনি গুরুর সাক্ষাৎ পান। তাঁর গুরু হলেন শ্রীমৎ যতীন্দ্রমোহনদাস ব্রজবাসী গোস্বামী। যতীন্দ্রমোহনদাস বংশে বঙ্গসন্তান, পারিবারিক জীবনে চিরকুমার এবং পেশায় নেতাজী সুভাষ বসুর সহকর্মী ছিলেন। যতীন্দ্রমোহনদাস শেষ জীবন কাটান জম্পুইজলা এলাকায়।

দীক্ষান্তে গুরুদেব নামকরণ করেন পঞ্চশ্রী ভক্ত হরিদাস ব্রজবাসী গোস্বামী। অতঃপর তিনি তেলিয়ামুড়া, তুইসিন্দ্রাই, তুইদু, অম্পি, জম্পই জলা, গোলাঘাটি, টাকারজলা প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ২০/২৫ টি হরিসভা স্থাপন করেন এবং প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ভজন-কীর্তন যাতে নিয়মিত চালু থাকে তার ব্যবস্থা করেন। তামসিক আহার-বিহার ছেড়ে সাত্ত্বিক জীবন-যাপন যাতে গ্রামবাসীরা করে তার জন্য তিনি ঘুরে-ঘুরে উপদেশ দিতেন। গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করে শুনাতেন। এছাড়া তিনি নিজে কয়েক শত ভক্তিগীতি

ও বাউল গীতি রচনা করেছেন।

তাঁর নিবাস যে-গ্রামে, সে-গ্রামেই শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম নামক একটি সুপ্রাচীন আখড়া আছে। আখড়াটি মহারাজ বীরচন্দ্রের আমলে (১৮৬২-১৮৯৬খৃঃ) নির্মিত। এই আশ্রম সেই বিরাট এলাকার শান্তিস্থল ও শক্তিস্থল। বহু সাধু-সন্ত এই আশ্রমে সাধন ভজন করেছেন। ভক্ত হরিদাস গোস্বামী এঁদের অন্যতম। জটাজুটহীন, ধুতি- নামাবলী পরিধানকারী, গৌরাঙ্গ, খাটোদেহী ভক্ত হরিদাস ব্রজবাসী গোস্বামী বর্তমানে অতিবৃদ্ধ। তিনি শতায়ু হোন। ❑

স্বামী নির্ব্বিকারানন্দ সরস্বতী

অবিভক্ত বঙ্গদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত নদীয়া জেলাধীন জয়রামপুর নামক গ্রামে একঘর ধনাঢ্য ভূস্বামী বাস করতেন; ভুস্বামীর নাম অমূল্যনাথ চক্রবর্তী। তাঁর সহধর্মিনীর নাম রামরঙ্গিনী চক্রবর্তী। এই চক্রবর্তী-দম্পতির তৃতীয় পুত্র শশাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে স্বামী নির্ব্বিকারানন্দ সরস্বতী নামে খ্যাত হন। তাঁর আবির্ভাব তিথি হল মঙ্গলবার ৮ই পৌষ, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৯০২খৃষ্টাব্দ।

বড়লাট Warren Hastings. (১৭৭৪-১৭৮৫ খৃঃ) ছিলেন Fort William এর কর্মাধ্যক্ষ। তাঁর দেওয়ান ছিলেন কৃষ্ণকান্ত নন্দী । তাঁর ডাকনাম ছিল কান্তবাবু। কাশিমবাজার রাজপরিবারের আদি স্থাপয়িতা হলেন এই কান্তবাবু। তাঁর জমিদারীর বিস্তৃতি ছিল অতীব বিশাল। অমূল্যনাথ ছিলেন তুলনামূলক বিচারে অপেক্ষাকৃত ছোটখাট জমিদার। যাই হোক, এই পরিবারের আর্থিক প্রাচুর্য্য ও সামাজিক বদান্যতা ছিল । অমূল্যনাথ ছিলেন পাঁচ পুত্রের পিতা। পুত্রদের নাম হল, যথাক্রমে- অরুণেন্দু, সুধীরেন্দু, শশাঙ্কশেখর, নির্মলেন্দু ও কমলেন্দু। পুত্রদের মাতুলালয় ছিল রাজশাহী জেলাধীন মৈনস নামক গ্রামে। শশাঙ্কশেখর জন্মগ্রহণ করেন মাতুলালয়ে।

শৈশব, বাল্য, কৈশোর

শশাঙ্কশেখর পিতৃগৃহে, গ্রামেরপরিবেশে শৈশব,বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেন। বিশালবাড়ী, তেতলা পাকাঘর, ভাই, আত্মীয়স্বজন, কর্মচারী, পুকুর, গোশালা, গাছগাছড়া, উৎসব পার্বণ-এই সব নিয়ে যে-পরিবেশ, তাতে লালিত-পালিত হয়েছেন বালক শশাঙ্কশেখর। আশৈশব সুবোধ বালক বলে তাঁর সুনাম ছিল। এই চক্রবর্তী পরিবারে আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ ছিল। তাই শশাঙ্কশেখর কোনদিন আমিষজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করেন নি। আজন্ম শাকাহারী তিনি।

শিক্ষা

শশাঙ্কশেখর বেশী-দূর পড়াশুনা করেন নি। বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের নিকট, গ্রাম্য পাঠশালায় এবং অবশেষে দামুড়হুদা উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়া হল। তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিহাস ও ইংরাজী ছিল প্রিয় বিষয়। ছাত্র হিসাবে ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী। মহানগরে গিয়ে মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হবার

আর্থিক ক্ষমতা ও মেধাগত যোগ্যতা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু নানাবর্ণ ও বংশের ছাত্র নিয়ে গঠিত ছাত্রাবাসে থাকা-খাওয়া অপছন্দ হল,তাই আর সেদিকে অগ্রসর না হয়ে সাধনপথে যাবেন বলে মনস্থির করলেন। পিতা অমূল্যনাথ (আঃ১২৮০-১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) তাতে আপত্তি করেন নি। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর উপনয়ন সংস্কার হয়েছিল। তখন নিগমানন্দের রচিত পুস্তক থেকে গায়ত্রীমন্ত্র পড়েছিলেন।

বিদ্যোৎসাহিতা ও স্বাদেশিকতা

শশাঙ্কশেখর পড়তে ও পড়াতে ভালবাসতেন। তাই ছাত্রজীবনেই গ্রামের বাড়ীতে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন করেন। এ কাজে বাবা ও দাদারা উৎসাহ দিতেন। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা, ছাত্র-ছাত্রীরা সেই গ্রন্থাগারে এসে ভাল-ভাল বই ও পত্র-পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেত। এজন্য কোন শুল্ক দিতে হত না । ধর্মগ্রন্থ, পাঠ্যপুস্তক, অমৃতবাজার পত্রিকা, প্রবাসী, বসুমতী, মডার্ণ রিভিউ প্রভৃতি থাকত ঐ গ্রন্থাগারে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই গ্রন্থাগার শুরু করেছিলেন এবং ১৯৩০সাল পর্যন্ত ইহা খুব জনপ্রিয় ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি কলিকাতা যখনই যেতেন, একটু সময়-সুযোগ করে Imperial Library তে গিয়ে বসতেন, পড়তেন ।তদুপরি, স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। বিলাতী কাপড়, লবণ ইত্যাদি বর্জন করেন ও চরকায় সূতা কাটতেন। তাঁর পাঠাগার ছিল স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম কর্মকেন্দ্র।

মাতৃ বিয়োগ

মাতা রামরঙ্গিনী দেবী দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করেন। মাতৃভক্ত পুত্র শশাঙ্কশেখর মায়ের সেবাযত্ন করতেন। মায়ের রোগ আর সারে না, অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে কলিকাতাতে নেওয়া হল। তখনও শশাঙ্কশেখর মায়ের শর্য্যাপার্শ্বে। অবশেষে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাতার মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পর গৃহত্যাগ করেন যুবক শশাঙ্ক শেখর।

গৃহত্যাগ

মাতার মৃত্যুজনিতআঘাত বা কোন অপকর্ম বা কোন কলহ অথবা কোন স্বদেশী আন্দোলন - প্রভৃতি কারণের মধ্যে কোনটাই তাঁর গৃহত্যাগের অর্ন্তনিহিত কারণ নয় । পূর্বার্জিত সুকর্মের ফল এবং আজন্ম সাত্ত্বিক সংস্কার বশতঃ তিনি সংসারত্যাগী হন। ১৩৩৭ বাংলার মাঘ মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৯৩১খৃঃ) শীতকালে, শেষরাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করেন। বড়দাদা পঞ্জিকা দেখে শুভ লগ্ন নির্ণয় করে দিয়েছিলেন। সেই মতে, গুরুজনদের

প্রণাম করে, বাড়ীর গৃহদেবতাকে ভক্তি করে একবস্ত্রে ঘর ছাড়লেন। বড় দাদা পাঁচটি টাকা আশীর্ব্বাদ হিসাবে দিলেন। বাড়ীর পথ হারাবেন বলে, রাজপথে এসে দাঁড়ালেন। জাগতিক সুখের ক্ষণস্থায়িত্ব মেধাবী যুবক মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেন।

পরিব্রাজন

অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা হল শুরু। সাথে ছিল পাঁচটি টাকা এবং কতিপয় আশ্রমের ঠিকানা। নিকটেই রাণাঘাট রেল ষ্টেশন। রাণাঘাট থেকে উত্তরে মুর্শিদাবাদ। রেলপথে রাণাঘাট থেকে মুর্শিদাবাদ গেলেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ঐতিহাসিক রণক্ষেত্র পলাসীর প্রান্তর। পলাসীর প্রান্তরে ছিল এক বিশাল বটগাছ। বটগাছতলে থাকতেন জনৈক সাধু। ঐ সাধুর নিকট তিন দিন, তিন রাত ছিলেন এবং সাধুর সাধনপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ঐসাধুর মধ্যে মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতির প্রতি প্রবণতা অধিক। যুবক শশাঙ্কশেখর -এর মনঃপুত হল না।

চতুর্থ দিনে রেলপথে মুশির্দাবাদ থেকে পুনরায় রাণাঘাট এলেন। রাণাঘাট থেকে উত্তর-পূর্বদিকে হল গোয়ালন্দ ঘাট। পদ্মানদীর তীরে হল গোয়ালন্দ ঘাট। গোয়ালন্দ ঘাট উজানে, চাঁদপুর ঘাট ভাটীতে। রাণাঘাট থেকে সোজাপূর্ব্বে হল চাঁদপুর, কিন্তু যেতে হয় ঘুরে, গোয়ালন্দঘাট হয়ে। রাণাঘাট থেকে রেলপথে যুবক গেলেন গোয়ালন্দ ঘাটে। তিনবার রেলগাড়ীতে উঠায়, পাঁচ টাকা থেকে প্রায় সাড়ে তিন টাকা কমে গেল। আর আছে মাত্র দেড় টাকা। গোয়ালন্দঘাট.থেকে চাঁদপুর যাবার জাহাজ ভাড়া হল আড়াই টাকার মত। অর্থাৎ এক টাকা কম হাতে আছে। হাতের দেড় টাকা দিয়ে ভোজনালয়ে ভাত খেয়ে নিলে গন্তব্যস্থলে যাওয়া হবে না। তাই পদ্মা নদীর তীরে,বালুচরে উপবাসে তিনদিন তিন রাত্রি কাটালেন। ফলে চলবার, কথা বলার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। ভিক্ষা করতে মনস্থ করলেন, কয়েক দোকানে গেলেন। দোকানদার জিজ্ঞাসা করে -কি চাই ? উত্তর-না, কিছু না। মুখ খুলে ভিক্ষা চাওয়া যে কি কঠিন!

কথা প্রসঙ্গে জনৈক ব্যক্তি পরামর্শ দিলেন যে, গোয়ালন্দ ঘাট থেকে পরবর্তী নিকটতম ঘাটের ভাড়া হল মাত্র পাঁচ আনা। পাঁচ আনার প্রবেশ পত্র কিনে একবার জাহাজে উঠলে পর, পরে যা হবার হবে। পরামর্শ মত কাজ করা হল। জাহাজে উঠার পর, প্রবেশ পত্র পরীক্ষক জনে-জনে পরীক্ষা করতে- করতে, যুবককে ধরল। যুবক শশাঙ্ক অকপটে সত্যকথা স্বীকার করলেন এবং পরিধেয় জামাটা দিয়ে দিলেন। পরীক্ষক কিছুটা পয়সা রেখে বাকী ১১ পয়সা এবং জামাটা ফেরৎ দিল। চাঁদপুর যাবার অনুমতি পাওয়া গেল। চাঁদপুরে এসে জাহাজ থামল। তখন রাত হয়ে গেছে।

চাঁদপুর তখন লোকে লোকারণ্য। নিকটেই কোথাও মেলা চলছিল। চাঁদপুরে পদার্পণ করেই বিশ্রাম ও খাবার চাই। কিন্তু কোনটাই মিল্‌ল না। নর্দ্দমার পাশে অভুক্ত অবস্থায় শুয়ে রাতটা কোন মতে কাটালেন। পর দিন খাবারের আশায় অনেকের সামনে দাঁড়ালেন, কিন্তু মুখ ফুটে না, নিরুত্তর থাকেন। অতি কষ্টে আস্তে-আস্তে হাঁটতে-হাঁটতে এক বাড়ীর সামনে দেখেন "হিন্দু মিশন" -এই নামে বিজ্ঞাপন। একটু আশার আলো পাওয়া গেল। ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করেন সঙ্কোচে ও ক্ষীণ ভরসায়। দেখা গেল এক হিন্দু ভদ্রলোক গীতাপাঠে রত। গীতা পাঠককে ধীরে-ধীরে সব বলা হল । তিনি আশা-ভরসা দিলেন এবং বাড়ী থেকে একটু এসে নিকটবর্তী আরেক ভদ্রলোকের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি হলেন অশ্বিনীকুমার ব্রহ্মচারী, যিনি বর্ণে ব্রাহ্মণ, পেশায় উকিল । তিনি অন্নদাতা। দুপুরে তাঁর বাড়ীতে ভোজন সেরে পদব্রজে কুমিল্লা অভিমুখে রওনা দিলেন। চাঁদপুর থেকে কুমিল্লার দূরত্ব নেহাৎ কম নয়, প্রায় ৪৬ মাইল, উত্তর-পূর্ব দিকে । কুমিল্লার পর সাহাতলী। খুব ছোট ষ্টেশন। মাত্র একজন কর্মচারী । ক্লান্ত হয়ে ষ্টেশন মাষ্টারের কক্ষে একটু বিশ্রাম নেন । একটু পরেই পায়খানার বেগ হল। জামাতে তখন মাত্র এগারটি পয়সা । জামাটি খুলে রেখে শৌচালয়ে গেলেন। ফিরে এসে জামাটি গায়ে দিয়ে আবার পথ চল্‌তে থাকেন। পথ চলতে- চলতে ঐ কয়টি পয়সার শব্দ হত।। ষ্টেশন মাষ্টারের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার পর , পয়সার শব্দ আর হয় না । কোষে হাত দিয়ে দেখেন ঐ এগারটি পয়সা আর নেই। কপর্দকশুন্য হওয়াতে স্বস্তি ও আনন্দ হল। পথ চলার বিরাম নেই। রাত প্রায় আটটা নাগাদ মেহার কালীবাড়ী ষ্টেশনে এসে পৌঁছলেন। রাত্রে সেখানেই শুয়ে রইলেন। পরদিন আবার হাঁটা। নানা লোককে জিজ্ঞাসা করতে-করতে এলেন দুর্গাপুরে, দুর্গাপুর থেকে ময়নামতীতে, ময়নামতীতেই স্বামী নিগমানন্দ কর্তৃক স্থাপিত পূর্ব্ব বাংলা সারস্বত আশ্রম অবস্থিত। এই ময়নামতী পাহাড় হল ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল।

গুরু

ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও মানিকসুন্দরী দেবীর পুত্র নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় হলেন উত্তরকালে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী। তাঁর আয়ুষ্কাল হল ঝুলনপূর্ণিমা, শ্রাবণ, ১২৮৭বঙ্গাব্দ থেকে ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ,অর্থাৎ ১৮৮০-১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ। নানা তীর্থ ভ্রমণ করে, নানা গুরু সান্নিধ্য পেয়ে, যে-উপলব্ধি তাঁর হল, সেটি প্রকাশ করেন কয়েকটি পুস্তকের মাধ্যমে। তন্মধ্যে ছয়টি পুস্তক বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, যেমন- **যোগীগুরু, তান্ত্রিকগুরু, জ্ঞানীগুরু, প্রেমিকগুরু, ব্রহ্মচর্য সাধন, উপদেশামৃত**। এছাড়া তিনি ছয়টি আশ্রম স্থাপন করে গেছেন। আশ্রমগুলোর অবস্থান হল- (ক) অসমের জোড়াহাটের নিকট কোকিলামুখে,(খ) ময়নামতীতে (গ) ঢাকার ভাওয়ালে (ঘ) বগুড়াতে (ঙ) হালিশহরে

(চ) মেদিনীপুরে । আশ্রমগুলোর মধ্যে সমন্বয় স্থাধন কল্পে এবং ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে সহযোগীতা সাধন কল্পে তিনি কয়েক বৎসর পর-পর ভক্ত সম্মিলনী প্রবর্তন করে যান। এই সমাবেশের নাম হল সার্ব্বভৌম ভক্ত সম্মিলনী। প্রাচীন ভারতের উপাখ্যানে বর্ণিত শিষ্য আরুণী হলেন নিগমানন্দের আদর্শ শিষ্য। তাই তিনি নিষ্কাম সেবা, গুরুভক্তি, আশ্রমরক্ষা, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিতেন। তাঁর আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী শিষ্যরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আশ্রমের যাবতীয় কর্মে রত গৃহী সদৃশ।

ময়নামতীতে আশ্রম (১৯১৯-১৯৫২)

১৩২৫বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে ময়নামতীতে ১৫ বিঘা ভুমি ১৫০০ টাকাতে ক্রয় করা হল। ক্রেতা হলেন স্বামী নিগমানন্দ, সহযোগী হলেন দুর্গাপুর নিবাসী জয়চন্দ্র বিশ্বাস ও গোলক চন্দ্র দে, রক্ষক-সেবক হলেন চিদানন্দ মহারাজ। ইহা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। চিদানন্দ মহারাজ কাজে আশানুরূপ সফলতা দেখাতে পারেন নি। তিনি চলে গেলেন। অতঃপর প্রেরিত হলেন কুমারানন্দ মহারাজ। যিনি পরে আত্মানন্দ সরস্বতী বলে পরিচিত হলেন। কুমারনন্দ এলেন ১৩২৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন খুব স্বাস্থ্যবান, অত্যন্তপরিশ্রমী, কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ, কড়া মেজাজের মানুষ। সে সময় আশ্রমে রান্না করতেন সুরেন্দ্র ব্রহ্মচারী। এছাড়া ছিলেন শ্যামদাস ব্রহ্মচারী। কয়েক বৎসর পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট থেকে আসেন এক অনাথ বালক নাম নবদ্বীপ। নবদ্বীপ পরে দীক্ষান্তে স্বামী নির্মলানন্দ সরস্বতী (১৯০৫-১৯৮৮ খৃঃ) নামে পরিচিত হন। ১৩৩০বঙ্গাব্দে বগুড়াতে ভক্ত সম্মেলন হল। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে ভক্ত সম্মেলন হল ময়নামতীতে। ১৯৩০ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত বগুড়া সম্মেলন থেকে এসে আত্মানন্দজী কঠোর পরিশ্রম করে ময়নামতী আশ্রমকে সাজাতে লাগলেন ১৩৩১বঙ্গাব্দে সম্মেলনের জন্য। তখন মাটি কাটা থেকে যাবতীয় কাজে সহায়তা করেছেন শ্যামদাস ব্রহ্মচারী, নিকুঞ্জবিহারী দেবনাথ, প্যারীমোহন দেবনাথ, সারদাচরণ চক্রবর্তী, বৈকুন্ঠনাথ, বিহারীমোহন শর্মা প্রমুখ ভক্তরা। নির্মলানন্দ ও শশাঙ্কশেখর তখনও আশ্রমে আসেন নি। আশ্রমিক জীবনে নির্মলানন্দ প্রবীন, শশাঙ্কশেখর নবীন। নির্মলানন্দ আসেন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, শশাঙ্কশেখর আসেন ১৯৩১খৃষ্টাব্দে। বয়সে নির্মলানন্দ হলেন দেড় বৎসরের কনিষ্ঠ। নির্মলানন্দের বিষয়বুদ্ধি অতীব প্রখর ছিল। মূল প্রতিষ্ঠাতা গুরু নিগমানন্দ সরস্বতী ১৯৩৫খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। অতঃপর আত্মানন্দজী চলে যান কোকিলামুখে, মঠাধ্যক্ষ পদে। নির্মলানন্দ হন ময়নামতী মঠের অধ্যক্ষ।

ময়নামতী আশ্রমের শেষের দিকের ইতিহাস অত্যন্ত লোহহর্ষক, মর্মান্তিক, করুণ, ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেখানে সামরিক ঘাটি হয়েছিল। তাই বৃটিশ সৈন্যের

আনাগোণা হত আশ্রমে। আশ্রমকে অন্যত্র চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু কোন মতে আশ্রম টিকে রইল। পাকিস্থান আমলে এই আশ্রমকে মোটেই সুনজরে দেখত না, ফলে নির্মম অত্যাচার হল। অত্যাচারের প্রবলতা এত অধিক হল, যে আশ্রম ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন স্বামীজিরা।

গণেশপুর আশ্রম (১৯৫২-১৯৬৩ খৃঃ)

কুমিল্লার প্রখ্যাত সমাজসেবী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, কামিনী কুমার দত্ত, প্রতুল দাস প্রমুখ শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যস্থতায় সাধুরা সম্মত হলেন অন্যত্র সরে যেতে। ময়নামতী থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তরে, গণেশপুর নামক গ্রামে আশ্রম স্থানান্তরিত হল বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ বাংলাতে, অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে। স্থানান্তরের সময় অনেক মালপত্র, থালাবাসন চুরি হল। সেখানেও অত্যাচার অব্যাহত রইল। সব ছেড়ে, ভারতে চলে যাক্, এটাই ছিল ক্ষমতাবানদের মনের কথা। সাধুদিগকে মারধর করত, বুটজুতা দিয়ে পদদলিত করত, শাঁশডলা দিত, তপ্ত লৌহ শলাকা গায়ে লাগাত, দেহে সূঁচ ঢুকিয়ে দিত। অবশেষে ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। ত্রিপুরার অন্তর্গত বিশালগড় জনপদে, ধ্বজনগর ও বাদ্যার দীঘি নামক গ্রামে জনৈক মুসলমান কৃষকের সাথে ভূমি বিনিময় করে চলে আসেন ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে। আসার পথে অবশিষ্ট সব মালপত্র লোপাট করল, আবার টাকা নিল।

বিশালগড় - ধ্বজনগর আশ্রম (১৯৬৪ -)

বর্বরতার মাত্রা এত তুঙ্গে উঠেছিল যে, শেষটায় দেশত্যাগী, আশ্রমত্যাগী হতে বাধ্য হলেন। ১৩৭১ বাংলার ২৯শে জৈষ্ঠ্য অর্থাৎ জুন ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে সকালবেলা গণেশপুর ছেড়ে দেন এবং ঐদিন সন্ধ্যায় বিশালগড়ে এসে পৌঁছেন। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণ এবং ১৯৬৪ সালে কাশ্মীর থেকে ষড়যন্ত্র সমগ্র ভারতে ও পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে গেল। অগণিত হিন্দু নর-নারী লাঞ্ছিত হল। সেই ষড়যন্ত্রের অন্যতম শিকার হয়ে স্বামীজিরা বিশালগড়ে এলেন। প্রায় বিশ কানি ভূমি নিয়ে গঠিত এই আশ্রম বর্তমানে ধন-ধান্যে পুষ্পেভরা।

আশ্রমিক জীবন

সেই যে গৃহত্যাগ করলেন ১৩৩৭ বাংলার মাঘ মাসে, সেই থেকে দীর্ঘ ৭০ বৎসর যাবৎ (১৯৩১-২০০১ খৃ) অনেক ঘটনা ঘটে গেল। প্রতিষ্ঠাতা গুরু স্বামী নিগমানন্দ দেহত্যাগ করেন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে, নিজের পিতা অমূল্যনাথ চক্রবর্তী মারা যান ১৯৪০

খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হল, ভারত বিভাজন হল, দাঙ্গা হল, আশ্রম স্থানান্তর হল, ভক্ত সম্মেলন হল, কত গুরুভ্রাতা মারা গেলেন ! তাঁর প্রখর স্মৃতিপটে অধিকাংশ ঘটনার দিনক্ষণ অক্ষুণ্ণ আছে।

নির্মলানন্দ সরস্বতী ও নির্বিকারানন্দ সরস্বতী কর্তৃক লিখিত ''ময়নামতী আশ্রমের ইতিবৃত্ত'' পূর্ব বাংলা সারস্বত আশ্রম, ধ্বজ নগর, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৪, মূল্য ৮, একটি আকর গ্রন্থ। ইহাতে পাক সেনা কর্তৃক নিষ্ঠুর অত্যাচারের নিখুঁত বর্ণনা আছে। এছাড়া কাজ কর্মের, দায়িত্বের বর্ণনা রয়েছে। নবাগত আদর্শনিষ্ঠ যুবক শশাঙ্ক শেখর কি কি কাজ করতেন, তার বিবরণ শশাঙ্ক শেখরের জবানীতেই দেওয়া যাক্, ''আশ্রমিক জীবন কেবল রান্না করা ও পূজার কাজ নয়, আশ্রমের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কাজও আমাকে করিতে হইত। আশ্রমে আম, জাম, পেয়ারা, লিচু, কাঁঠাল, বহেড়া ইত্যাদি নানাবিধ গাছে পূর্ণ থাকায়, ঝাড়ু দিয়া সেই সব গাছতলা আমাকে পরিস্কার রাখিতে হইত। ঘর লেপা, পূজার বাসন, রান্নার বাসন, ডেক কড়াই ইত্যাদি মাজার কাজ আমারই। .... দৈনন্দিন রান্নার ও উৎসবের প্রয়োজনীয় লাকড়ী সবই আমাকে সংগ্রহ করিতে হইত। .... সমস্ত দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও কাজ শেষ হইত না। রাত্রি দেড়টা দুইটার সময় যখন সুরমা মেইল (আসাম মেইল) কুমিল্লা অতিক্রম করিতেছে শব্দ পাওয়া যাইত, যখন সমগ্র চরাচর নিদ্রামগ্ন, তখন আমি একাকী পুকুরপাড়ে রান্নার বাসন মাজিতাম। .... কর্মের উন্মাদনায় শরীরের ভালমন্দ জ্ঞান থাকিত না। শরীর প্রায়ই অসুস্থ থাকিত। অম্লপিত্তের বেদনা, হাঁপানি, বাত প্রভৃতি ব্যারামের এই সময় হইতেই সূচনা। ১০৪ ডিগ্রী জ্বর লইয়াও কাজ করিতে হইত। অসুখ হইয়াছে জানিতে পারিলে তীব্রভাবে তিরস্কৃত হইতাম।'' ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ''পরিশেষে ২৬শে পৌষ রাত্রি অনুমান দেড়টার সময় ১২/১৪ জন সৈন্য দ্বারা আমাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করান হয়। আমাকে সূচ অথবা ঐ জাতীয় লৌহ শলাকা দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিতে থাকে। আর নির্মলদাদাকে আমার সম্মুখে নির্মমভাবে প্রহার করিতে থাকে।'' এই ধরণের অত্যাচার কয়েক বৎসর চলতে থাকে । তাই বাধ্য হয়েই ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাতে চলে আসেন। ভারতে আসার পর বিভীষিকাগ্রস্থ ঘটনার অবসান ঘটল।

দীক্ষা

যুবক শশাঙ্কশেখর বেশীদিন পান নি স্বামী নিগমানন্দকে। শশাঙ্কশেখর ময়নামতীতে আসেন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে, নিগমানন্দ সরস্বতী দেহরক্ষা করেন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। স্বামী নিগমানন্দ এই পাঁচ বৎসর একটানা ময়নামতীতে অতিবাহিত করেন নি। মাঝে-মাঝে আসতেন মাত্র। ১৯৪০ বাংলার অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ১৯৩৩ খৃঃ স্বামী নিগমানন্দ কর্তৃক

ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন শশাঙ্কশেখর। একই দিন দীক্ষিত হন শ্রীহট্টের যুবক নবদ্বীপ চন্দ্র, যিনি নির্মলানন্দ নামে খ্যাত হন।

ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হবার ১২ বৎসর পর সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। ইহা ১৩৫২ বাংলার অর্থাৎ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দেন আত্মানন্দজী। সেদিন একসাথে মোট ছয়জন দীক্ষিত হন। দীক্ষান্তে নতুন নামকরণ হল। শশাঙ্কশেখর হলেন নির্বিকারানন্দ সরস্বতী।

দীক্ষাগুরু পদে বৃত

গুরুগিরি করার মানসে নয়, নেহাৎ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করতেই তিনি দীক্ষাদানে ব্রতী হন। নির্মলানন্দজীর নির্দেশে এবং আত্মানন্দজীর অনুমতিক্রমে প্রথম দীক্ষা দেন ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে। অর্থাৎ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ময়নামতীতে থাকাকালীন সময়ে।

উপদেশামৃত

আগরতলার ধলেশ্বর নামক গ্রাম-নিবাসিনী সমাজসেবিকা শ্রীমতী বাসনা দেবনাথ একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম "নিগম চেতনায় স্বামী নির্ব্বিকারানন্দ সরস্বতী"; পৃষ্ঠা ১১০, মূল্য ২৫ টাকা। এই বইটির শেষাংশে (৮৮-১১০ পৃষ্ঠাতে) নির্ব্বিকারানন্দের উপদেশামৃত সংকলিত হয়েছে। এই সংকলনের দ্বারা শ্রীমতী বাসনা দেবনাথ করলেন ঋষিঋণ শোধ।

স্বামী নির্বিকারানন্দ সরস্বতী হলেন মেধাবী ছাত্র, আদর্শবান যুবক, নিরলস কর্মী, নিষ্ঠাবান শিষ্য, নির্ভরযোগ্য সহকর্মী, নিষ্কলঙ্ক সন্ন্যাসী এবং ত্যাগব্রতী গুরু। এমন মহানুভব ব্যক্তি একটি আশ্রমের দৈবী সম্পদ স্বরূপ। তাঁর কর্মক্ষেত্র ও চিন্তাক্ষেত্র সীমিত, কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে কোন ফাঁকিঝুকি নেই।

বয়সের ভাবে ভারাক্রান্ত স্বামী নির্ব্বিকারানন্দজী মহারাজ প্রাকৃতিক নিয়মেই অন্তিমকালে অসুস্থ হয়ে গেছেন। তাঁর এই দুর্সময়ে পরম ভক্তিভরে সেবাযত্ন করেছেন আগরতলা-নিবাসী ডাঃ নলিনীকান্ত দেবনাথ, শ্রী হীরালাল দেবনাথ, শ্রীমতী বাসনা দেবনাথ এবং আরো কতিপয় ভক্তবৃন্দ। ধ্বজনগরস্থিত আশ্রমে সর্বক্ষণের জন্য সেবক-সন্ন্যাসী রূপে পরে আসেন শ্রীমদ্ পদ্মপাদ চৈতন্য ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমদ্ আরণ্যক চৈতন্য ব্রহ্মচারী। আশ্রমে এই দুই ব্রহ্মচারীর শুভাগমনের পর, তাঁরাই এখন অতি বৃদ্ধ স্বামীজীর সেবা-যত্ন করছেন। ❑

মনমোহন রুদ্রপাল

পূর্ব্বঙ্গের ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত রাজদিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মনমোহন রুদ্রপাল। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত স্বল্পজ্ঞাত।

অক্ষয়কুমার রুদ্রপাল - এর চার পুত্র এবং এক কন্যা। দ্বিতীয় পুত্রের নাম মনমোহন। মনমোহন ছিলেন বিবাহিত ও নিঃসন্তান। রুদ্রপাল বংশের কৌলিক বৃত্তি হল নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্মাণ করা। মনমোহনের বাল্য, কৈশোর, যৌবন, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তিনি কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ভারত বিভাজনের (১৯৪৭ খৃঃ) অব্যবহিত পূর্বে পূর্বেবঙ্গে ঢাকাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল। তখনই মনমোহন ত্রিপুরাতে আশ্রয় নেন।

আগরতলা নগরের দক্ষিণে পশ্চিমে অবস্থিত জনপদ অরুন্ধুতিনগর নামে খ্যাত। মহারাজ বীর বিক্রমের মাতৃদেবীর নাম অনুসারে ইহার নামকরণ করা হয়। এই বিশাল জনপদের মধ্যে আছে লববাবুর আশ্রম, দাদা মহারাজের আশ্রম। দাদা মহারাজের আশ্রমের নিকটেই, পশ্চিম প্রান্তে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করে মনমোহন সস্ত্রীক বসবাস করতেন। সমগ্র অরুন্ধুতিনগর হল নীচু টিলাভূমি। অতীতে গভীর জঙ্গল ছিল, হাতীর গতিপথ ছিল, মহারাজ বীর বিক্রম (১৯২৩-১৯৪৭ খৃঃ) এই বনে গবয় শিকার করেছিলেন। মূর্ত্তি নির্মাণের জন্য মাটি কাটবার সময় মনমোহন আকস্মিকভাবে গুপ্তধন পেলেন। ঝাঁসির রাণীর নামাঙ্কিত মোহর ছিল কলসীভর্ত্তি। কিন্তু সেই ধন তাঁর ভাগ্যে জুটল না, চোরের হস্তগত হল।

মনমোহনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজের স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করতেন। হাতে-পায়ে ঘুঙ্গুর পরিধান করতেন। তাই লোকমুখে তিনি ঝুনঝুনি সাধু নামে পরিচিত ছিলেন। নানা রঙের কাপড়ের টুকরা সিলাই করে এক বিচিত্র জামা পরিধান করতেন। কারো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পথ দিয়া হাঁটতেন না। কখনো গাড়ীঘোড়ায় চড়তেন না। পদব্রজে যাতায়াত করতেন। শাকাহারী ছিলেন। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে একটি বিশেষ ব্রত পালন করতেন। সারা দিন, উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত, হরি বোল, হরি বোল, বলে মন্ত্র জপ করতেন। সারাটা দিন উপবাস করে এই নাম জপ করতেন। সন্ধ্যায় নিরামিষ ভোজন করতেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী যেমন এক বিশেষ আসনে বসতেন, মনমোহন সেইরূপ একটি আসনে বসে উক্ত নাম জপ করতেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। তাঁর গুরুদেবের নাম ছিল মঙ্গল গোস্বামী। সারা পৌষমাস এভাবে একাহারী হয়ে নামজপ করে, ১লা

মাঘ পূর্বাহ্নে দাদা মহারাজের আশ্রমে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করতেন।

তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। বেলা ১২ টা নাগাদ দাদা মহারাজকে ডেকে পাঠান। দাদা মহারাজ তখন দেহে তৈল মেখে স্নানে যাবেন। দাদা মহারাজ তৎক্ষণাৎ আসেন। মনমোহন বললেন গীতা গ্রন্থ আনতে। দাদা মহারাজ বললেন- স্নান ছাড়া কিভাবে আনা ! মনমোহন মন্তব্য করলেন গঙ্গাজল অশুচি হয় না। ইহা দাদা মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী। দাদা মহারাজ তাড়াতাড়ি আশ্রম হতে গীতা এনে পাঠ করতে থাকেন। ভক্তি যোগ হতে পাঠ করতেছেন দাদা মহারাজ। দাদা মহারাজের দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে, তাঁহার কোলে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

মনমোহনের আনুমানিক আয়ুষ্কাল হল ১৯০১ হতে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ। এমন নির্লোভ, নিরহঙ্কারী ভক্তিমান লোক বিরল। ❑

অনন্তলাল বণিক

প্রাক্তন ত্রিপুরা জেলার অর্থাৎ কুমিল্লা জেলার চান্দপুর মহকুমায় মতলব থানায়, বোয়ালিয়া গ্রামে দীনবন্ধু বণিক ও বসন্তবালা বণিকের পুত্র অনন্তলাল বণিক জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৭ শকাব্দে, অর্থাৎ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বা ১৩১২ বঙ্গাব্দে।

দীনবন্ধু ছিলেন গন্ধ বণিক, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং পাঁচ পুত্র ও এক কন্যার পিতা। পুত্র কন্যাদের নাম হল যথাক্রমে অনন্তলাল, শান্তলাল, মুরারীমোহন, জীবনকৃষ্ণ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ এবং সাধনা। পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এই পরিবার খুব ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে দেশত্যাগী হল। আগরতলাতে বসতি করেন অনন্তলাল, শান্তলাল ও জীবনকৃষ্ণ; করিমগঞ্জে বসতি করেন মুরারীমোহন শিলচরে বসতি করেন নৃপেন্দ্রনারায়ণ। এই ভাবে পরিবারটি ছত্রভঙ্গ হলেও, পারিবারিক আন্তরিকতা অটুট আছে।

অনন্তলালের শৈশব, কৈশোর, বাল্য ও যৌবন (১৯০৫-১৯৪৭ খৃঃ) অতিবাহিত হয়েছে জন্মভূমিতে। তিনি যে- বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সে-বৎসরেই হল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত। সেই আন্দোলন বিলাতী বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ, অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো প্রভৃতি আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজির নেতৃত্বে, উত্তরোত্তর ব্যাপ্ত হয়ে আমজনতাকে স্পর্শ করল। অনন্তলালের পঠদ্দশায় এসব আন্দোলন চান্দপুরে প্রবল হয়ে উঠল। গ্রামের পাঠশালায় এসব আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। গ্রামের পাঠশালাতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে, বালক অনন্তলাল স্বদেশ হিতব্রতে মনোযোগী হলেন।

কুমিল্লাতে স্বদেশী আন্দোলনকে জোরদার করেছিল অভয় আশ্রম নামক একটি প্রতিষ্ঠান। ইহা ১৩২৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল চন্দ্র পালিত, মুনীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ সমাজসেবীরা। সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই অভয় আশ্রম পরিদর্শন করেছেন। বৃটীশ সরকার তিনবার (১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৪২ সালে) অভয় আশ্রমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। অহিংসা, সততা, সত্যনিষ্ঠা, স্বরাজলাভ,স্বদেশীব্যবহার - প্রভৃতি ছিল আশ্রমবাসীর মূলনীতি। আশ্রমবাসীদের পিতৃতুল্য ছিলেন দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৫৮-১৯৪৪ খৃঃ)। ত্যাগব্রতী আশ্রমবাসীদের অক্লান্তশ্রমে গ্রামে-গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ছাত্রাবাস, ব্যায়ামশালা, আশ্রম, চরখাসংঘ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি প্রশিক্ষণশালা শুরু হল।

অভয় আশ্রমের বিশাল কর্মযজ্ঞে অনন্তলাল আত্মাহুতি দিলেন। তবে সম্যকরূপে অভয় আশ্রমে আশ্রমবাসী হলেন না। আশ্রমে যাতায়াত করতেন, কাজে অংশ নিতেন। এসব চলছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। সেই সময় জাতীয়তাবাদী সমাজসেবকদের অনেকেই শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বিবেকানন্দের রচনাবলী, বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্র-রচনাবলী পাঠ করত। অনন্তলাল ঐ ধারা অনুসরণ করে রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দের প্রতি অনুরক্ত হন। আজীবন ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করে দেশমাতৃকার সেবা করার সংকল্প মনে-মনে গ্রহণ করেন। নিজের গ্রামে কিছু একটা গড়ার পরিকল্পনা তখন মাথায় চাপে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আশে-পাশে কোন সময়ে পূর্ণ যুবক অনন্তলাল গড়লেন এক সেবাপ্রকল্প। বোয়ালিয়া গ্রামে গড়ে তুললেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম, বিবেকান্দ ছাত্রাবাস, দীনবন্ধু দাতব্য চিকিৎসালয়। তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাবিদ্যা ভালরূপেই আয়ত্ব করেছিলেন। এক বড় চত্ত্বরের মধ্যে এইসব সেবাপ্রকল্প গড়ে নিলেন। এসব কাজে পরম বান্ধব ছিলেন জ্যোতিষ চন্দ্র ধর নামক এক যুবক। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল রাম-লক্ষ্মণ সদৃশ্য। জ্যোতিষ ছিলেন মহানুভব, নীরবকর্মী। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সর্বানন্দ মহারাজ কৃপা করে অনন্তলালকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

দেশের বহু গণ্যমান্য লোক এই রামকৃষ্ণ আশ্রমে এসেছিলেন, আবাসিকদিগকে উপদেশ দিতেন, গ্রামবাসীকে সচেতন করতেন, অনন্তলাল ও জ্যোতিষচন্দ্রকে অনুপ্রেরণা দিতেন। চারণকবি মুকুন্দদাস (১৮৭৮-১৯৩৪ খৃঃ) কয়েকবার এই আশ্রমে বসে দেশাত্মবোধক গান গেয়েছেন। তিনি যখন বিলাতী রেশমীচুড়ি ছেড়ে দেবার জন্য বঙ্গললনার নিকট উদাত্তকণ্ঠে গান গেয়ে আবেদন জানাতেন, তখন বাংলার মহিলারা রেশমীচুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিত। স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবকরা ঐ আশ্রমে এসে আশ্রয় নিত। আবাসিক ছাত্ররা চরখায় সূতা কাটত। অনন্তলাল বাড়ী-বাড়ী গিয়ে রোগীকে ওষধ দিতেন, বিনিময়ে টাকা নিতেন না। জ্যোতিষচন্দ্র সামলাতেন আশ্রমের অভ্যন্তরের যাবতীয় কাজকর্ম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধএসে গেল। তন্মধ্যেই এসে গেল ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২ খৃঃ)। বৃটিশের গোয়েন্দা বিভাগ অনন্তলালের কাজকর্মের রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করে নিল এবং গ্রেপ্তার করে প্রথমে কুমিল্লা কারাগারে এবং পরে কলিকাতাতে কারাগারে বন্ধী করে ফেল্‌ল।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে বৃটিশ কূটনীতিক প্রশাসকরা এদেশের মুসলমানদিগকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছে। কারামুক্ত হয়ে বাড়ি গিয়ে দেখেন আশ্রমের ঘরবাড়ী তছনছ করে দিয়েছে বিধর্মীরা। ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালীতে ভয়াবহ হিন্দু নিধন দাঙ্গা হল। নভেম্বরে গান্ধীজি এলেন নোয়াখালীতে। অনন্তলাল

নোয়াখালীতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীকে প্রণাম করে আসেন। চান্দপুরে খুচরা হারে গৃহদাহ, লুঠ, নারীহরণ চলছিল। প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ভাঙ্গা হাটে আশা-ভরসা সঞ্চার করতে না পেরে, ত্রিপুরায় চলে আসেন অনন্তলাল ও জ্যোতিষচন্দ্র ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে।

পূর্ববঙ্গে, বিশেষতঃ চাকলারোশনাবাদে দাঙ্গাপীড়িত হয়ে হিন্দুরা ত্রিপুরাতে, অসমে, পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে থাকে। ত্রিপুরাতে আগত উদ্বাস্তুদিগকে সেবা করার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সমীক্ষক প্রেরণ করেন ১৯৪৭ সালের জানুয়ারীতে। তাতে ছিলেন স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ মহারাজ ও স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ মহারাজ। বড়মাতা মহারাণী প্রভাবতী দেবীর বদান্যতায় স্বামীজীরা শিববাড়ীতে ধর্মশালাতে থাকা-খাওয়ার সুবিধা পান। তখন জিতেন্দ্র পাল (১৯১৪ খৃঃ-) প্রমুখ ভক্তরা আগ্রহ প্রকাশ করেন আগরতলাতে রামকৃষ্ণ মঠমিশনের শাখা স্থাপনের জন্য। স্বামী দয়ালানন্দ (১৮৯৯-১৯৭০ খৃঃ) আগরতলার পূর্ব প্রান্তে ১৩৪৩ বাংলার ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে (১৯৩৭ খৃঃ) স্থাপন করেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনা কুটির। এই সাধনা কুটির যথেষ্ঠ জনপ্রিয়, কর্মচঞ্চল, সেবাপরায়ণ ছিল তখন, কিন্তু নামকরণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এক নয়। ইহা বেলুড় মঠের অঙ্গীভূত নয়। জিতেন পাল প্রমুখ ভক্তদের প্রস্তাবের উত্তরে স্বামীজী বললেন যে, বোয়ালিয়া থেকে অনন্তলাল আসবেন নিকট ভবিষ্যতে। অনন্তলাল এলে মঠ -মিশন স্থাপনের কাজ সহজ হবে।

অনন্তলাল আসার আগেই দাঙ্গাপীড়িত বহু ভক্ত আগরতলাতে আশ্রয় নিয়েছেন। তদুপরি, স্বামী অসীমানন্দ, স্বামী গহনানন্দ, স্বামী সাহানন্দ মহারাজ পূর্বাশ্রমে চাকলা রোশনাবাদের লোক ছিলেন। সুতরাং ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। অনন্তলাল ও জ্যোতিষচন্দ ১৯৪৮ সালে এসে ভক্তদের সাথে যোগাযোগ করেন, আশ্রম গড়ার পরিকল্পনা সামনে রাখেন। কিন্তু তখন ত্রিপুরাতেও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিল। তাই প্রায় দুই বৎসর পর, প্রথম কার্যকরী সমিতি গঠিত হল এবং একটি অস্থায়ী কাঁচা ঘরে আশ্রমের কার্যালয় করা হল। বনমালীপুর নিবাসী সম্ভ্রান্ত ঠাকুর ভগবানচন্দ্র দেববর্মনের পুকুরে পশ্চিম কিনারাতে ঐ কার্যালয় নির্মাণ করা হল। শুভ দিনটি ছিল ১৫. ২. ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ (মে ১৯৫০ খৃঃ)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ মহারাজ। ভারপ্রাপ্ত কার্যকর্তা ছিলেন অনন্তলাল বণিক, শচীন্দ্র বণিক, জ্যোতিষচন্দ্র ধর, জিতেন পাল প্রমুখরা।

বিগত ৫. ১০. ১৯৫১ দিনাঙ্কে ভি. নানঝাপ্পা ত্রিপুরার মুখ্য প্রশাসক পদে যোগদান করেন। তিনি সদয় হওয়াতে , আগরতলার দক্ষিণ প্রান্তে গাঙাইল নামক স্থানে কয়েক গণ্ডা জমি পাওয়া গেল। কাজেই বনমালীপুর থেকে মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই নিজস্ব ভূমিতে আশ্রম স্থানান্তরিত হল। নব নির্মিত কার্যালয়ে বসে ৪. ১১. ১৯৫১ দিনাঙ্কে

গঠিত কার্যকরী সমিতিতে ছিলেন —

সভাপতি ঃ স্বামী মহানন্দ মহারাজ

সহ-সভাপতি ঃ নিবারণচন্দ্র ঘোষ, চিন্তাহরণ মজুমদার

সম্পাদক ঃ অনন্তলাল বণিক

সহ-সম্পাদক ঃ ক্ষীরোদমোহন লোধ

কোষাধ্যক্ষ ঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

সভ্যবৃন্দ ঃ কান্তিরঞ্জন ঘোষ রায়, কালীপ্রসন্ন দত্ত, জ্যোতিষচন্দ্র ধর, জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল, নীলরতন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, সুকুমার গুহ প্রমুখ।

ত্রিপুরাতে এসে একটানা পনের বৎসর (১৯৪৮-১৯৬৩ খৃঃ) অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন অনন্তলাল ও জ্যোতিষচন্দ্র। ফলে আশ্রমের কাজকর্ম ক্রমবর্দ্ধমান হল। একেবারে শুরু থেকেই চিকিৎসালয় খোলা হল। রোগীদের বাড়ীতে গিয়েও ঔষধ দিয়ে আসতেন। ১৯৫৪ সালে ছাত্রাবাস খোলা হল। বিগত ২. ২. ১৯৫৬ দিনাঙ্কে খোলা হল বিদ্যালয়। প্রাপ্ত গাঙেয় নিম্নভূমিকে ভরাট করা হল, আশে-পাশের ভূমি ক্রয় করে এবং দান পেয়ে বড় করা হল। ১৯৬২ সালে প্রস্তুতি চলল বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিকী উৎযাপনের। সমিতি গঠন করা হল। মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুশান্ত কুমার চৌধুরী হলেন উৎযাপন সমিতির সভাপতি। তৎকালীন মুখ্যপ্রশাসক শান্তিপ্রিয় মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করতে সম্মত হলেন। ১৯৬৩ সনের জানুয়ারীতে মহাসমারোহে উৎসব পালিত হল।

অতঃপর একটু বিশ্রাম ও পরিবর্তন আবশ্যক মনে করে অনন্তলাল গেলেন কলিকাতায় এবং উত্তর ভারতের তীর্থে। তীর্থ থেকে ফিরে এসে, আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন দেখে তিনি ব্যথিত হলেন। তাঁর মতামত না নিয়েই তাঁর শোবার ঘর পাল্টে দিল। কার্যকরী সমিতির কারো আচরণে ব্যথিত অনন্তলাল খেদোক্তি করলেন, 'আমি বাঁধা গরু নই, আমি ধর্মের নামে ছাড়া ষাঁড়'। এই বলে পুরাণো সাইকেল, চরকা, পেটিকা এবং ছবিপ্রদর্শনী যন্ত্র নিয়ে চলে আসেন অনুজ শান্তলালের (১৯০৯-১৯৯৭) গৃহে। সাথে এলেন জ্যোতিষচন্দ্র।

বিচক্ষণ শান্তলাল বোয়ালিয়াতে অবস্থিত পৈত্রিকসম্পত্তি বিনামূল্যে না দিয়ে অন্ততঃ জলের দরে বিক্রয় করেই প্রাপ্ত অর্থ এখানে এনে ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। অনন্তলালের জন্য রামনগরে একটুখানি ভূমি ক্রয় করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৩ থেকে

১৯৬৭ সালের মধ্যে অনন্তলাল বসে ছিলেন না। রোগীর সেবা, ছবিতে বিবেকানন্দের জীবনী প্রদর্শন, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সাহিত্য বিলি বন্টন, ঘরোয়া সৎসঙ্গ, গীতা পাঠ প্রভৃতি করে গেছেন। ১৯৬৪ সালে জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুতে যে-শোক সভা হল, তাতে তিনি গীতা পাঠ করেছেন। পাশাপাশি চিন্তা করতে থাকেন, বিকল্প কিছু করার। জয়নগরে প্যারীমোহন ভট্টাচার্য (১৮৭৬-১৯৪৮ খৃঃ) বিশাল বাগানবাড়ী করেছিলেন। কালক্রমে ঐ বিশাল ভূখণ্ড টুকরা-টুকরা করে বিক্রয় করা হল। প্যারীবাবুর পুত্রবধু শোভা ভট্টাচার্য থেকে দুই কানি সাড়ে চার গণ্ডা সাত ধূর ভূমি মাত্র ত্রিশ হাজার টাকায় কেনার কথাবার্তা হল। টাকা এল রামনগরের ভূমি বিক্রয় করে, ভক্তদের দান থেকে এবং অনুজদের সহায়ক ধনরাশি থেকে। বিগত ৮.৬. ১৯৬৭ দিনাঙ্কে সরকারী নিবন্ধীকরণ মাধ্যমে বেচা কেনা হল। আশ্রমের নামকরণ হল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী মঠ।

নব নির্মিত মঠের অনুন্নত ভূমি সমান করতে, ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় গড়তে, দেবালয় নির্মাণ করতে, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এই কঠোর পরিশ্রমের পরিণাম হল বেদনাদায়ক। ১৯৬৯ সালে হঠাৎ তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলেন, তাঁর বাক্শক্তি রুদ্ধ হল। তিনি হলেন শয্যাশায়ী। রুগ্ন অবস্থায় প্রায় আঠার বৎসর (১৯৬৯-১৯৮৬ খৃঃ) জীবিত থাকেন, আকারে ইঙ্গিতে আশ্রমের কাজে নির্দেশ দিতেন, আশ্রমের জন্য অছি পরিষদ গঠন করে যান, অর্থের সংস্থান করে যান। সুখময় সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী (১৯৭২-১৯৭৭ খৃঃ) হয়েই অনন্তলালকে স্বাধীনতা সংগ্রামীর দুর্লভ সম্মান তাম্রপত্র দেন এবং বার্ধক্য ভাতা দেন।

অনন্তলাল আগরতলায় আসার পর, শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ভরকেন্দ্রের স্থানান্তর হল। আগে ছিল আশ্রম চৌমুহানী, পরে হল গাঙাইল, আগে হোতা ছিলেন স্বামী দয়ালানন্দ, পরে হোতা হলেন অনন্তলাল। এই আন্দোলন একদিনের নয়, একজনের নয়। এই আন্দোলনে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ছিলেন, তাঁদের কয়েক জনের নাম হল — অনন্তলাল বণিক, জ্যোতিষচন্দ্র ধর, স্বামী জগদানন্দ অর্থাৎ গিরি মহারাজ, জিতেন পাল, ক্ষীরোদ মোহন লোধ (১৯১০-১৯৬৯) চিন্তাহরণ মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী (১৯১৮-১৯৯৮), সুধীরবিকাশ লস্কর, হীরেন্দ্রনাথ নন্দী, উপেন্দ্র কাব্যতীর্থ, দীনেশচন্দ্র দত্ত, যোগেশচন্দ্র দত্ত, কান্তিরঞ্জন ঘোষরায়, অমলেশ ঘোষ, হেমচন্দ্র নাথ, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, দ্বিজেন্দ্রবিজয় রায়, স্বর্ণকমল রায়, সুশান্তকুমার চৌধুরী, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন সেন, সুকুমার গুহ, প্যারীমোহন ভৌমিক, দ্বিজেন দে, কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য, কুলেশপ্রসাদ চক্রবর্তী, প্রীতিলেখা চক্রবর্তী, সুখময় সেনগুপ্ত, অনিল রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রলাল বণিক, মুরারীমোহন

বণিক, ইন্দ্রলাল বণিক, শান্তলাল বণিক, নরেশ বণিক, ধীরেন্দ্র বণিক, গোপীনাথ সাহা, মানিক সাহা, পরেশ চক্রবর্তী প্রমুখ।

কয়েকটি বিশেষ পোষাক ছিল অনন্তলালের পরিচয়-জ্ঞাপক। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, খদ্দরের ফতুয়া, মাথায় গান্ধীটুপি, চোখে চশমা, বগলে ঔষধের থলি, পুরাণো ভাঙ্গা সাইকেল — এই ছিল তাঁর পরিধেয় ও বাহন। তিনি হাতুড়ে চিকিৎসক ছিলেন না। চিকিৎসাতে হাত-যশ ছিল। আশ্রমে যে-কেউ যখনই আসত, ঔষধ চাইলেই দিতেন। বাড়ীতে-বাড়ীতে গিয়ে রোগীর সেবাযত্ন করতেন। কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। রোগী দেখতে- দেখতে খুব বেলা হয়ে গেলে, ক্ষুধা লাগলে, কারো বাড়ীতে চেয়ে ভাত খেয়ে নেওয়ার নিঃসংকোচ ঔদার্য তাঁর ছিল। মুখ্য বনসংরক্ষক শ্রী রাজেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তীর মাতা প্রীতিলেখা চক্রবর্তীকে মা বলে ডাকতেন অনন্তলাল। প্রীতিলেখা (১৯১১-১৯৮১ খৃঃ) এই পুত্রকে প্রায়ই খেতে দিতেন, পোষাক দিতেন। শান্তলাল ও হাসীরাণীর পাঁচ কন্যা ও এক পুত্র। এদের নাম হল মঞ্জু, মাধুরী, নমিতা, প্রমিতা, শ্যামলকৃষ্ণ, চন্দনা। ১৯৬৪ সালে মাধুরী ডাক্তারী পড়ার সুযোগ পেলেন, কলিকাতাতে পড়তে যেতে হবে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে বাইরে পড়তে যাবে কিনা এনিয়ে পরিবারে দ্বিধা-সংকোচ দেখা দিল। অনন্তলাল সকলকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন এবং মাধুরীকে পাঠালেন বাইরে। মাধুরী পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন বিলাতে চিকিৎসা করে।

অনন্তলাল অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চরিত্র গঠন, সমাজসেবা এবং স্বাবলম্বন — এই কয়টি বিষয়ের উপর। তিনি ছিলেন অনলস পরিশ্রমী, শৃঙ্খলাপরায়ণ, প্রচারবিমুখ, স্বাধীনচেতা, গান্ধীজির একনিষ্ঠ অনুসরণকারী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরমভক্ত। জ্যোতিষচন্দ্র ১৯৮২ তে, অনন্তলাল ১৯৮৬তে এবং স্বামী জগদানন্দ ১৯৯০ তে দেহত্যাগ করেন। তাঁদের প্রয়াণে সৃষ্ট শুন্যতা আজও (২০০২ খৃ) পূরণ হয় নি। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী মঠ যেন নিঃসঙ্গ, নিঃসাড়, ছাড়াবাড়ী। এই মঠে এলে একটি গভীর সমস্যার কথা মনে জাগে। কোন ভাল সঙ্ঘ, সমিতি, মঠ, মন্দির গড়ে তোলা যেমন কঠিন, ধরে রাখা ততোধিক কঠিন। "কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যা রবি"?

জ্যোতিষচন্দ্র ধরের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। অনন্তলাল যাহা কিছু করেছেন, সব কিছুতেই চিরসাথী ও চিরসহযোগী ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র। যাঁরা অনন্তলাল ও জ্যোতিষচন্দ্রকে দীর্ঘদিন দেখেছেন, এমন কয়েকজনের মতে জ্যোতিষচন্দ্র ছিলেন নীরবকর্মী, নিরভিমান, নিস্পৃহ।

অনন্তলালের আর এক সহচর ছিলেন স্বামী জগদানন্দ মহারাজ। তাঁকে লোকে

গিরি মহারাজ বলে সম্বোধন করত। তাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া গেল আশ্রম চৌমুহানীস্থিত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনা কুটির-এর বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ থেকে। অদ্বৈতানন্দ মহারাজকে লোকে বলে মণিমহারাজ। মণিমহারাজ গিরি মহারাজকে জানেন। গিরি মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল গৌরাঙ্গ বণিক। নিবাস ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া নগরের সামান্য উত্তরে মেড়্ডা নামক পাড়াতে। মেড়্ডাতে বিশাল কাল ভৈরব মূর্তি আছে। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ হিন্দুনিধন দাঙ্গা হয়েছিল, তখন গৌরাঙ্গ বণিক আগরতলায় এসে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনা কুটিরে আশ্রয় নেন। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার বাসনা তাঁর ছিল না। তিনি বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করে সাধনপথে অগ্রসর হন। কয়েক বৎসর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনা কুটিরে থাকার পর, অনন্তলাল বণিকের একান্ত অনুরোধে চলে আসেন জয়নগরে নির্মিত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-সারদাদেশ্বরী মঠে। বাকী জীবন এই মঠেই অতিবাহিত করে। তিনি ৩১. ১২. ১৯৯০ দিনাংকে দেহত্যাগ করেন। ❑

নিবারণচন্দ্র চৌধুরী

সমতল ত্রিপুরার দক্ষিণ - প্রান্তস্থিত নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত খণ্ডল পরগণাধীন বাঘমারা নামক গ্রামে নিবারণচন্দ্র চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা -মাতার নাম হল রামরাম চৌধুরী ও গয়েশ্বরী চৌধুরী। তাঁর জন্মতিথি হল ১লা বৈশাখ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, তাঁর মৃত্যুতিথি হল ১৬ই ফাল্গুন ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ। খৃষ্টাব্দের হিসাবে তাঁর আয়ুষ্কাল হল ১৯০৭-১৯৯২ খৃঃ।

রামরাম ও গয়েশ্বরী ছিলেন ধর্মপ্রাণ, সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ এবং ছয়জন পুত্র- কন্যার পিতা-মাতা। পুত্র কন্যাদের নাম হল শশিভূষণ, নিবারণচন্দ্র, যামিনীরঞ্জন, যোগেশচন্দ্র, জানকীবালা এবং রমনীসুন্দরী। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সৎভাব অটুট ছিল। বিশেষতঃ নিবারণ চন্দ্র ও যামিনীরঞ্জন ছিলেন রাম-লক্ষ্মণ তুল্য। রাম-লক্ষ্মণের নাম যেমন হাজার-হাজার বৎসর পরও এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা হয়, তেমনি নিবারণবাবু ও যামিনীবাবুর নাম একসাথে স্মরণ করে দক্ষিণ ত্রিপুরার লোকেরা। যোগেশবাবু ছিলেন সূর্যসেনের সক্রিয় শিষ্য। শশিবাবু ঘর-সংসার, বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। তিনি জোলাইবাড়ীতে উঠে আসেন।

শিক্ষা

নিবারণচন্দ্রের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছে খণ্ডলে। গ্রাম্যপাঠশালাতে কয়েক বৎসর পড়াশুনা করে, কয়েক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত বিলোনীয়া নগরে আসেন এবং ব্রজেন্দ্র কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই বিদ্যালয় সংক্ষেপে B .K .I. নামে পরিচিত এবং আনুমানিক ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। এই বিদ্যালয় পার্বত্য ত্রিপুরাতে অবস্থিত। এই বিদ্যালয় থেকেই নিবারণচন্দ্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে গৌরবান্বিত হন। তারপর যান বরিশালে ; বরিশালে ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয় তৎকালে নামজাদা শিক্ষালয়। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং পরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর কলিকাতা মহানগরে গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ভর্তি হয়ে ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়ে ঘরে ফিরেন গুরুর আদেশে। নিবারণচন্দ্রের ছাত্রজীবনে কোন ব্যর্থতা নেই, অপচয়-অপব্যয় নেই, আছে ধেয়নিষ্ঠা। তিনি দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন সারা খণ্ডলে স্নাতক বিদ্যার্থীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। তদুপরি, নিবারণচন্দ্র ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ, মেধাবী ছাত্র। তাই অতি শীঘ্র তাঁর

সুনাম ছড়িয়ে গেল।

সমাজ সেবা

(১) তখন স্বাদেশিকতার যুগ। বৃটীশের গোলামী না করার এবং স্বদেশ কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করার প্রবণতা প্রবল। নিবারণচন্দ্রের মনে সেই নেশাই প্রবল হল। স্বদেশী বিদ্যালয় গড়ার হিড়িক চারিদিকে ক্রিয়াশীল । টেটেশ্বর, চারিগ্রাম, বাঘমারা, কেতরাঙা, ঘনিয়ামারা, বৈরাগপুর, সাতকুইচ্চ্যা প্রভৃতি গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করে বৈঠক বসালেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, সম্পূর্ণ বেসরকারী ভাবে, গ্রামবাসীদের উদ্যোগে একটি উচ্চবিদ্যালয় গড়া হবে। খন্ডল উচ্চবিদ্যালয় নামে ইহা পরিচিত হবে। ধনাঢ্য গৃহস্থ ভগবানচন্দ্র বৈদ্য (১৮৯৫-১৯৮০ খৃঃ) প্রায় দশ কানি ভূমিদান করার শুভেচ্ছা প্রকাশ করলেন ঐ বৈঠকেই। ভগবান বৈদ্য তৎকালে সমাজ সেবক, সমাজ সংস্কারক, দানশীল ও বিচক্ষণ সমাজপতি হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর বাড়ীতেই বহিরাগত কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্র থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। কাঠের খুটি, বাঁশের বেড়া, ছনের ছানি, দিয়ে প্রথম কাজ শুরু হবে। একাজে অনেকেই কাঠ, বাঁশ, ছন, বেত দিলেন; অনেকেই স্বেচ্ছায় শ্রমদান করলেন। শুরু হল কর্মযজ্ঞ। ভগবানচন্দ্রের খুড়াত ভাই চন্দ্রনাথ বৈদ্য (১৯১১-১৯৮৬ খৃঃ) ব্রহ্মদেশে গিয়ে সরকারী চাকুরী করতেন হিসাবপরীক্ষা বিভাগে। তিনি নিজে, এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে, প্রবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ করে পাঠালেন। খন্ডল পরগনা ও দক্ষিণ শিক পরগনা নিবাসী কতিপয় স্বদেশপ্রেমী শিক্ষিত যুবক এগিয়ে এলেন শিক্ষকতা করার জন্য । এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম হল যামিনীরঞ্জন চৌধুরী, দ্বারকানাথ ভৌমিক, মনীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বানীশ চক্রবর্ত্তী, ত্রিবেণীকুমার চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রকুমার বল, শীতলচন্দ্র সোম, বসন্তকুমার দাশ, যোগেন্দ্রকুমার মজুমদার, ক্ষেত্রমোহন রায়, বীরেন্দ্র কুমার দাশ এবং দেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী। নিবারণবাবু প্রধানশিক্ষক রূপে অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত বিদ্যালয় পরিচালনা করলেন। ১৯৩৪খৃষ্টাব্দে স্থাপিত খন্ডল উচ্চ বিদ্যালয় নিবাচরণচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি।

(২) খন্ডল উচ্চ বিদ্যালয় - এর নিকটেই, পূর্ব্বপাশে ছিল খুব পুরাণো জীর্ণ কালীমন্দির ও কালীদীঘি । এই মন্দির ও দীঘির পুর্ব্ব পাশ দিয়ে উত্তরে -দক্ষিণে লম্বা লিক সাহেবের রাস্তা। সমসের গাজীর অত্যাচারে নিপীড়িত মহারাজ কৃষ্ণ মানিক্য (১৭৪৮-১৭৮৩ খৃঃ) যখন অতি কষ্টে রাজ্য উদ্ধার করলেন, তখন এই লিক সাহেবের কুনজর পড়েছিল ত্রিপুরার সমতল ভূভাগ চাকলা রোশনাবাদের উপর। জীর্ণ মন্দির সংস্কার করানো নিবারণ বাবুর আরেক কীর্তি ।

(৩) কালীদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দূরবর্ত্তী ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস গড়ে

দেওয়া হল। দূরবর্ত্তী শিক্ষকদের জন্য আবাসগৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হল। ছাত্র-শিক্ষক মিলে সেখানে ফলের, ফুলের ও সব্জীর বাগান করতেন, সন্ধ্যাবেলা উপাসনা করতেন,শাস্ত্রগন্থ পাঠ করতেন, রোজ ভোরে আসন-ব্যায়াম-প্রাতঃভ্রমণ ইত্যাদি করতেন। প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যাতে কতিপয় শিক্ষক আশে-পাশের গ্রামনিবাসী ছাত্রদের বাড়ীতে গিয়ে দেখতেন ছাত্ররা পড়াশুনা করছে কিনা। সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে আড্ডা দেওয়া ছাত্রদের পক্ষে ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। এসব কাজে নেতৃত্ত্ব দিতেন নিবারণবাবু। গরীব ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া হত।

(৪) খন্ডল উচ্চ বিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা একসাথে পড়ত। মুসলমান ছাত্ররা সাপ্তাহিক নামাজ পড়ত প্রতি শুক্রবারে পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটি মস্‌জিদে গিয়ে। তাই প্রায় এক ঘন্টা ছুটি থাকত। সেই একঘন্টা সময় যাতে অপচয় না হয়, তার জন্য হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম ও দশর্ন বিষয়ে, সমাজের প্রতি কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা হত। তদুপরি প্রতি বৎসর শ্রাবণমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করা হত। ইহার অনুকরণে জোলাইবাড়ী উচ্চবিদ্যালয়ে জন্মাষ্টমী পালন করা হয়।

(৫) নারী শিক্ষার জন্য নিবারণচন্দ্রের অবদান স্মরণীয়। খন্ডল উচ্চ বিদ্যালয় ছিল শুধুমাত্র ছাত্রদের জন্য। ছাত্রীদের জন্য নয়। তখনকার দিনে সহশিক্ষা অকল্পনীয় ছিল। অতএব বালিকাদের জন্য একটা কিছু করা দরকার। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা নিলেন এবং সফল করলেন সেই পরিকল্পনা।

(৬) বিভিন্ন পাড়াতে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন তাঁর অন্যতম নীর্তি। যাদের বাড়ীতে প্রশস্ত বৈঠকখানা আছে সেটি একাজে ব্যবহারের জন্য চাইলে ,লোকে দিত। তাতে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র করেন।

(৭) কিশোরদের জন্য বালোয়ারী- বিদ্যালয় স্থাপন তার আরেক কীর্তি। এখানেও বিনাব্যয়ে লোকের বৈঠকখানা ব্যবহার করতেন।

(৮) ভারতের বড়লাট লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪ খৃঃ) কর্তৃক ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রামে ও নগরে স্বায়ত্বশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হল। পরে মন্টেগু-চেলম্‌সফার্ড কর্তৃক প্রদত্ত সমীক্ষাতেও স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ করার সুপারিশ করা হল। ফলে ১৯৪৭ সালের বহু আগেই সমগ্র অবিভক্ত ভারতের নগরে মিউনিসিপাল বোর্ড, জিলাস্তরে জিলাবোর্ড এবং গ্রামস্তরে ইউনিয়ন বোর্ড গড়ে তোলা হল। খন্ডলে গ্রাম স্তরে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল; তার সভাপতি তথা গাঁওপ্রধান ছিলেন নিবারণ বাবু।

(৯) ১৭৭০- এর দশকে লিক সাহেবের উদ্যোগে নির্মিত দীর্ঘ রাস্তা ব্যতীত আর কোন রাস্তা নির্মাণের বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিনা জানা নাই। নিবারণবাবুর উৎসাহে গ্রামবাসীরা ছোট-খাট বহু রাস্তা নির্মাণের কাজে মেতে উঠল। গ্রাম্য দোপাইয়া পথকে বড় করা, সোজা করা, সাঁকো নির্মাণ করা, স্বেচ্ছায় ভূমিদান করা -ইত্যাদি চল্‌ল।

(১০) ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে চট্রগ্রামে ফিরিঙ্গিদের উৎপাত আরম্ভ হল। স্থানীয় মঘ সম্প্রদায় পরে ফিরিঙ্গিদের সামিল হল। তাই বহু হিন্দু উত্তরে অবস্থিত নোয়াখালীতে, খন্ডলে চলে এল। আমার পূর্ব্বপুরুষ মাধব ষোড়শ শতকে পটিয়াথানা থেকে বহু উত্তরে তারাকুচা গ্রামে আসেন। তখন সেই তারাকুচা গ্রামে একটি বাড়ীও ছিল না, চারিদিকে শুধু বন, তারাগাছ, মাঝে একটি খুব প্রাচীন এঁদো পুকুর দেখতে পেয়ে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হন। সেই স্থান তাঁর পছন্দ হল। এই রকম প্রাচীন এঁদো পুকুর খন্ডলে অনেক ছিল। খন্ডলে মাটির নীচে রক্ষিত সোনা ও টাকা আচমকা পেয়ে অনেকেই রাতারাতি ধনী হয়েছে। এই অঞ্চলে প্রাচীন জনবসতি ছিল। কবে, কিভাবে, কেন, সেসব বসতি নিশ্চিহ্ন হল তা আজও জানতে পারিনি। নিবারণবাবু বহু প্রাচীন এঁদো পুকুর সংস্কার করতে জনগণকে উৎসাহ দিয়েছেন। ফলে সেসব পুকুর নানারকম ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে।

(১১) খন্ডলে মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছিলেন নিবারণবাবু। ধনী-মানী লোকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ভূমি কিনে ফেলেছিলেন। ইহা তাঁর দূরদৃষ্টির অন্যতম পরিচয়। কিন্তু তখনও ভাবতে পারেন নি যে, খন্ডল হয়ে যাবে পাকিস্থানভুক্ত। তাই তাঁর এই শুভ উদ্যোগ পন্ডশ্রম হল।

(১২) আনুমানিক ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে খন্ডলে ক্ষত্রীয় আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনের উদ্‌গাতা ছিলেন শ্রীমৎ সরল ঘোষ অগ্নিহোত্রী নামক জনৈক তেজস্বী মহাপুরুষ। তাঁর আগমনের পূর্ব্বে, খন্ডলের পুরোহিত সমাজ এমন বিধান দিত যাতে কায়স্থরা ও বৈশ্যরা একমাস ব্যাপী মৃতাশৌচ পালন করে। এই নিয়ে এতকাল যাবৎ কোন প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করে নি। অগ্নিহোত্রী ইহার প্রতিবাদ করেন এবং ইহা যে শাস্ত্রীয়বিধান -বিরুদ্ধ তা প্রমাণ করেন। ব্রাহ্মণ সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হল। পূর্ব্ব বসন্তপুর নিবাসী যামিনীকান্ত ভট্রাচার্য মহাশয় প্রকাশ্যে সমর্থন করলেন অগ্নিহোত্রীকে। সমগ্র খন্ডলে ও দক্ষিণ শিকে বহু গণ্যমান্য কায়স্থ উপবীত ধারণ করলেন। অশৌচ পালনকাল কমানো হল। নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গ অগ্নিহোত্রীকে সহায়তা করলেন। নিবারণবাবু ও যামিনীবাবু এই আন্দোলনের পক্ষে একাধিক সভা- সমিতিতে ভাষণ দেন।

(১৩) একটু অবস্থাপন্ন হিন্দু বাড়ীতে কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আশে-পাশের ১০/১৫ টি গ্রামের হিন্দুরা নিমন্ত্রিত হত। নিমন্ত্রণ রক্ষা করা ছিল একটি সামাজিক

কর্তব্য । শ্রাদ্ধবাসরে এসেই খেয়েই লোকেরা তৎক্ষণাৎ চলে যেত না। শ্রাদ্ধবাসর ছিল অন্যতম সভাস্থল। সেখানে গ্রামের লোকেরাই যাবতীয় কাজ করত। একে অপরের পুকুর থেকে মাছ দিত বিনামূল্যে, গোলা থেকে প্রয়োজনে ধান-চাউল দিত। শ্রাদ্ধবাসরের পাশেই সভাস্থলে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সমাজের নানা বিষয় নিয়ে সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করতেন, কোন দলাদলি ছিল না । মতামত প্রকাশে কট্টরতা ও কঠোরতা ছিল না। নিবারণবাবু ও যামিনীবাবু এই ধরণের শ্রাদ্ধবাসরে দেশের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দিতেন এবং সমস্যা সমাধানকল্পে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। দেশবাসীর চিন্তাধারাকে মহৎ পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তিনি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা চালাতেন।

(১৪) বঙ্গদেশকে ভঙ্গ করার জন্য ১৯০৫ সালে বৃটীশ কর্তৃপক্ষ এক ষড়যন্ত্র করেছিল ।ইহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলল বঙ্গবাসীরা । ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশ করল বৃটীশ সরকার। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলকাতায় এক জনসভায় ঠিক্ করা হল যে, বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা হবে। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর করার দিন ধার্য করল সরকার । সে দিন সারা বঙ্গে জাতীয় শোক দিবস পালন করা হল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা রাস্তায় নেমে দেশাত্মবোধক গান করেন, রাখী বন্ধন করেন।

১৯০৫ সালের আন্দোলন কালক্রমে কতিপয় আন্দোলন- প্রবাহের জন্মদাতা হয়ে রইল । মোহনদাস করমচান্দ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খৃঃ) এসে সেই সব আন্দোলনকে ব্যাপকতা দেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন নামে আরেক মাত্রা যুক্ত হল। ঘরে-ঘরে চরকা ব্যবহৃত হতে থাকল। খন্ডল পরগণাতে পরবর্তীকালে বিলাতী বর্জন, স্বদেশী অর্জনের আন্দোলনের যাঁরা নেতৃত্ব দেন, নিবারণ চৌধুরী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

(১৫) চট্রগ্রামে, নোয়াখালীতে , খন্ডলে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-), আইন অমান্য আন্দোলন(১৯৩০- -) এবং ভারত ছাড় আন্দোলন (১৯৪২-) জনমানসে সাড়া জাগিয়েছিল। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মন্ত্রগুরু ছিলেন মহাবিপ্লবী সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৩৪ খৃঃ)। সূর্য সেন ছিলেন মাষ্টারদা নামে অধিক পরিচিত । আপাততঃ চট্রগ্রামকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র আক্রমণের দিন ধার্য করা হল শুক্রবার ১৮ই, এপ্রিল ১৯৩০খৃঃ রাত ১০টা। আক্রমণ সফল হল, চট্রগ্রাম করায়ত্ব হল মাত্র ২ দিনের জন্য । ২২ শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রিত সংগ্রামীদিগকে পাল্টা আক্রমণ করল বৃটীশ পুলিস। সংগ্রামীদের অনেকেই আহত ও নিহত হলেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ শে ফেব্রুয়ারী ধৃত হন, অশেষ নির্যাতিত হন এবং ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী নির্মম নির্যাতনে সূর্যসেন নিহত হন। বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন পরে বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হল।

সূর্য সেনের অন্যতম বিশ্বস্ত সহকর্মী বিনোদবিহারী দত্ত ফেরারী হয়ে বার বৎসর (১৯৩০-১৯৪১ খৃঃ) খন্ডলে কাজকর্ম করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সেজে জনসেবা করতেন, সারদা সরকারের বাড়ীতে থাকতেন। ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় তিনি ধরা পড়েন এবং তিন বৎসর কারারুদ্ধ হন।

ফেনী, মিরেশ্বরাই, দুর্গাপুর, সীতাকুন্ড, প্রভৃতি জনপদে বিনোদ দত্তের কতিপয় প্রাক্তন সহকর্মীর নাম হল মন্দিয়া নিবাসী অম্বিকাচরণ মজুমদার ও হরিপদ মজুমদার, দুর্গাপুর নিবাসী বীরেন্দ্র চক্রবর্তী ও হরেন্দ্র ভৌমিক।

খন্ডলে বিনোদ দত্তের শিষ্যদিগকে দুইভাগে ভাগ করা যায়; তাঁর প্রবীণ শিষ্যদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাঘমারা নিবাসী যোগেশ চৌধুরী ও সুরেশ চৌধুরী, কোলাপাড়া নিবাসী অমরকৃষ্ণ সরকার, উত্তর ধর্মপুর নিবাসী শচীন্দ্র পাল।

তাঁর নবীন শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অনন্তপুর নিবাসী অমৃতলাল সরকার ও সেনাপতি নাথ ; কালিকাপুর নিবাসী মনোরঞ্জন মজুমদার ও আশুতোষ বৈদ্য ; কোলাপাড়া নিবাসী মনীন্দ্র চক্রবর্তী ও বরদাচরণ মিত্র ; চিতলিয়া নিবাসী চিত্তরঞ্জন সরকার, মেলাগড় নিবাসী রেবতীমোহন পাল ও আশুতোষ পাল।

দক্ষিণ শিকে ও খন্ডলে অনেকগুলো দীঘি বাধ্যতামূলক শ্রম দ্বারা কাটিয়েছিল দস্যুসর্দার সমসের গাজী। অতি উচু পাড় বিশিষ্ট দীঘি গুলো কিল্লা হিসাবে ব্যবহার করত পার্বত্য ত্রিপুরাকে আক্রমণ করার জন্য। তখন রাজা ছিলেন কৃষ্ণ মানিক্য (১৭৪৮-১৭৮৩ খৃঃ)। সমসের গাজীর পতনের পর, এবং পলাসীর যুদ্ধের পর প্রভাবশালী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী লিক সাহেব খন্ডলে উত্তরে-দক্ষিণে লম্বা রাস্তা বানাল।

সমসের গাজীর একটি কিল্লা ছিল খন্ডল উচ্চ বিদ্যালয়ের সামান্য উত্তরে। সেখানেই বিনোদ দত্তের শিষ্যরা প্রশিক্ষণ নিত, শরীর চর্চা ও আত্মরক্ষার নানা প্রকার কৌশল বিষয়ে। নিবারণবাবু নিজে কখনো অস্ত্র ধারণ করেন নি, কখনো অস্ত্রশিক্ষা দেন নি। কিন্তু তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রায় সকলেই ছিল তাঁর পরিচিত ও কনিষ্ঠ। তা ব প্রতি ছিল তাঁর স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ। কোন প্রকার অন্যায় না করতে তিনি সদা সতর্ক করে দিতেন তাদিগকে। তৎসত্ত্বে ও কিছু-কিছু ধ্বংসাত্মক কাজ করেছিল তারা। খন্ডলে ১৫ টি ডাকঘর পুরে দিয়েছিল, বিলোনীয়া নগরে ব্রজেন্দ্র কিশোর বিদ্যালয়ে রক্ষিত ত্রিপুরা রাজসরকারের বহু কাগজপত্র, প্রমাণপত্র পুড়ে দিয়েছিল।

বৃটীশ গোয়েন্দার সাথে সহযোগীতা করত লীগের কতিপয় লোক এবং কতিপয় কমিউনিষ্ট। প্রসঙ্গতঃ জয়পুর নিবাসী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-এর নাম উল্লেখযোগ্য। কমিউনিষ্ট

সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক গোপনে বহু ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। দুটি উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যকে প্রমাণ করা যাক্। তারাকুচাতে ছিল অতুলচন্দ্র বৈদ্য ও হেমচন্দ্র গণ-চৌধুরীর বাড়ী। এই দুই বাড়ীতে অমরকৃষ্ণ সরকার আত্মগোপন করে থাকতেন। সত্যেন্দ্র এই দুই বাড়ীতে এসে ঘুরে, জেনে গেল। পরদিনই অমরবাবু ধৃত হলেন। ফেনীতে এক গোপন আস্তানাতে থাকতেন শচীন পাল। সত্যেন্দ্র খুঁজে-খুঁজে ঐ আস্তানাতে ঘুরে গেল। পর দিন শচীনবাবু ধৃত হলেন। সত্যেন্দ্রনাথের মুখ ও মন, ভিতর ও বাহির একরূপ ছিল না। বাইরে কট্টর স্বাধীনতা সংগ্রামী, ভেতরে কমিউনিষ্ট ও বৃটীশের দালাল। সত্যেন্দ্রের মত এমন বেশ কয়েকজন লোক এধরণের কাজে লিপ্ত ছিল। নিবারণবাবু এমন পরিবেশের মধ্যেই কাজ করেছেন।

১৬. সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ ভারতের বুকে দুই বিধর্মী, বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর অপশাসন ও শোষণ ভারতীয় কৃষকদের মাথার উপর বজ্রাঘাত স্বরূপ হয়েছিল। বৃটিশ শাসনের শেষদিকে কৃষকদের হিতার্থে কতিপয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। যেমন, ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন (১৮৮৩ খৃঃ), কৃষি ঋণ আইন (১৮৮৪ খৃঃ), সমবায় সমিতি আইন (১৯০৪ খৃঃ), মহাজনী সুদ নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯১৮ খৃঃ), বঙ্গদেশীয় মহাজন আইন (১৯৩৩ খৃঃ), ঋণগ্রস্থ কৃষক আইন (১৯৩৫ খৃঃ) ইত্যাদি। ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইনকে তাকাবি আইন বলা হত। পার্বত্য ত্রিপুরাতে ঐ আইনের অনুকরণে ঋণ দেওয়া হত, ইহাকে বলা হত তাচ্চবি বা তচকিচি বা তিন কিস্তি আইন। ঋণগ্রস্থ কৃষক আইন অনুযায়ী বঙ্গদেশে ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপন করা হল নানা স্থানে। চাকলা রোশনাবাদের অন্তর্গত খণ্ডলে ঋণ সালিশী বোর্ড গঠিত হল। সরকার তদনুসারে নিবারণবাবুকে ঋণ সালিশী বোর্ডের সভাপতি পদে মনোনীত করে যোগ্যতমের মর্যাদা দিলেন।

তৎকালে সরকারী অনুদান, ব্যাঙ্ক-ঋণ, ঘরে ঘরে চাকুরী ইত্যাদি ছিল না। তাই সুদখোর মহাজন ও সাধারণ কৃষকদের মধ্যে নানা প্রকার লেন-দেন হত। বর্গা, লাগিত, বন্ধক, ক্ষয় বন্ধক, শতকরা মাসিক তিন টাকা দুই আনা বা তদুর্দ্ধ হারে সুদ, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ — এই সব চল্‌ত। ঋণভারে জর্জরিত কৃষক ভূমি, অলংকার, গরু বাছুর ইত্যাদি ঋণের দায়ে দিয়ে দিতে বাধ্য হত। নিবারণবাবু এমন জটিল পরিস্থিতিতে যথাসম্ভব ন্যায় বিচার করে দিতেন।

১৭. ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ ভারতের জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় বৎসর। ওয়ারেন হেস্টিংস নিযুক্ত হলেন বাংলা ছোট লাট পদে। জেলা শাসকের পদ প্রবর্তিত হল। প্রতি জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপন করা হল। কালক্রমে মহকুমান্তরে বিচারালয় স্থাপিত হল। বিদেশী ভিন্নভাষী বিচারকদিগকে সহায়তা করার জন্য স্বদেশী

চরিত্রবাণ, শিক্ষিত, দোভাষী ব্যক্তিদিগকে সহায়ক পদে নিযুক্ত করা হত। নোয়াখালী বিচারালয়ের সহায়ক পদে নিবারণ বাবু নিযুক্ত হলেন। তদুপরি, ফেনী মহকুমা শাসক নানা প্রকার দুর্ঘটনার, মামলার, বিবাদের তদন্তের কাজে নিবারণবাবুর সহযোগিতা চাইতেন। তাছাড়া, গ্রাম্য ঝগড়া, মারপিঠ মিটাতে দুই ভাই এগিয়ে যেতেন, একাজে যামিনীবাবু ছিলেন বেশী বিচক্ষণ।

১৮. সমতল ত্রিপুরার দক্ষিণাংশকে তিপেরা জেলা হিসাবে গণ্য করত বৃটিশ শাসককুল। নোয়াখালী, খণ্ডল, ফেনী, চৌদ্দগ্রাম ও কুমিল্লা ইত্যাদি অর্থাৎ গোমতী নদীর দক্ষিণ তীর তিপেরা জেলা নামে খ্যাত ছিল। পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে প্রায় প্রতি বৎসর কুকি আক্রমণ হত সমতলে। তাই ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিপেরা জেলার দক্ষিণাংশকে পৃথক করে নাম দেওয়া হল নোয়াখালী জেলা। দক্ষিণ শিক, খণ্ডল, ফেনী ইত্যাদি হল নোয়াখালীর অন্তর্গত। নোয়াখালী নগরে নোয়াখালী জেলা বোর্ডের মুখ্যালয় স্থাপন করা হল। দক্ষিণ শিক ও খণ্ডল থেকে একজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাতে হবে নোয়াখালী জেলা বোর্ডে। নিবারণবাবুর দৃষ্টিতে দক্ষিণশিক নিবাসী নিষ্ঠাবান শিক্ষাবিদ্ সহকর্মী দ্বারকানাথ ভৌমিক হবেন একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। অতঃপর নির্বাচনে জয় করানো পর্যন্ত যাবতীয় কাজ ও বহু জনসভা করে সফল হলেন নিবারণবাবু।

১৯. ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হল। খণ্ডলে ও দক্ষিণশিকে আন্দোলন প্রবল হল। বিনোদবিহারী দত্তের প্রবীণ ও নবীন শিষ্যরা গোপনে গভীর রাতে অনেক কাজ করল। হাজার হাজার পত্রক মুদ্রণ করে বিলি-বন্টন করত গোপনে। তাতে লেখা হত "ইংরেজের যুদ্ধে একজনও যাব না, এক পয়সাও দেব না"। দক্ষিণ দিকে অম্বিকাচরণ মজুমদার ও হরিপদ মজুমদার এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন। কৈয়ারা গ্রাম নিবাসী ব্রজেন্দ্র মজুমদার ধৃত হন এবং প্রমাণ- অভাবে পরে মুক্ত হন। শিবপ্রসাদ মজুমদার ছিলেন অন্যতম নিষ্ঠাবান কর্মী। খণ্ডলে ভারত ছাড় আন্দোলন যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই গোপনে নিবারণবাবু ও যামিনীবাবুর কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন।

২০. কলিকাতাতে হিন্দু নিধন দাঙ্গা (১৬. ৮. ১৯৪৬ খৃঃ) এবং নোয়াখালীতে হিন্দু নিধন দাঙ্গা (১০. ১০. ১৯৪৬ খৃঃ) ছিল একসূত্রে গাঁথা। ইহার মহানায়কের নাম সুরাবর্দ্দি (১৮৯৩-১৯৬৩ খৃঃ)। অপ্রস্তুত হিন্দুরা কলিকাতাতে প্রথমে খুব ক্ষতিগ্রস্থ হল, পরে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলল। সুরাবর্দ্দি তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। কলিকাতাতে হিন্দু কর্তৃক প্রতিরোধ গড়ে উঠায় ক্ষুদ্ধ সুরাবদ্দি ফের পাল্টা আক্রমণ চালাতে নির্দেশ দিল নোয়াখালীর লীগ নেতাদিগকে। লীগ কর্মীরা নোয়াখালীতে তাণ্ডব করল। নোয়াখালীর

হিন্দুদের কাতর আহ্বানে মহাত্মা গান্ধী নভেম্বরে এলেন নোয়াখালীতে। যাঁদের আহ্বানে গান্ধীজী নোয়াখালী এলেন, তাঁদের মধ্যে নিবারণবাবু অন্যতম। গান্ধীজীর থাকা-খাওয়ার, সুরক্ষার, যাতায়াতের, জনসমাবেশের ব্যবস্থা করেছিলেন যে-সব স্থানীয় কর্মী তাঁরা প্রায় সকলেই বিনোদ দত্তের শিষ্য। বিনোদ দত্ত তখন কারাগারে। সুতরাং খণ্ডল থেকে নিবারণবাবুর আশীর্বাদ নিয়েই কংগ্রেসকর্মীরা গেলেন গান্ধীজীর সাথে।

নোয়াখালীতে গান্ধীজীর আবেদন ফলপ্রসু কম হয়েছে। এদিকে কলিকাতাতে খুচরা হারে প্রতিরোধ চলছিল ক্ষমতাসীন সুরাবর্দ্দির গভীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। নোয়াখালীতে হিন্দু নিধন চলুক, অথচ কলিকাতাতে হিন্দু-প্রতিরোধ বন্ধ হউক — এই রণকৌশল অবলম্বন করে গান্ধীজীকে নোয়াখালী থেকে সরিয়ে আনা হল। গান্ধীজী সেই অপকৌশল আঁচ করতে পারেন নি। তিনি কলিকাতাতে গিয়ে অনশন করলেন, হিন্দু- প্রতিরোধ বন্ধ হল। কিন্তু নোয়াখালিতে ছোট আকারে হলেও গোলমাল চলল; দেশ বিভাজনের পরও চলতে থাকল।

নলিনীকিশোর গুহ কর্তৃক লিখিত "বাংলার বিপ্লববাদ" নামক গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে (১৩৮১) ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায় ভেদনীতির নগ্ন চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে।

২১. খণ্ডল পরগনা তিন দিক দিয়ে পার্বত্য ত্রিপুরা দ্বারা বেষ্টিত। খণ্ডলের পূর্বে, উত্তরে ও পশ্চিমে ত্রিপুরার ভূ-ভাগ। দেশ বিভাজন অপ্রতিরোধ্য হয়ে গেল। চাকলা রোশনাবাদ ত্রিপুরার রাজার জমিদারী। ইহার ভাগ্য নির্ধারণ করার আইনগত ক্ষমতা ত্রিপুরার রাজার। কিন্তু মহারাজ বীর বিক্রম মারা যান ১৭. ৫. ১৯৪৭ সালে; নাবালক মহারাজ কিরীট বিক্রম নিরাপত্তার প্রশ্নে শিলং চলে গেলেন। প্রজারা অসহায়। চাকলার মুসলমান প্রজারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে হিন্দু বিতাড়ন করে গায়ের জোরে দখল করল চাকলা।

এমতাবস্থায় খণ্ডল ও দক্ষিণ শিক যেন নিকটবর্তী ত্রিপুরার সাথেই থাকে, তার জন্য স্থানীয় হিন্দু মহাসভার নেতারা চেষ্টা করতে লাগলেন। নিবারণবাবু এবং শিবপ্রসাদ মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিরা গেলেন কলিকাতাতে, শরৎ বসুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হল একাধিক কারণে, যেমন যিনি মূল মালিক সেই রাজাই অনুপস্থিত; হিন্দু নেতারা সচেতন ও সংগঠিত হতে দেরী করেছেন; মুসলমানরা পূর্ব ভাগেই লাঠির আশ্রয় নিয়ে রণাঙ্গণ দখল করেছিল; হিন্দু নেতারা আবেদন-নিবেদনের পথ বেছে নিল, বেশী দিব্যজ্ঞান ও কম কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করল।

২২. নিবারণবাবু ছিলেন কোমলে-কাঠিন্যে গড়া দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ। উত্তেজনাপূর্ণ কর্মানুষ্ঠানে ও অস্ত্র চালানোতে অনাগ্রহী। তিনি অস্ত্র ধারণ করেন নি, অস্ত্র

শিক্ষা দেন নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর বাড়ীতে কয়েকবার খানাতল্লাসী করা হয়েছিল, পরশুরাম থানাতে গিয়ে সপ্তাহে একদিন হাজিরা দিতে হত; ফেনী থেকে বিলোনীয়া পর্যন্ত রেলপথের একাংশ পাহাড়া দিতে বাধ্য হলেন। তাঁর গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ ঘটনাচক্রে হস্তান্তর করে দিলেন। জনৈক ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিবেশী এমন সময়ে মিথ্যা অপবাদ রটাতে সক্রিয় হল।

২৩. হিন্দু সমাজকে সংহত ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তিনি চতুঃবর্ণের গন্যমান্য লোকদের নিয়ে এক-সাথে পঙতিভোজনের ব্যবস্থা করতেন। এতে শূদ্রবর্ণের লোকেরা খুবই আনন্দিত ও সম্মানীত বোধ করত ; সামাজিক অনুষ্ঠানে চতুঃবর্ণের লোক যেন নিমন্ত্রণ পায় সে ব্যবস্থা তিনি চালু করেন।

২৪. সাধের খণ্ডল উচ্চবিদ্যালয়, প্রিয় দেশবাসী ও মাতৃসম জন্মভূমি খণ্ডল ছেড়ে চলে যেতে হবে, অন্যথায় জীবন বিপন্ন হতে পারে। খণ্ডলের পূর্বদিকে অবস্থিত পার্বত্য ত্রিপুরার বিলোনীয়া, মুহুরীপুর, জোলাইবাড়ী, মতাই, ঋষ্যমুখ প্রভৃতি জনপদে তাঁর বহু ছাত্র, আত্মীয় ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি বাস করে। সেসব স্থানে নতুন করে কিছু করা যায় কিনা চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর পরিচিত হেমন্তকুমার বসু প্রমুখ কয়েকজনকে ক্ষেত্রসমীক্ষা করার জন্য পাঠালেন। ঠিক সে সময় ঈর্ষাপরায়ণ জনৈক প্রতিবেশীর ডাহা মিথ্যা অপবাদ বজ্রাঘাত-তুল্য আঘাত দিল। নিবারণবাবু ও যামিনীবাবু খণ্ডল ও ত্রিপুরা ছেড়ে বহু দূরে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

২৫. কলিকাতাতে গুরুধাম থাকায় একটু মনোবল ছিল। গুরুদেবের নিকট গেলেন এবং সুখ-দুঃখের তিক্ত-মধুর সব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন। গুরুগতপ্রাণ নিবারণচন্দ্র বিশ্বাস করতেন একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কার্যতঃ তাই হল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষকতার কাজ পেলেন। পরে সেটি ছেড়ে আরেকটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হলেন। ১৯৭২ সালে চাকুরী থেকে অবসর নিলেন।

গুরুদেব দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত খুব খুসী হলেন নিবারণচন্দ্রের মতো নিষ্ঠাবান শিষ্যকে হাতের কাছে পেয়ে। তিনি পূর্বেই সুধর্মা নামক মঠ স্থাপন (১৯৫২ খৃঃ) করেছিলেন। গীতাপ্রচারে গুরুদেবের উৎসাহের অন্ত ছিল না। শিষ্যকেও সেই ভাবে ভাবিত করেন। গুরু-শিষ্য মিলে সুধর্মা মঠের সেবাবিভাগ হিসাবে বিদ্যালয় গড়েতুললেন। আর্য বিদ্যালয় নামে এই শিক্ষালয় গুরু-শিষ্যের কীর্তি বহন করছে।

দীক্ষা

নিবারণবাবু ভারতীয় পরম্পরা অনুযায়ী দীক্ষা নিয়েছিলেন। ছাত্র জীবনে দীক্ষা

নেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন যুবক নিবারণচন্দ্র আচার্য দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত নামক মুক্ত পুরুষকে গুরু বলে মেনে নেন। গুরুর কাছ থেকে কৃপা লাভের পর, বাকী জীবন নিরামিষ ভোজী হলেন। দীনেশচন্দ্র মারা যান ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে। এই গুরুর নির্দেশেই তিনি এম. এ. পরীক্ষা না দিয়েই সমজসেবায় মেতে যান।

পারিবারিক জীবন

নিবারণচন্দ্রের পারিবারিক জীবন আদর্শ হিন্দু পরিবারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাবা-মা ও ভাইবোনদের সাথে, আত্মীয়দের সাথে, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে নিবারণচন্দ্র সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। রাম-লক্ষ্মণের নাম যেমন এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা হয়, তেমনি নিবারণ ও যামিনী এই দুই ভাই এর নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে তাঁদের এলাকাবাসীরা।

নিবারণ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি দুইবার বিবাহ করেন। প্রথমার অকাল মৃত্যুতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। দক্ষিণ শিকে কৈয়ারা গ্রামে মজুমদার বাড়ী প্রসিদ্ধ। নিষ্ঠাবান শিক্ষক বিশ্বম্ভর মজুমদার ছাত্রসমাজে গুরুঠাকুর বলে প্রিয় ছিলেন। বিশ্বম্ভরের পুত্র চন্দ্রনাথ ছিলেন শিক্ষক। চন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যাদের নাম হল যথাক্রমে সৌদামিনী, সুহাসিনী, বিনোদিনী, অম্বিকারাণী, শিবপ্রসাদ ও প্রতিভা। কন্যারা প্রথম পক্ষের এবং শিবপ্রসাদ দ্বিতীয় পক্ষের। শিবপ্রসাদের জন্ম ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খৃঃ। প্রতিভার জন্ম নভেম্বরে ১৯২৩ খৃঃ। প্রতিভাকে নিবারণচন্দ্রের নিকট বিয়ে দেন শিবপ্রসাদ, কেননা চন্দ্রনাথ (১৮৭৭-১৯৩২খৃঃ) তখন লোকান্তরিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতিভাকে বিয়ে দেওয়া হয়। কিছুকাল পরেই গ্রাম্য চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার দরুণ প্রতিভা মারা যান ডিসেম্বরে, ১৯৪২ সালে। অতঃপর চৌমুহানীর নিকট হাকিমপুর গ্রাম-নিবাসী নক্ষত্রকুমার দত্ত মহাশয়ের কন্যা ফুল্লরানী দত্তকে বিবাহ করেন ১৯৪৩ সালের আগষ্টে। ফুল্লরানী বাকী জীবন স্বামীর সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী হন। তাঁদের কোন পুত্র-কন্যা নেই। কলিকাতাতে ঢাকুরিয়াতে বাপুজী কলোনীতে তাঁদের নিজস্ব নিবাস আছে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

'বাংলায় বিপ্লববাদ' নামক গ্রন্থের ৩৮ নং পৃষ্ঠায় লেখক নলিনীকিশোর গুহ চার প্রকার বিপ্লববাদীর চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রথম শ্রেণীর লোক কতকটা দার্শনিক ভাবাপন্ন। ইঁহারা জীবনটাকে অত্যন্ত উচ্চ আদর্শের দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখেন; তাঁহাদের দেশপ্রেম মানবিকতায় পরিণত হয়; অধ্যাত্ম জীবনও তাঁহারা যাপন করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কতকটা উত্তেজনাপূর্ণ কর্মানুষ্ঠান প্রয়াসী। ইহারা স্বভাবতঃ কতকটা নির্ভীক।

তৃতীয় শ্রেণীর লোকের অন্তরে স্বাধীনতা বা কর্তৃত্বপ্রিয়তা অত্যধিক প্রবল। পরে ইহারাই প্রভুত্ব লইয়া দলাদলি করে, ঝগড়া করে।

চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিপ্লবে যোগ দেয়। বিপ্লবের শত্রুও আবার ইহারাই।

নিবারণবাবু ও যামিনীবাবু প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা থেকে কখনো বিচ্যুত হন নি। তাঁরা কখনো অস্ত্র ধারণ করেন নি, কখনো অপরের অনিষ্ঠ করেন নি, কখনো মিথ্যার ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেন নি। বৈষয়িক উন্নতি, নৈতিক উন্নতি ব্যতীত, দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না — এই বিশ্বাস তাঁদের মজ্জাগত ছিল। সৎ আচরণ, ধর্মাচরণ, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা এবং ব্যবহারিক পরোপকারিতা হল মানব জীবনের ভিত্তি, বিপ্লবী জীবনের বনিয়াদ।

নিবারণবাবু ছিলেন কর্মমার্গী। ভক্তিমার্গ তাঁর কর্মমার্গকে করত পারিজাতের মত সুগন্ধযুক্ত এবং জ্ঞানমার্গ করত তাঁর কর্মমার্গকে শরতের পূর্ণিমার চন্দ্রালোকের মত উজ্জ্বল।

স্মৃতিরক্ষা

দক্ষিণ ত্রিপুরাতে নিবারণবাবুর অগণিত ছাত্র, আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ী বাস করছে। তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় একটি স্মৃতি নির্মিত হয়েছে। তাঁর স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীযুক্ত বরদাকুমার সেন মহাশয় প্রয়োজনীয় ভূমি দান করেছেন জোলাইবাড়ীতে। সেই ভূমিতেই 'গীতা পাঠচক্র' নামে পাকা সৌধ নির্মাণ করে অভ্যন্তরে নিবারণবাবুর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। বিগত শুক্রবার, শুভ দোলযাত্রা তিথিতে, ২৫শে ফাল্গুন ১৪০৭ বঙ্গাব্দে (৯ মার্চ, ২০০১ খৃঃ) গীতা পাঠচক্রের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন করা হল। তাঁর অনুজ যামিনীবাবু মারা যান ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে।

অমৃত বৈদ্য, আফুচী চৌধুরী, নীলকৃষ্ণ ভৌমিক, যোগেন্দ্র সরকার, যোগেশ মজুমদার, ক্ষেত্রমোহন মজুমদার ও শীতল চন্দ্র সরকার প্রমুখরা জোলাইবাড়ী বিদ্যালয় (১৯৫১ খৃঃ) স্থাপন করেন। খণ্ডল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রভাব এতে স্পষ্ট। ❑

অখিলদাস বৈষ্ণব

অখিলদাস বৈষ্ণব জন্ম গ্রহণ করেন পূর্ব বাংলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামক বিখ্যাত জনপদে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, কোন এক রবিবার হল তাঁর জন্মদিন। সঠিক জন্মতিথি অখিলদাসের মনে নেই। ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫খৃঃ) এক ভয়াবহ জল প্লাবন হয়েছিল অত্রাঞ্চলে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তখন অখিলের বয়স ৭ বৎসর। অখিলদাসের পূর্ব নাম অখিল রায়। পিতামাতার নাম কৈলাস রায় ও স্বর্ণবালা রায়। ইহারা কায়স্থ। কৈলাসের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। কৈলাস ছিলেন তহসিলদার।

তহসিলদার কৈলাসের মধ্যম পুত্র অখিল নিরক্ষর। অন্যান্য পুত্র কন্যারা লেখাপড়া শিখেছিল। অখিল কৈশোর থেকেই গান-বাজনা, ভজন-কীর্তন, বৈষ্ণব সেবা, খিচুড়ী প্রসাদ খুব ভালবাসত। আশে-পাশে যেখানেই এসব হত, অখিল সেখানে যেতই। লেখাপড়ার প্রতি আদৌ আগ্রহ নাই। পিতা কৈলাস একদিন কিশোর অখিলকে প্রহার করেন। ঘটনাস্থলে ছিলেন দৈবজ্ঞ গিরিশ আচার্য। গিরিশ আচার্য বারণ করেন প্রহার করতে এবং হস্তরেখা ও কুষ্ঠি বিচার করে বলেন যে, অখিল হবে সাধক ও সন্ন্যাসী এবং ১৯ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগী হবে।

কালীকুমার ভট্টাচার্য (আঃ ১৮৮৪-১৯৭৪ খৃঃ) নামক জনৈক সাধক আখাউড়াতে পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। একবার আসাম-বেঙ্গল রেলপথে একটি রেলগাড়ী অচল হয়ে যায়। গাড়ীর কোন যান্ত্রিক গোলোযোগ দেখা যায় নি অথচ গাড়ী মাঝপথে দাঁড়িয়ে রইল। খবর পেয়ে সাধক কালীকুমার মন্ত্রপুত জল ছিটিয়ে গাড়ীটিকে সচল করেন। এই ঘটনার পর কালীকুমারের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কালীকুমার একবার কালীকচ্ছ নামক জনপদে আসেন স্বীয় অনুজকে বিবাহ করাতে। তখন কালীকুমারের সহিত কৈলাস ও অখিলের পরিচয় হল। অতঃপর অখিল হলেন কালীকুমারের একান্ত অনুগামী, ভক্ত।

কিছুদিন পর কালীকুমার বদলী হলেন আখাউড়া থেকে লাকসামে। সেখানেই তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি জয়বাবা নামে পরিচিত হন। কালীকুমার গৃহী ছিলেন। তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জন, সত্যরঞ্জন ও নিত্যরঞ্জন।

দেশ বিভাগের পূর্বে গুরু ও শিষ্য পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে ঘুরেছেন। জয়বাবার ভক্ত-শিষ্যরা জলপাইগুড়ি, মালদহ, গৌহাটী, ডিগবয় প্রভৃতি স্থানে ছোট-খাট আশ্রম স্থাপন করেছে। জয়বাবা ও অখিল সে-সব আশ্রম পরিদর্শনে যেতেন, কিছু দিন

থাকতেন, ভক্তদের উপদেশ দিতেন, রোগ শোক নিরাময় করতেন। লাকসামের আশ্রমে গুরু একবার শিষ্যকে পরীক্ষা করেন। মাটির নীচে সমাধি দেন শিষ্যকে। ১৫ দিন ঘুমে, শয়ান ছিলেন অখিল। এইভাবে নাছোড়বান্দা একনিষ্ঠ ভক্ত অখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যশস্বী হন।

১৯৪৫ সালে রায়পুরাতে এবং ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে ভয়াবহ হিন্দু নিধন যজ্ঞ হয়েছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে জয়বাবা ১৯৪৪ সালেই ত্রিপুরার অন্তর্গত উদয়পুরে চলে আসেন। অখিল একই সাথে ত্রিপুরায় আসেন। কিছুদিন পর অখিল আগরতলার উত্তরে সিঙ্গারবিলের নিকট ভূমি কিনেন, ১৯৫০ সালে ভৈরবের পুলে বহু হিন্দু নিহত হল। সেই আতঙ্কে অখিলের ভাইরা এল সিঙ্গারবিলে। অখিল ভাইদের নিকট সেই জায়গা হস্তান্তর করে উদয়পুর যান। উদয়পুর থেকে গুরুর আদেশে সাব্রুমে যান এবং গুয়াচান নামক গ্রামে আশ্রম করেন। অপরিচিত এলাকায় তিনি থাকতে পারেন নি। আবার চলে আসেন উদয়পুরে। এবার উদয়পুরের পূর্বে হীরাপুর নামক গ্রামে আশ্রম গড়েন। সেখানে তিনবার ডাকাতি হয়। তাই সেটি ছেড়ে চলে আসেন উদয়পুর নগরের নিকটে ফুলকুমারী বনদুয়ারীতে।

নোয়াখালীর দাঙ্গায় স্বামীহারা দুই মহিলা উদয়পুরে এসে জয়বাবার নিকট আশ্রয় নিল। কিছুদিন রেখে জয়বাবা শিষ্য অখিলের হাতে সমর্পন করেন উভয় মহিলাকে। ইহারা সম্পর্কে মা ও মেয়ে। মেয়ের নাম সারদাদেবী। সারদাদেবী ছিলেন শিক্ষিতা, সুন্দরী ও সাধ্বী। উভয়েই কালক্রমে মারা যান।

উদয়পুর নগরের পূর্বপ্রান্তে অনতিদূরে অখিলদাসের আখড়া অবস্থিত। এতে রয়েছে তিনটি জীর্ণশীর্ণ কুটির। কিন্তু এতে রাত দিন অগণিত লোক সমাগম হয়। ইহা হল দেবালয়, চিকিৎসালয় ও বিশ্রামাগার। পথের ধারে অবস্থিত এই ছোট আশ্রমে লোক আসে পান খেতে, তামাক খেতে, গাঁজা খেতে, জলপান করতে, বিশ্রাম করতে, গল্প করতে, রোগের চিকিৎসা করতে । হাম হলে, গরু হারালে, পাগল হলে, প্রসব বেদনায় কষ্ট পেলে অখিলদাস হলেন গ্রামবাসীর ভরসা। অখিলদাস এসব সেবার বিনিময়ে কিছু অর্থবিত্ত চান না। কিন্তু গ্রামবাসীরা অবিবেচক নয়। তারা এনে দেয় আলু, বেগুন, চাউল, ডাল, শিমের বীচি, কুমড়া, মরিচ, লাকড়ী, তামাক, জল ইত্যাদি। ন্যায্য মূল্যে দোকান থেকে গ্রামবাসীরাই এনে দেয় লবণ, কেরোসিন ইত্যাদি। তারাই ঘর মেরামত করে দেয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসার সম্পর্কেঅখিলদাস ও গ্রামবাসী জড়িত।

অখিলদাস অকপট, অনাড়ম্বর, অযাচক, আত্মপাকী, নিষ্ঠাবান, নিষ্কলঙ্ক, নিরিবিলি,

শ্রমশীল, পরোপকারী ও সংযমী। অখিলদাসের গড়ন পাতলা, উচ্চতা ৫'৪'', গায়ের রং শ্যামলা, পরিধানে সাদা ধুতি। তিনি গুরুকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। অখিলদাসের মত একনিষ্ঠ ভক্ত দুর্লভ। ❑

শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ মহারাজ

পূর্ব বঙ্গে, নোয়াখালী জেলাতে, ফেনী নগরের পশ্চিমে-দক্ষিণে, বেগমগঞ্জ থানাতে, ভোলা বাদশা নামক গ্রামে রামজীবন সিংহ ও আনন্দময়ী সিংহ-এর অন্যতম পুত্র দ্বারকানাথ পরবর্তী কালে শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ মহারাজ নামে খ্যাত হন। তাঁর আবির্ভাব তিথি হল বৃহস্পতিবার, জন্মাষ্টমী, ২রা ভাদ্র, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ। তাঁর তিরোভাব তিথি হল বুধবার, কৃষ্ণপক্ষ, ২৮শে পৌষ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। খৃষ্টাব্দের হিসাবে তাঁর আয়ুষ্কাল হল ১৯.৮. ১৯০৮-১৩. ১. ১৯৯৯ খৃঃ। তিনি দীর্ঘ ৯০ বৎসর আয়ু পেয়েছিলেন। এই কর্মযোগীর জনপ্রিয় নাম হল দ্বারিক মহারাজ।

দ্বারকানাথের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে পিতৃগৃহে, গ্রামের বাড়ীতে, নোয়াখালীতে। পিতা রামজীবনের ছিল দুই পুত্র ও দুই কন্যা। চারজনের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ হলেন দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের শৈশবকালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্ কালে, রামজীবন লোকান্তরিত হন। পিতৃবিয়োগ-ব্যথায় খুব বিচলিত হয়েছিলেন দ্বারকানাথ। গ্রামের পাঠশালাতে তিনি লেখাপড়া করেছেন। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে ভিন্নপথে, সাধন জগতে প্রবেশের জন্য অধীর হয়ে গেলেন।

সমাজসেবার কাজে দ্বারকানাথের হাতেখড়ি হয়েছিল কিশোর বয়স থেকেই। তাঁদের গ্রামে ছিল এক বিশাল বটগাছ। সেই বটতলাতে ছিল দেবালয়। গ্রামবাসীরা সেখানেই বারোয়ারী পূজা করত। সেখানে বসত মেলা, নাচগানের আসর। ছেলেরা খেলাধূলা করত। অন্যান্য বালকদের সাথে দ্বারিকানাথ অংশ নিতেন গোল্লাছুট, ডাণ্ডাচুল্লি, ধাড়িয়াবান্দা প্রভৃতি খেলাতে। মাঠে কাজ করা, গরু চরানো, ঘাস তোলা প্রভৃতি কাজ করত সব গ্রাম্য বালকরাই। আবার প্রয়োজনে কোন রোগীর সেবা করা, মরা পোড়ানো, নিমন্ত্রণে জল দেওয়া, পাতা বিছিয়ে দেওয়া —এসবই মিলেমিশে করতেন দ্বারকানাথ।

সকলের সাথে থাকলেও, বালক দ্বারকানাথের মধ্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। ছল-চাতুরী, কপটতা,মিথ্যাচার, এই বালকের মধ্যে কিছু ছিল না। তাঁর চরিত্র সংশোধন যোগ্য ছিল। সমবয়সীদের পাল্লায় পড়ে এই বালকের মধ্যেও ধুমপানের কু-অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। মায়ের মৃদু ভর্ৎসনাতেই বালকের শুদ্ধবুদ্ধি জেগে উঠল, আর কোন দিন কোন কু-অভ্যাস ধারে-কাছে আসতে পারে নি।

পার্শ্ববর্তী গ্রাম গোপালপুর। গোপালপুরে ছিল এক বড় দীঘি। দীঘির পাড়ে বড়

বটগাছ। বটতলাতে সুরেশ দত্ত নামক সাধক পর্ণ কুঠির নির্মাণ করে থাকতেন, সাধন ভজন করতেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ প্রচার করতেন, দীন-দুঃখীকে যথাসম্ভব সহায়তা করতেন, বালকদের আদর করতেন, বড়দের শ্রদ্ধা করতেন। বালক দ্বারকানাথ প্রায়ই যেতেন সুরেশ ব্রহ্মচারীর নিকট। ক্রমে-ক্রমে চুম্বকের মত একে অপরকে আকর্ষণ করতে লাগল। বিধবা মাতা আনন্দময়ী তখন বেঁচে আছেন। বিপদে- আপদে মাকে দেখাশুনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়ে, দ্বারকানাথ হলেন গৃহত্যাগী, আশ্রমবাসী।

মাত্র ষোল বৎসর বয়সে যুবক দ্বারকানাথ, আনুমানিক ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ঘর ছাড়লেন। দীর্ঘ ৭৫ বৎসর (১৯২৪-১৯৯৯ খৃঃ) যাবৎ চল্‌ল সেই আশ্রমিক জীবন। পূর্ব্ব বঙ্গে, অসমে,ত্রিপুরাতে অতিবাহিত হল এই ৭৫বৎসর। তাঁর আশ্রমিক জীবনকে মোটামুটি পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

১. নোয়াখালীতে আশ্রমিক জীবন(১৯২৪-১৯৩৯ খৃঃ)

নোয়াখালীতে আশ্রমিক জীবনের সূত্রপাত হয় সুরেশ ব্রহ্মচারীর কুটিয়াতে বসবাসের মধ্যে দিয়ে। সুরেশ ব্রহ্মচারী থাকতেন গোপালপুরে দীঘির পাড়ে,বটতলায়। যুবক দ্বারকানাথের শুভাগমনে প্রাণ-চাঞ্চল্য, কর্ম প্রেরণা, হাসি-খুসীর জোয়ার এল। এক যুবকের একনিষ্ঠ প্রেরণায় অন্যান্য যুবকরা স্বেচ্ছায় শ্রমদান করতে লাগল, বয়স্করা ধান, চাল, টাকাপয়সা. অন্যান্য দ্রব্য দিতে লাগল। পর্ণকুটির রূপান্তরিত হয়ে গেল গোপালপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে।

গোপালপুর থেকে কয়েকটি গ্রাম পরেই চন্ডীপুর মনসাগ্রাম অবস্থিত। সেখানে সমাজসেবী, স্বাধীনতাসংগ্রামী, চিকিৎসক ও চিরকুমার যদুনাথ মজুমদার থাকতেন। যদুনাথবাবু শুনতে পেলেন দ্বারকানাথের অদ্ভুত কর্মক্ষমতার সুখ্যাতি। যদুনাথের ঐকান্তিক আগ্রহে দ্বারকানাথ গেলেন চন্ডীপুর। সমবেত শ্রমদানের দ্বারা চন্ডীপুর আশ্রম নবজীবন পেল। এইভাবে এই দুই গ্রামে মিলে প্রায় ১৫ বৎসর অতিক্রান্ত হল। এই পর্যায়ে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত হন।

২. কুমিল্লাতে আশ্রমিক জীবন (১৯৪০-১৯৫৭ খৃঃ)

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। দ্বারকানাথ ব্রহ্মচারীকে কুমিল্লাতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আনা হল। এখানেও আশ্রমের একই জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা। বিশাল দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে অবস্থিত এই আশ্রম তখন বাঁশ-ছনের বেড়ার ঘরে কোন প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করছে। ব্রহ্মচারী দ্বারকানাথের অক্লান্ত পরিশ্রমে, আবাসনের চেহারা পাল্টে

গেল। কলিকাতা মহানগরে পুর্ব্বকল্পিত অভয়আশ্রম সমতল ত্রিপুরার কুমিল্লাতে স্থাপন করা হল ১৯২৩ সালে। উদ্যোক্তা হলেন সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী,হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল পালিত, মুনীন্দ্র ভট্টাচার্য, নৃপেন বসু। ইহারা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী। বৃটীশ সরকার কর্তৃক তিনবার(১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৪২ খৃঃ) এই আশ্রম নিষিদ্ধ হল। বৃটীশের অত্যাচারে ১৯৪২ সালে আশ্রমবাসীদের খাদ্যসংকট দেখা দিল। এই খবর শুনে ব্রহ্মচারী দ্বারকানাথ খাদ্যসামগ্রী পাঠালেন। প্লাবন পীড়িত কুমিল্লাবাসীদিগকে সহায়তা করতে দ্বারকানাথ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করে রসদ সরবরাহ করেন। দেশে তখন ভয়াবহ পরিস্থিতি। বড়লাট Lintithgow বিদায় নিলেন। পরবর্তী বড়লাট হলেন Archibald Percival Wavell (20.10.1943-23.3.1947)

তাঁর সময়েই কলিকাতাতে ও নোয়াখালীতে হিন্দু নিধন যজ্ঞ হল, অথচ তিনি কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেন নি। তিনি কুমিল্লাতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমকে কিছু অনুদান দিয়েছিলেন। যাই হোক, দ্বারকানাথের কঠোর শ্রমে ও অনেকের সহযোগীতায় বিদ্যালয়, দেবালয় , অনাথালয়, ছাত্রাবাস, অতিথিশালা, কৃষিখামার, ফুলের উদ্যান নব জীবন পেল। এর মধ্যেই ভারত বিভক্ত (১৯৪৭ খৃঃ) হল, বহু রক্তপাত হল। ১৯৪৭ সালের ৬ই জুলাইতে শ্রীহট্টের ভাগ্য নির্ধারিক জনমত যাচাই হল। ছলে-বলে শ্রীহট্টকে পাকিস্থানভুক্ত করা হল।

৩. শ্রীহট্টে আশ্রমিক জীবন (১৯৫৭-১৯৬২ খৃঃ)

শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্থানভুক্ত হওয়াতে বহু হিন্দু আতঙ্কিত হয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করল। এই সব কারণে শ্রীহট্টে অবস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রম চরম দুর্দশায় পতিত হল। তাই ডাক এল দ্বারকানাথের। ভাঙ্গা হাট, মরা গাঙ সদৃশ অবস্থা হল এই আশ্রমের। এক্ষেত্রে,পরাজিত, মনমরা সৈনিক দিয়ে যুদ্ধ জয়ের আশা যেমন দুরাশা, এ-আশ্রমেরও তাদৃশ অবস্থা । ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য নামক জনৈক ভক্ত এখানে আশ্রমের সূত্রপাত করেন। ইন্দ্রদয়াল পরবর্তী কালে প্রেমেশানন্দ মহারাজ নামে খ্যাত হন। আহুত দ্বারকানাথ এখানে বেশী দিন থাকেন নি। মাত্র এক বৎসর কাল এই আশ্রমের সেবা করেছেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই আশ্রমের উন্নতি বিধানে সক্ষম হন।

এক বৎসর বাদেই দ্বারকানাথের আমন্ত্রণ এল হবিগঞ্জে আসার জন্য। গৃহীভক্ত যশোদারঞ্জন মোদক হবিগঞ্জে আশ্রম স্থাপনের জন্য ভূমিদান করেন। এখানেও আশ্রমের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। দ্বারকানাথ উপলব্ধি করলেন সমস্যার কথা । তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন। পরিচালন সমিতির সদস্যদিগকে ও ভক্তদিগকে নৈশ ভোজের

আমন্ত্রণ করলেন।আমন্ত্রিতদের সামনে আশ্রমের অভাবের কথা বলা হল। তাঁর আন্তরিক আহ্বানে সারা দিলেন সকলে। পরদিন থেকেই কার্যকরী সহযোগীতা আসতে লাগল। আশ্রম হল কর্ম্মমুখর।

হবিগঞ্জে থাকাকালীন সময়েই তাঁর সুনাম অসমে ছড়িয়ে গেল।অসমের ভক্তরা আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি সাড়া দিলেন।১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হল। ভীষণ যুদ্ধ হল। ভারত-পাকিস্থানে তখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। দ্বারকানাথ গেলেন ঢাকা নগরে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে, ভারতে আসার প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনা গৃহীত হল, অনুমতিপত্র এল। তখন তিনি হবিগঞ্জে।অনুমতি পেয়ে বৈধ উপায়ে তিনি বিভক্ত ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিলেন।তিনি এলেন আগরতলাতে।আগরতলাতে পূর্ব্ব পরিচিত অনেকেই আছে।তন্মধ্যে শ্রী পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী(১৯৩৬-) অন্যতম।

৪. অসমে আশ্রমিক জীবন (১৯৬২-১৯৬৫)

গুয়াহাটী নগরের আশে-পাশে ছত্রীবাড়ী নামক স্থানে রামকৃষ্ণ আশ্রম গড়া হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু আশ্রমটি মৃত-প্রায়।আশ্রমের অন্যতম কার্যকর্তা বিনয় সেন খুব আগ্রহ করেছিলেন যাতে ব্রহ্মচারী দ্বারকানাথ এই আশ্রমের কাজে গতি সঞ্চার করেন। তাঁর আগমনে ভক্ত-শিষ্যরা কাজে খুব উৎসাহ পেল। আশ্রম নব কলেবরে সজ্জিত হল। অতঃপর বেলুড়মঠ কর্তৃক অধিগৃহীত হল। ছত্রীবাড়ী আশ্রম থেকে দায়িত্ব মুক্ত হতেই আহ্বান এল নিকটবর্তী আরেকটি আশ্রমের পক্ষ থেকে।

আনুমানিক ১৯৬৩ সালে তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলে যান, পাণ্ডু নামক স্থানে। সেখানে বিজয় সেন প্রমুখ ভক্তরা কামাখ্যা পাহাড়ের গায়ে রামকৃষ্ণ পাঠচক্র নামক একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়ে ছিলেন। ব্রহ্মচারী দ্বারকানাথকে সহযোগী রূপে পেয়ে স্থানীয় উদ্যোক্তারা খুব উৎসাহিত বোধ করলেন। পাঠচক্র দ্রুতগতিতে আশ্রমে উন্নীত হল।

১৯৬৪ সালে ব্রহ্মচারী দ্বারকানাথ আহুত হলেন উত্তরভারতে, হৃষিকেশ ধামে যেতে। সেখানে আছে কৈলাস মঠ। ব্রহ্মচর্য ব্রতের সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ ব্রহ্মচারী দ্বারকানাথ শুভক্ষণে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হলেন।দীক্ষান্তে নতুন নামকরণ হল।এবার নাম রাখা হল শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ মহারাজ।দীক্ষান্তে আরো কিছু-কিছু তীর্থক্ষেত্র দর্শন করে, স্বামী পরমানন্দ অসমের পাণ্ডু আশ্রমে ফিরে আসেন।

১৯৬৫সালে আগরতলা নিবাসী শ্রদ্ধেয় ভক্ত ও শিক্ষক শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পাণ্ডু আশ্রমে উপস্থিত হন এবং আগরতলা নগরের উপকণ্ঠে, দক্ষিণে, আমতলী

গ্রামে বড় ভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে বলে জানান। তৎসঙ্গে স্বামীজীকে বিনম্র অনুরোধ করেন আগরতলায় আসার জন্য । পান্ডু আশ্রমের কার্যকর্তারা সেবার ছাড়লেন না । ১৯৬৬ সালে পরেশবাবু আবার একই বার্তা ও আমন্ত্রণ নিয়ে গেলেন পান্ডুতে। এবার বরফ গল্ল।

৫. আগরতলাতে আশ্রমিক জীবন (১৯৬৬-১৯৯৯ খৃঃ)

১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মাবকাশে শ্রদ্ধেয় পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে স্বামী পরমানন্দজীকে পান্ডুআশ্রম থেকে আগরতলায় আনলেন । সেখানকার ভক্তরা অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দেন।

আগরতলাতে অনন্তলাল বণিক (১৯০৫-১৯৮৬) প্রমুখ ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় আশ্রম গড়ার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সাল থেকেই । খুব সম্ভবতঃ১৯৫১ সালে আগরতলা নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে কয়েক গন্ডা ভূমি পাওয়া গেল। সেখানেই ক্ষুদ্র পরিসরে রামকৃষ্ণ আশ্রমের কাজ চল্ল। কিন্তু এত ছোট জায়গা স্বামী পরমানন্দের অপছন্দ।

আমতলী নিবাসী বিশিষ্ট ভুস্বামী শ্রী মধু পাল ও তদীয় পুত্র শ্রী জগদীশ পাল যৎসামান্য মূল্য নিয়ে প্রায় চল্লিশ বিঘা ভূমি বিক্রয় করে দেন । সেই ভূমিতে আশ্রম গড়ার কাজ শুরু হল ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৩ ই ডিসেম্বর ১৯৬৬খৃষ্টাব্দে। সেখানে স্থাপিত আশ্রমের নামকরণ করা হল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম । আবার শুরু হল বিশাল কর্মযজ্ঞ । মাটি কাটা, বন কাটা, গৃহনির্মাণ, অর্থের সংস্থান করা, হিসাব রক্ষা, নিত্য পূজা-পাঠ-প্রার্থনা, উদ্যান গড়া-যেন আরেক রাজসূয় যজ্ঞ । কাজ-পাগলা স্বামী পরমানন্দের বয়স তখন প্রায় ৬০ বৎসর।

কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। দুর্ঘটনা না, অন্তর্ঘাত বলা যেতে পারে । সেই বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমিকে যারা গোচারণভুমি রূপে ব্যবহার করত এবং দারুকাঠ সংগ্রহের বনভূমি রূপে ব্যবহার করত তারা গেল মনে-মনে ক্ষেপে। সম্ভবতঃ তাদের কেউ গোপনে গভীর রাত্রে আশ্রমে অগ্নিসংযোগ করে দিল। সময় ছিল গ্রীষ্মকাল, এপ্রিল ১৯৬৭ খৃঃ। সব ভস্মীভূত হয়ে গেল। ধর্ম রক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে এল যারা, তাদেরই কেউ একি ধর্ম রক্ষা করল!

স্বামী পরমানন্দের মনোবল অটুট রইল । এবার আরো পাকা - পোক্ত ঘরবাড়ী তৈরী করার পরিকল্পনা হল। কালক্রমে গড়ে তোলা হল ছাত্রাবাস, দেবালয়, গ্রন্থাগার, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, রাবার বাগান, ইত্যাদি । দীর্ঘ ২৪ বৎসর (১৯৬৬-১৯৮৯

খৃঃ) যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করে বনভূমিকে তপোবনে রূপান্তরিত করে বেলুড় মঠের হাতে তুলে দেন। ২৯শে মে ১৯৮৯ সালে এক বিশেষ অনুষ্ঠান করে সব স্থাবর -অস্থাবর সম্পত্তি বৈধ দানপত্র করে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষের হাতে সমর্পণ করে দেন। অশীতিপর বৃদ্ধ পরমানন্দ মহারাজ এক কানা কড়ি পর্যন্ত দিয়ে দেন। কিছু দিন আমতলী আশ্রমেই থাকেন।

আবার আশ্রম গড়ে অনুন্নত বর্গের সেবা করার জন্য বৃদ্ধ স্বামী পরমানন্দের নেশা চাপল। অনুন্নত গ্রাম্য অঞ্চল, বড় জায়গা চাই। খুঁজতে-খুঁজতে পাওয়া গেল রানীর খামার নামক অনুন্নত গ্রাম। আগরতলা থেকে অনেকটা দূরে,দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে। ভুস্বামী হলেন শ্রীভাদুলাল মিস্ত্রী ও অন্য দু-একজন। তাঁরা মাত্র চার হাজার টাকার বিনিময়ে প্রায় দশ বিঘা ভূমি দিয়ে দিলেন।

আবার আশ্রম গড়ার কাজ শুরু। ইহাই শেষ আশ্রম। বিগত ১১ই শ্রাবণ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ২৭শে জুলাই ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে নতুন ভূমিতে নতুন আশ্রমের ঘরের কোণাল দেওয়া হল। গড়ে তোলা হল দেবালয়, ছাত্রাবাস, রন্ধনশালা, বিশ্রামাগার, ফুলের বাগান, ফলের বাগান ইত্যাদি। রানীর খামারে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম। এই আশ্রমেই তাঁর শেষ জীবন ও অন্তিম কাল অতিবাহিত হয়েছে।

স্বামী পরমানন্দ সম্বন্ধে অভিমত

যাঁরা স্বামীজিকে দিনের পর দিন পর অত্যন্ত নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের কিছু-কিছু মতামত লিপিবদ্ধ করে পুস্তকারে জীবনীসহ প্রকাশ করেছেন ত্যাগব্রতী শিক্ষাবিৎ শ্রী পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী মহ শয়, সেই পুস্তিকা থেকে কতিপয় উক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রীমতী প্রফুল্লমুখী বসু বলেন, দ্বারিক মহারাজ যেন হাতে আলীদিনের প্রদীপ নিয়েই জন্মেছেন, তিনি ভূতের মত খাটতে পারেন এবং তাঁর স্পর্শে সর্বত্রই নব প্রাণের সঞ্চার হয়। তিনি যা করতে চান, তা না করে ছাড়েন না।

শ্রীমতী সুধা সেন বলেন- দ্বারিক মহারাজ, একাই একশ।

শ্রীমৎ স্বামী ভদ্রানন্দ মহারাজ বলেন,- আমাদের দ্বারকার ভেতরে এতটুকু মেকি নাই, ও যাতে হাতে দেবে, তাতেই সফল হবে।

পন্ডিতপ্রবর রাসমোহন চক্রবর্তী বলেন, -শ্রী শ্রী ঠাকুর ও স্বামীজী যেন দ্বারিক মহারাজের মাথায় ভর করেছেন, এবং তোমরা যারা তাঁর সান্নিধ্যে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছো তাদের জীবন ধন্য।

শ্রীমৎ স্বামী শিবরামানন্দ মহারাজ বলেন -ঠাকুরের কাজ পেলে দ্বারকা যেন উন্মাদ হয়ে যায়, এখনো তার গাছের গুড়ি উল্টাবার সখ আছে, নিজে খাটে, অন্যকে খাটাতে পারে ।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ বলেন - দ্বারিক মহারাজ শুধু স্বপ্নই দেখেন না, সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। অপূর্ব তাঁর কর্ম দক্ষতা।

শ্রী পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী বলেন - সৌন্দর্য পিয়াসী দ্বারিক মহারাজ চিরজীবন ফল, ফুল বাগান ও সবুজ প্রভৃতি ভালবাসতেন, এবং যখন যে আশ্রমে অবস্থান করতেন সে-আশ্রমকে তরুলতায় সাজিয়ে তুলতেন।........স্বামী পরমানন্দ তাঁর কর্ম, তপস্যা ও ত্যাগময় অনাড়ম্বর জীবনের আলোকে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে কাছে টানতে পেরেছিলেন।

স্বামী পরমানন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

স্বামী পরমানন্দের দেহের গড়ন ছিল চিকন, পাতলা, গায়ের রঙ ছিল কাল, দেহের উচ্চতা ছিল নাতিদীর্ঘ। সুঠামদেহী বা সুপণ্ডিত বা সুবক্তা বলে তাঁর পরিচিতি ছিল না। কিন্তু অন্য কয়েকটি দিকে তিনি ছিলেন ভরপুর। কষ্ট সহিষ্ণুতা, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, দেশভক্তি, সাংগঠিক দক্ষতা, অন্তর্মুখীনতা, আত্মপ্রচারবিমুখতা, সত্যনিষ্ঠা , প্রকৃতি প্রেম, পরদুঃখকাতরতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণাবলী তাঁর ভেতর অটুট ছিল। এই সব গুণাবলী পরহিতার্থে প্রয়োগ করেছেন দীর্ঘ ৭৫ বৎসর যাবৎ । তাই তিনি মহান। এই মহত্ত্ব অর্জনের পশ্চাতে কোন যাদুমন্ত্র নাই, কোন রহস্য নাই, কোন প্রচার কৌশল নাই, কোন অনুকম্পা নাই। তিনি কোন বই -পুস্তক রচনা করেন নি। কোন ভক্তিগীতি রচনা করেছেন বলে জানা নাই। তিনি তৈরী করে গেছেন একাধিক সেবাশ্রম। তাঁর তন- মন-ধন শুধু পরহিত তরে।

রোগ-শোক, অন্তিম কাল

বালক দ্বারকানাথ শৈশবে পিতৃহারা হন, যৌবনে মাতৃহারা হন। আশ্রমিক জীবনের প্রারম্ভে নোয়াখালীতে সুরেশ মহারাজ লোকান্তরিত হন, তাতে দ্বারকানাথ তীব্র ব্যথা অনুভব করেছিলেন। অতঃপর বহু আশ্রমে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। বহু ভক্ত- শিষ্যের ও স্বামীজীদের সাথে কাজ করেছেন। তাঁর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না ।

তাঁর পাত্‌লা দেহটি ব্যাধিমন্দির ছিল না। কিন্তু অতিরিক্ত ও অনবরত পরিশ্রমে প্রৌঢ় বয়সে রোগে আক্রান্ত হয়ে যান। আগরতলাতে আসার পর, আমতলীতে আশ্রম গড়ার সময় কয়েক বৎসর খুব পরিশ্রম করেছিলেন। তখন অসুস্থ হয়ে যান। কিছু দিন

আগরতলাতে সরকারী চিকিৎসালয়ে ভর্তি করানো হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে মূত্রাশয়ে পাথর ধরা পড়ল, চিকিৎসার জন্য কলিকাতাতে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে নেওয়া হল। কিন্তু অস্ত্রোপচারের জন্য নির্ধারিত দিনের আগেই পাথর গলে গেল।

বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, পরিশ্রমের চাপে ক্লান্ত স্বামীজীকে ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে আগরতলাতে গোবিন্দ বল্লভ হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। প্রায় তিন সপ্তাহ রইলেন চিকিৎসালয়ে। আশ্রমের টানে থাকতে পারেন না আবদ্ধ ঘরে। আশ্রমে আনা হল। ১৯৯৮ সাল কোন মতে অতিবাহিত হল।

১৯৯৯ সাল সমাগত। ৮ই জানুয়ারীতে দেহের অবস্থার দ্রুত অবনতি স্পষ্ট হল। তৎসত্ত্বেও বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎযাপন করলেন। ভক্ত সমাবেশ দেখে খুব পরিতৃপ্তি প্রকাশ করলেন। অবশেষে ১৩ই জানুয়ারী ১৯৯৯ সনে রাত্রি এগারটার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ❑

স্বামী অখন্ডানন্দ গিরি মহারাজ

শ্রীমৎ স্বামী অখন্ডানন্দ গিরি মহারাজ পূর্ব্ব বাঙলার ভুলুয়া রাজ্যে ১৩২০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে শ্রী পঞ্চমী তিথিতে (ফেব্রুয়ারী ১৯১৩খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাক্তন নাম অধীর দাসশ্রীমন্তরায়। "দাসশ্রীমন্তরায়" - হল পদবী । এই ধরণের পদবী বঙ্গদেশে খুব কম শুনা যায়। ইহাদের আদি পুরুষ ছিলেন মিথিলা বাসী ধনাঢ্য জমিদার। ভুলয়ার রাজবংশের সহিত মিথিলার এই জমিদার বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল । ১২০৪খৃষ্টাব্দে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন রাজ্যচ্যুত হন ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজী কতৃর্ক, এদিকে পূর্ব্ব প্রান্তে স্থাপিত হয় ভুলুয়া নামক হিন্দু রাজ্য। ভুলুয়ারাজ্য পরবর্তীকালে পাঠান, মোঘলের আক্রমণে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে নি। অতঃপর বৃটীশ আমলে নোয়াখালী নামে পরিচিত হল।

হেমন্ত দাসশ্রীমন্তরায় ও সৌদামিনী দেবী হলেন অধীর -এর পিতা -মাতা। হেমন্তের দুই পুত্র এবং দুই কন্যা । অধীর সর্ব কনিষ্ঠ। অধীর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে কলিকাতায় গিয়ে রিপন কলেজে ভর্ত্তি হন। কলিকাতাতেই অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে এসে পড়াশুনা ছেড়ে দেশমাতৃকার সেবায় লেগে যান। অনুশীলন সমিতির অজিত মুখোপাধ্যায়, নগরবাসী রায় এবং প্রফুল্ল সেন প্র মুখ কার্যকর্তাদের সহিত অধীরের সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৩০ এর ১৮ই এপ্রিল বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে সরকারী অস্ত্রাগার লুন্ঠন করেছিল। অধীর তাতে যোগ দেন নি, কিন্তু হরিহর দত্ত, বিজন ঘোষ প্রমুখ কার্যকর্তাদের সহিত সম্পর্ক ছিল অধীরের। সে-কালে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম, বিপদসঙ্কুল।

অতঃপর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পর, অধীরের জীবনের তৃতীয় পর্ব শুরু হল। অশান্ত, অস্থির, অনিশ্চিত, অধ্যায়ের অবসান করে, শান্ত, সমাহিত, সাধনপথ স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন। জন্মভূমির নিকটেই প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র সীতাকুন্ড। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই তীর্থে ভোলাগিরি আশ্রম আছে। ভোলাগিরি আশ্রমের স্বামী গৌরানন্দ গিরি মহারাজ দীক্ষা দেন অধীরকে। পরে সন্ন্যাস দেন-স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অখন্ডানন্দ ছিলেন সীতাকুন্ডে।

১৯৪৮ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ছিলেন হরিদ্বারে ভোলাগিরি আশ্রমে। ১৯৯১ সালে চলে আসেন ত্রিপুরায়, আগরতলার কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে আমতলী নামক জনপদে, ভোলাগিরি আশ্রমে।

সমাজ সেবায় তাঁর রুচি ছিল বরাবরই। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে, কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে, গরীব গৃহহীনকে, উদ্বাস্তুদিগকে তিনি সেবা করেছেন। শিয়ালদহে যখন হাজার-হাজার হিন্দু উদ্বাস্তু পথে-ঘাটে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, তখন হরিদ্বার থেকে ভোলাগিরি আশ্রমের সাধুরা সেবা করতে আসেন। অখন্ডানন্দ সেই দলে ছিলেন।

সারা ভারত ঘুরেছেন তিনি । ভারতের প্রায় সব কয়টি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র দর্শন করেছেন। দুর্গম হিমালয়ে যেমন গেছেন, তেমনি সুদুর রামেশ্বরম্, কন্যাকুমারী ইত্যাদি দেখেছেন।

বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ (শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, কল্প), রামায়ণ, মহাভারত, ষড়দর্শন (ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা), বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন পড়েছেন তিনি। হরিদ্বারে ভোলাগিরি আশ্রমের তরুণ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের এসব পড়াতেন।

আশ্রমের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইহার ব্যবস্থাপক এক বিশেষ নামে পরিচিত। আশ্রমিক পরিভাষা অনুযায়ী ইনি কুঠারী গিরি নামে অভিহিত। সততা,কর্মকুশলতা, প্রভৃতি গুণের অধিকারী তরুণ সন্ন্যাসী এই পদ পান। অখন্ডানন্দ হরিদ্বারে এই পদে দীর্ঘদিন ছিলেন।

স্বামিজীর গায়ের বঙ শ্যামবর্ণ,গড়ন পাতলা, উপরিধানে গেরুয়া পোশাক, মুন্ডিত মস্তক, আহার নিরামিষ,উচ্চতা ৫´৩˝। অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামীজি জীবনের শেষ দিন গুলো ত্রিপুরায় সাধন-ভজন করে কাটাতে চান। ❑

ত্রিবেণী সাধু

ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত কিল্লাছড়া নামে একটি গ্রাম আছে। বিলোনীয়া নগর থেকে দক্ষিণে-পূর্ব্বে সারাসীমা, সোনাইছড়ি প্রভৃতি গ্রামের আশে-পাশেই কিল্লাছড়া। ঐগ্রাম নিবাসী হরিমোহন দেববর্মণ ছিলেন প্রভাবশালী গৃহস্থ। তাঁর স্ত্রীর নাম রবিদি দেববর্মণ। এই দম্পতির চার পুত্র, পুত্রদের নাম হল ত্রিবেণী, পবন কুমার, বৈকুন্ঠ এবং সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্র হলেন গবেষক, লেখক এবং আগরতলা নিবাসী সরকারী কর্মচারী।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রিবেণী (আনু.১৯১১-১৯৮৭ খৃঃ) ছিলেন গৃহী, তিনপুত্র এবং এক কন্যার পিতা এবং বৈষ্ণব। তিনি লম্বা চুল রাখতেন, তুলসীমালা পরিধান করতেন, রাধাকৃষ্ণের বিগৃহকে নিত্য পূজা দিতেন। তিনি সুললিত কন্ঠে ভজন কীর্তন করতেন। কীর্ত্তনীয়া হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল সমগ্র বিলোনীয়া, খন্ডল এবং নোয়াখালীতে। বাড়ীর নিকটেই আখড়া স্থাপন করেছিলেন এবং বৈষ্ণব সেবা দিতেন তিনি। বৎসরে অন্ততঃ একবার ত্রিপুরী, বাঙালী বৈষ্ণবরা সেই আখড়ায় মিলিত হয়ে সারা রাত ভজন কীর্তন করতেন এবং অন্নপ্রসাদ একসাথে বসে ভোজন করতেন। কখনো-কখনো তিনি দুই-চার জন বৈষ্ণব মিলে সারা রাত ঢোলক বাজাতেন, বাউল গান গাইতেন। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ পাঠ করতেন। তাঁর পাঠ শুনার জন্য ভক্তদের সমাগম হত। তাঁর অনুজ পবনকুমার ছিলেন উৎকৃষ্ঠ পাঠক, তাঁর ছিল অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান। উৎকৃষ্ট ঢোলক-বাদক এবং কীর্ত্তনীয়া হিসাবে ত্রিবেণী সাধুকে খন্ডলের বৈষ্ণব সমাজ প্রায়ই নিমন্ত্রণ করত। তিনি যখন উদাত্ত কন্ঠে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে, কীর্তনের আসরে, ভক্তিগীতি গাইতেন, তখন বহুলোক সমাগম হত। হৃদয়ের দুয়ার খুলে এমন গান খুব কম লোকেই গাইতে পারতেন। ❑

শ্রীল উদয়ানন্দ গোস্বামী প্রভুপাদ

সমতল ত্রিপুরাতে, মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে, চাঁন্দপুরের নিকটে গুলিসা নামক গ্রাম-নিবাসী কামিনীকুমার অধিকারী ও ফুলদাসুন্দরী অধিকারী নামক ব্রাহ্মণ দম্পতির অন্যতম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এক শিশু, যাঁর পিতৃদত্ত নাম হল উমেশচন্দ্র অধিকারী। উমেশের জন্মতিথি হল ২৪শে পৌষ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ।

কামিনীকুমার ছিলেন গৃহী-সাধক। যজন-যাজন ছিল তাঁর কৌলিক বৃত্তি। কামিনীকুমার ও ফুলদাসুন্দরী হলেন ছয় জন পুত্র -কন্যার পিতা-মাতা। তাঁদের নাম হল যথাক্রমে — সুরেশ, যোগেশ, পরেশ, উমেশ, সাধনা ও নরেশ। এই ছয়জনের মধ্যে উমেশ পরবর্তীকালে উদয়ানন্দ গোস্বামী নামে পরিচিত হন।

উমেশের শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন অতিবাহিত হয়েছে গ্রামের বাড়ীতে, পিতৃগৃহে। তিনি গ্রাম্য-পাঠশালাতে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে উমেশের কৈশোর ও যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশের পরিস্থিতি তখন স্বাভাবিক ছিল না। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্যে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের হাওয়া উমেশের গায়ে লেগেছিল।

উমেশের পারিবারিক পরিবেশ ছিল সাত্ত্বিক প্রকৃতির। পিতা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ; তাঁর ছিল অনেক শিষ্য। তাই তিনি কামিনীকুমার গোস্বামী — এই নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। এই অনুকূল পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত উমেশ এই যৌথ পরিবারের চতুর্থ পুত্র হওয়াতে, পারিবারিক দায়িত্বভারে ভারাক্রান্ত ছিলেন না। তিনি গান-বাজনা, পালাগান, কীর্তন, ঢপযাত্রা প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকতেন, এসবে অনাবিল আনন্দ পেতেন। নিমাই সন্ন্যাস পালা বাংলার জনমানসে করুণরস সঞ্চার করে প্রবল আবেগ জাগাত। উমেশ অভিনয় করতেন বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায়, ক্রমেই অভিনয় উমেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল, বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্মবেদনা উমেশের মর্ম স্পর্শ করল। উমেশ হলেন ঘর ছাড়া।

অনতিদূরে কোম্পানীগঞ্জে ছিল শ্রীশ্রী চৈতন্য আখড়া। সেই আখড়াতে কয়েকবৎসর অবস্থান করেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবিভাজন ও দাঙ্গাহাঙ্গামা বশতঃ দেশত্যাগী হতে বাধ্য হলেন। আশ্রয় নিলেন পূর্ব প্রান্তস্থিত পার্বত্য ত্রিপুরাতে। আগরতলা থেকে কয়েক ক্রোশ পূর্বদিকে অবস্থিত তেলিয়ামুড়া নামক জনপদে গড়ে তুলেন এক আশ্রম। ইহার নাম হল শ্রীশ্রী চৈতন্য আশ্রম। ইহার স্থাপনাকাল হল ১২ই চৈত্র, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ।

তাঁর স্থাপিত আশ্রমে নানাবিধ উৎসব পালিত হয়, যেমন — নিত্যসেবা, একাদশী ব্রত, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসপূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা প্রভৃতি। উমেশচন্দ্রের আশ্রমিক নাম হল শ্রীল উদয়ানন্দ গোস্বামী প্রভুপাদ। ভাল সংগঠক বলে, যুগের উপযোগী সমাজ সংস্কারক বলে, সমাজসেবক বলে, সুবক্তা বলে, বিদগ্ধ পাঠক বলে দেশজোড়া খ্যাতি নাই উদয়ানন্দ গোস্বামীর। কিন্তু তাঁর অখ্যাতি ও কুখ্যাতি নাই। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। কঠোর পরিশ্রম করে, বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষা করে তিলে-তিলে আশ্রম গড়েছেন। ভক্তদের নিকট শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন বলেই, ভক্ত-শিষ্যরা আশ্রমের জন্য দান-দক্ষিণা দিয়েছেন।

উদয়ানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি হল শনিবার, ৮ই চৈত্র, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ২৩শে মার্চ, ১৯৯১খৃষ্টাব্দ। তখন ছিল শুক্লপক্ষ। তাঁর তিরোধানের আগের দিন ছিল বাসন্তীপূজা, পরের দিন ছিল রামনবমী। তাঁর দেহত্যাগের পর, তেলিয়ামুড়াস্থিত আশ্রমের কাজ দেখাশুনা করছেন শ্রীমতী বাঞ্ছারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর আশ্রমিক নাম হল মনোরমা গোস্বামী। তাঁকে সহায়তা করছেন রামানন্দ দাস নামক সেবক। ❑

যোগানন্দ গিরি মহারাজ

সমতল ত্রিপুরার কুমিল্লাতে ঘাসিগ্রাম নামক পল্লীতে আনুমানিক ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন সুশীল চন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর পিতা-মাতার নাম নবীন চন্দ্র চক্রবর্তী ও গগনতারা চক্রবর্তী। সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী উত্তরকালে যোগানন্দগিরি মহারাজ নামে পরিচিত হন।

নবীনচন্দ্র ও গগনতারা ছিলেন ৮ জন পুত্র-কন্যার পিতামাতা। তিনপুত্র ও পাঁচ কন্যার পিতা নবীনচন্দ্র কোন প্রকারে যাজনিক বৃত্তি দ্বারা সংসার নির্বাহ করতেন। সৎ, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। সুশীলের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে ঘাসিগ্রামে। গ্রাম্য পাঠশালাতে পড়াশুনা। কিন্তু পড়াশুনায় বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। বিদ্যালয়ের স্তর অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি। ভাই-বোনদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ সুশীল অতঃপর সাধন-ভজন করে বাকী জীবন কাটাবেন বলে স্থির করলেন।

কিন্তু কোথায় যাবেন ? কোন আশ্রমে থাকবেন ? কাকে গুরু বলে বরণ করবেন ? কোন্ পথ শ্রেয় ? এদিকে দেশে দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে বিপন্ন পরিবারকে অনিশ্চিয়তার মধ্যে ফেলে কিভাবে একলা অন্যত্র সাধন-ভজনে যাবেন ? এই সব প্রশ্ন ও সমস্যা বালক সুশীলকে বিব্রত করত। পরিস্থিতির চাপে গোটা পরিবার উঠে আসতে বাধ্য হল; তারা এল ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজধানী উদয়পুরে।

ত্রিপুরার মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ধর্মপত্নী মহারাণী প্রভাবতী দেবী (১৮৯০-১৯৭১ খৃঃ) ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে আগরতলার উত্তর প্রান্তে কুঞ্জবনে এক খণ্ড ভূমিদান করেন। একাজে সহদেব বিক্রম কিশোর সহযোগিতা করেছিলেন। সেই ভূমিতে নির্মিত হল শ্রীশ্রী ভোলাগিরি আশ্রম। এই আশ্রম গড়ার কাজে প্রথম দিকে কঠোর পরিশ্রম করেন স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজ (১৮৮৮-১৯৭৫), হরানন্দ গিরি মহারাজ, অক্ষরানন্দ গিরি মহারাজ এবং বিমলানন্দ গিরি মহারাজ। ত্রিপুরাতে ভোলাগিরি আশ্রম গড়ার উদ্যোগ পর্বে সুশীল চক্রবর্তী সাধারণ সেবক ও কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। স্বামীজীদের সাথে কঠোর কায়িক শ্রম করতেন। মাটি কাটা, গৃহ নির্মাণ, দান সংগ্রহ, রান্না, পূজা, শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ, ঘর ঝাড়া-মোছা প্রভৃতি সব কাজ করতে হত।

ক্রমেই সুশীল চক্রবর্তী ভোলাগিরি আশ্রমের সাথে একাত্ম হয়ে যান। স্বামীজীদের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়, সাহচর্য, সহমর্মিতা বেশী প্রভাবশালী হয়েছিল। এক ঘর ছেড়ে,

আরেক ঘরে গিয়ে পেয়েছেন স্নেহ-মমতা, আদর-যত্ন। বিনিময়ে সেই ঘরকেও দিয়েছেন যথাসাধ্য সেবা।

ভোলাগিরি আশ্রমের হরানন্দ গিরি মহারাজ হলেন সুশীল চক্রবর্তীর দীক্ষাগুরু। গুরুর সাথে পরিচয় আগরতলাতে, কুঞ্জবনে, ভোলাগিরি আশ্রমে। হরানন্দ গিরি মহারাজ এবং সুশীল চক্রবর্তী একসাথে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আশ্রমগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। তখন থেকেই একটি স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজীবন ব্রহ্মচারী সুশীল চক্রবর্তী যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময় দিয়েছেন কুঞ্জবনস্থিত ভোলাগিরি আশ্রম নির্মাণের কাজে। সংযম, সাধনা ও সেবা প্রভৃতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সুশীল চক্রবর্তী দীক্ষান্তে হলেন যোগানন্দ গিরি মহারাজ নামে পরিচিত।

স্বল্পভাষী, কড়া মেজাজের, নিষ্ঠাবান, সরল মন বিশিষ্ট যোগানন্দ গিরি মহারাজ সময় কাটাতেন পূজাপাঠ, ও সাধন-ভজন নিয়ে। গান বাজনা করা, হই-চই করা, আড্ডা দেওয়া, বৃথা গল্প করা, বক্তৃতা দেওয়া, ভ্রমণনেশা ইত্যাদি তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল।

যোগানন্দ গিরি মহারাজ ত্রিপুরার আশ্রম ছেড়ে চলে যান। শেষ বয়সে তিনি হরিদ্বারে ভোলাগিরি আশ্রমে সাধন ভজন করে দিনাতিপাত করতেন। তিনি ৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ❑

শ্রীমৎ স্বামী দর্শনানন্দ মহারাজ

শ্রীমৎ স্বামী দর্শনানন্দ মহারাজ জন্ম গ্রহণ করেন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত ভৈরব নামক জনপদের অন্তঃপতিজামালপুর নামক গ্রামে। তাঁর জন্মসন হল ১৩২২ বাংলা (১৯১৫ খৃঃ)। তাঁর পূর্ব নাম গণেশ চন্দ্র ভৌমিক। তাঁর পিতা-মাতার নাম কিশোর চন্দ্র ভৌমিক ও সত্যবতী ভৌমিক। ইহারা দেবনাথ নামক বিখ্যাত সম্প্রদায়ভুক্ত ও শিবোপাসক। দর্শনানন্দ হলেন স্বামী দয়ালানন্দের খুড়তুতো ভাই।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে যে সপ্তদশ নৌকারোহী ময়মনসিংহস্থ গৃহত্যাগ করে আখাউড়াতে গুরুধামে এসেছিলেন, পনের বৎসর বয়স্ক গণেশ, তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেই সপ্তদশ তীর্থযাত্রীরা অবশেষে ১৩৪১ বাংলার ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে আগরতলায় আসেন। এতে গণেশের পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়েছে। তিনি আগরতলার উমাকান্ত বিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বামী দয়ালানন্দ কর্তৃক স্থাপিত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনা কুটির-এর মধ্যেই ছিল সংস্কৃত টোল। টোলটির নাম আর্য সংস্কৃত বিদ্যামন্দির। ইহার শিক্ষাগুরু ছিলেন বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ। সেখান থেকেই ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে দর্শনানন্দ ব্যাকরণতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হন। এবং ঐ টোলের শিক্ষক হন।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের অন্যতম শিষ্য হলেন দেবেন্দ্র মজুমদার, দেবেন্দ্র মজুমদারের শিষ্য হলেন দেবেনানন্দ। দেবেন্দ্র মজুমদার থাকতেন কলিকাতার এন্টলীতে, দেবেনানন্দ থাকতেন পূর্ব বাংলার আখাউড়াতে। এই দেবেনানন্দকে গুরুরূপে বরণ করে দয়ালানন্দ সপরিবার গৃহত্যাগ করেন ১৩৩৬ বাংলাতে। দর্শনানন্দের গুরুদেব হলেন এই দেবেনানন্দ।

স্বামী দয়ালানন্দের নেতৃত্বে দর্শনানন্দ ও অন্যান্য স্বামীজিরা দান-দক্ষিণা সংগ্রহ করে আশ্রমের সামগ্রিক কল্যাণে কাজ করেছেন দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর (১৯৩৮-১৯৬২ ইং)। এরপর ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে দয়ালানন্দ ত্রিপুরা ছেড়ে জলপাইগুড়ি চলে যান। ফলে আগরতলাস্থ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনা কুটির শ্রীহীন হয়ে গেল। বিশাল কর্মযজ্ঞের নেতৃত্ব দেবার কেউ রইল না। কনিষ্ঠ স্বামীজিরা যে যার পথ দেখলেন। একতা, সংহতি বিনষ্ঠ হল। আশ্রম পাহাড়ায় রইলেন স্বামী অদ্বৈতানন্দ।

সেই ভাঙা হাটে স্বামী দর্শনানন্দ আপন গতিতে একলা চলার পথ বেছে নিলেন। আশ্রমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি ভক্তদের বাড়ীতে দিন কাটান। ভিক্ষালব্ধ চাউল

টাকা পয়সা ইত্যাদি কিছুটা নিজে ব্যবহার করেন, কিছুটা দীন দুঃখীর জন্য দান করেন। ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা গোবিন্দ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করে প্রায় ৯০ জন অভাবগ্রস্থ লোককে চাকুরী পাইয়ে দিয়েছেন।

স্বামী দর্শনানন্দের চেহারা পাতলা, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে গৈরিক বসন। শান্ত, নিরীহ, মৃদুভাষী দর্শনানন্দ স্বামীজিকে আগরতলার রাজপথে প্রায়ই দেখা যায়। উত্তর ভারতের কোন তীর্থে তীর্থবাসী হতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার মাটি ও মানুষ-এর আকর্ষণে আবার ফিরে আসেন। স্বামী দয়ালানন্দের মধ্যে প্রশাসনিক দক্ষতা, নেতৃত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক জনসেবা, গঠনমূলক পরিকল্পনা, উদ্যম প্রভৃতি গুণাবলী ছিল। সে সব গুণাবলী দর্শনানন্দ স্বামীজির মধ্যে বিরল। ❑

রবিদাস ব্রহ্মচারী

উত্তর ভারতে জন্মগ্রহণ করে এবং ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করে জনৈক যুবক সুদূর ত্রিপুরায় আসেন এবং এখানেই অজ পাড়া গাঁয়ে আশ্রম করে বাকী জীবন কাটিয়ে দেন। ইনিই রবিদাস ব্রহ্মচারী। তাঁর জীবনী স্বল্পজ্ঞাত। আগরতলা নিবাসী ডাঃ প্রদীপ আচার্য নামক কৌতূহলী ভদ্রলোক যৎসামান্য তথ্য সংগ্রহ করে পত্রিকাতে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ভক্তশিষ্যরা বা তিনি নিজে কোন জীবনী লিখে রেখেছেন বলে মনে হয় না।

বরিদাসের জন্ম কাশীধামে। তিনি প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। তিনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন; তাঁর এক পুত্র জীবিত থাকতে পারে। ত্রিপুরাতে তিনি একাই এসেছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যু দিবস হল জানুয়ারী ১৯৯৭ খৃঃ। তিনি প্রায় ৮০ বৎসর আয়ু পেয়েছিলেন। এই হিসেবে তাঁর জন্মসন হবে আনুমানিক ১৯১৭ খৃঃ।

বিষয়-বৈরাগ্য বশতঃ তিনি আনুমানিক ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে গৃহত্যাগী হন। দশ বৎসর নানা স্থানে পর্যটন করেন। কোথাও মন টিকে না। অবশেষে কামরূপ কামাখ্যা তীর্থ ও ত্রিপুরার ত্রিপুরেশ্বরী দর্শনে এলেন। ইহা ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। এখানে এসে, এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর পছন্দ হল। ঘুরতে-ঘুরতে গেলেন ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তে, সাব্রুম মহকুমাতে। আগরতলা থেকে সাব্রুম রাজপথের উপরেই এবং সাব্রুম নগরের কয়েক মাইল উত্তরে মনু বাজার নামক জনপদ অবস্থিত। এখানে বাজার ও বিদ্যালয় আছে, বিদ্যালয়ের পাশ দিয়েই পশ্চিম দিকে গেলেই লাল টিলা নামক পাহাড়ী গ্রাম আছে। সেখানেই এলাকাবাসীর সহায়তা নিয়ে ধীরে-ধীরে স্থাপন করলেন এক পর্ণ কুটির।

তাঁর গুরুর নাম রঙ্গদাস ব্রহ্মচারী। গুরুর আর কোন পরিচয় জানা নেই। কবে কোথায়, কিভাবে দীক্ষা নিলেন জানা যায় নি। দীক্ষান্তে গুরু প্রদত্ত নাম হল রবিদাস ব্রহ্মচারী। বরিদাসের শিষ্য জুটে যায় ত্রিপুরাতে। শিষ্য সংখ্যা নিতান্ত কম। গুরু শিষ্য মিলে আশ্রমে আরো ঘরবাড়ী বাড়ানো হল। দেবালয়, যাত্রীনিবাস, পাঠশালা ইত্যাদি করা হল। কিন্তু রবিদাসের দেহান্তের পর আশ্রমকে পরিচালনা করার মতো উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ❑

শ্রীহরি বাবাজী

পূর্ব বঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমাধীন মাধবপুর থানার অন্তর্গত ভাণ্ডারুয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এক শিশু, যিনি প্রথম জীবনে হরিধন দেবনাথ নামে এবং উত্তরকালে শ্রীহরি বাবা নামে খ্যাত হন। তাঁর পিতা-মাতার নাম কৃষ্ণচরণ ও স্বর্ণময়ী। তাঁর জন্মসন হল আনুমানিক, শুক্রবার, শ্রাবণ মাস, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ (১৯১৮ খৃঃ)

কৃষ্ণচরণ ও স্বর্ণময়ী ছিলেন গৃহীভক্ত এবং ৬ সন্তানের পিতা মাতা। তাঁদের নাম হল যথাক্রমে হরধন, ঠাকুরধন, হরিধন, মণি, রামধন ও সুরময়ী। তৃতীয় পুত্র হরিধন হলেন শ্রীহরি বাবাজী। তাঁর শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়বয়স অতিবাহিত হয়েছে জন্মভূমি শ্রীহট্টে। তিনি রামসুন্দর বসাক প্রণীত বিখ্যাত **বাল্যশিক্ষা** নামক পুস্তব বাল্যবয়সে অধ্যয়ন করেছেন। এর অতিরিক্ত লেখাপড়া নানা কারণে হয় নি। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহিত হন, স্ত্রীর নাম প্রেমদাময়ী দেবী। শ্রীহরিধন ও শ্রীমতী প্রেমদাময়ীর একমাত্র কন্যা, নাম পরশমণি। পরশমণিকে বিবাহ্ দেওয়া হয়েছে; স্বামীর নাম শ্রী যামিনী দেবনাথ।

বাক্‌সিদ্ধ, দিব্যদ্রষ্টা শ্রীমৎ স্বামী হংসরাজ সোহংমনি বাবা (১৮৯৪-১৯৭৯ খৃঃ) পূর্ববঙ্গের পূর্বপ্রান্তে মোগড়া নামক স্থানে মহাশ্মশানে দীর্ঘদিন সাধনা করেছিলেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিস্থিতি হলে পর, তিনি ত্রিপুরায় চলে আসেন। মোগড়ায় যখন হংসরাজ সোহংমণি বাবা সাধনভজনে রত, তখন হরিধন দেবনাথ দীক্ষাপ্রার্থী হন। তখন হরিধনের বয়স পঁচিশ বৎসর। হংসরাজ সোহংমণি বাবা ছিলেন সুরেন্দ্র সাধু নামে অধিক পরিচিত। তিনি মৌনব্রত ও আসনযোগ এই দুইটি প্রণালীর উপর খুবই গুরুত্ব দিলেন। তৎকালে তাঁর দুই সুযোগ্য শিষ্য ছিল, নাম হল তারিণী সাহা (আঃ ১৯০৬-১৯৭১ খৃঃ) এবং বীরেন্দ্র দেবনাথ (আঃ ১৯০৮-১৯৭৬ খৃঃ)। বীরেন্দ্র দেবনাথ সাধন জীবনে যোগীরাজ বিবেকানন্দ নামে খ্যাত ছিলেন। সুরেন্দ্র সাধু নিজে দীক্ষা না দিয়ে, যোগীরাজ বিবেকানন্দের নিকট পাঠালেন কৃপা প্রার্থী হরিধনকে। সুরেন্দ্র সাধুর নির্দেশ শিরোধার্য করে হরিধন গেলেন যোগীরাজের সন্নিধানে। যোগীরাজ কৃপা করে ভক্তকে আশ্রয় দিলেন, দীক্ষা দিলেন এবং যথাসময়ে সন্ন্যাস দিলেন। অতঃপর তিনি বাবা শ্রীহরি নাম প্রাপ্ত হলেন।

বিগত ২৯. ১. ১৯৯৭ দিনাংকে যখন আগরতলাতে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দেবনাথ মহাশয়ের বাসভবনে এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, তখনও তাঁর দেহ সৌষ্ঠব বিদ্যমান। শ্যামলবর্ণ,

পাতলা গড়ন, ৬ ফুট উচ্চতা, দাড়ি, জটাজুট, রক্তিমবর্ণ বেশ ইত্যাদি মহাপুরুষ সুলভ লক্ষণ দর্শনীয়। সুরেন্দ্র সাধু আমিষভোজী ছিলেন। তাঁর পরম্পরা আমিষভোজী।

১৯৭০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্থানে ভয়াবহ্ সংগ্রাম হয়েছিল। সেই্ সময় শ্রীহরি বাবা সপরিবার চলে আসেন ত্রিপুরাতে। ত্রিপুরাতে এসে প্রথমে প্রায় এক বৎসর ছিলেন খোয়াই্ মহকুমাতে। অতঃপর চলে আসেন আগরতলার উত্তরে সিধাই্ নামক জনপদে। সেখানে ঘর-বাড়ী করে বসবাস করছেন। ❑

কুমার বলিনকিশোর

ত্রিপুরার রাজপরিবারের কুমার বলীন কর্তা ঘটনাক্রমে গৃহত্যাগী হয়ে সাধু হন। তাঁর জীবনের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য (১৮৯৬-১৯০৯ খৃঃ) ছিলেন দশজন পুত্র-কন্যার পিতা। তাঁর পুত্রদের নাম হল — বীরেন্দ্র কিশোর, ব্রজেন্দ্র কিশোর, রণবীর কিশোর, নরেন্দ্র কিশোর, ললিত কিশোর এবং নরোত্তমকিশোর। চতুর্থ পুত্র নরেন্দ্রকিশোর। নরেন্দ্রের তিনপুত্র, নাম — বলিনকিশোর, চৈতন্যকিশোর এবং রামেন্দ্রকিশোর। মহারাজ বীর বিক্রম এবং বলিনকিশোর হলেন সম্পর্কে ভাই। বীর বিক্রমের জন্ম ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে; বলিনের জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে।

বলিনকিশোর যুবাবয়সে মহারাজ বীর বিক্রমের রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি সেনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তাঁর দায়িত্বে ছিল অস্ত্রভাণ্ডার। এমন সময় অস্ত্রভাণ্ডার থেকে একটি বন্দুক চুরি হয়ে যায়। মহারাজ স্বাভাবিকভাবেই ভাণ্ডারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, যথেষ্ট সাবধানতার অভাবের জন্য ভাণ্ডারীকে দায়ী করেন। ইহাতে মর্মাহত ভাণ্ডারী বলিনকিশোর চাকুরী থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্ত নেন। এখানেই শেষ হয় নি। সমস্ত পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, আগরতলা থেকে বহু দূরে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। ত্রিপুরার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ডম্বুর নামক তীর্থে, প্রাকৃতিক পরিবেশে, গোমতী নদী তীরে সাধন ভজন করে তিনি বাকী জীবন অতিবাহিত করেছেন বলে শুনা যায়। ❑

শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ

শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত জামালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তিথি হল ১৩২৫ বাংলার ২৬শে ফাল্গুন, ত্রয়োদশী তিথি (১৯১৯ খৃঃ)। ১৩২৬ বাংলার ৭ই আশ্বিন (১৯১৯ ইং) ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় ভয়াবহ ঝড়-তুফান হয়েছিল। সেই বিপর্যয় থেকে এই শিশু অলৌকিক ভাবে রক্ষা পান। তাঁর প্রাক্তন নাম মুকুন্দ ভৌমিক। তাঁর পিতা-মাতার নাম রাজচন্দ্র ও যজ্ঞেশ্বরী। রাজচন্দ্রের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। শিবচরণ অর্থাৎ স্বামী দয়ালানন্দ হলেন সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র; দয়ালানন্দ হলেন অদ্বৈতানন্দের অগ্রজ।

১৩৩৬ বাংলায় ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে যে - সপ্তদশ নৌকারোহী স্বেচ্ছায় গৃহ ছেড়েছিলেন, বালক মুকুন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তখন বালকের বয়স ১২ বৎসর মাত্র। ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করায় বালকের পড়াশুনা বিঘ্নিত হল। দশম শ্রেণীতে উঠে পড়াশুনা ক্ষান্ত দিলেন।

অগ্রজ দয়ালানন্দকে অনুসরণ করে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-প্রশিষ্য দেবেনানন্দ মহারাজ থেকে দীক্ষা নেন বালক মুকুন্দ। দীক্ষান্ত নাম হল অদ্বৈতানন্দ। অগ্রজ দয়ালানন্দের সুযোগ্য নেতৃত্বে সপ্তদশ নৌকারোহী অবশেষে আগরতলায় ঠাঁই নিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করলেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনা কুটীর। পরবর্তী ২৫ বৎসর (১৯৩৮-১৯৬২ ইং) এই আশ্রম জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। ত্রিপুরা, অসম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ থেকে প্রতি বৎসর দান দক্ষিণা সংগ্রহ করে আনতেন এই আশ্রমের সন্ন্যাসীরা। সংগৃহীত অর্থে খরিদ করা হল দুটি খামার, গড়া হল ছাত্রাবাস, অতিথিশালা, দেবালয় ও চিকিৎসালয়; কাটা হল পুকুর, আয়োজন হল পূজাপার্বণের।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপ্রমুখ ছিলেন স্বামী অদ্বৈতানন্দ। সমস্ত কেনাকাটা, হিসাব রক্ষা, রান্না, অতিথি আপ্যায়ন, চল্লিশ জন ছাত্রের খাওয়া-পড়া, চিঠিপত্র লিখন ইত্যাদি অফুরন্ত কাজ করতেন ও করাতেন অদ্বৈতানন্দ।

স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি ১৯৬৩ খৃঃ থেকে ১৯৬৫ খৃঃ পর্যন্ত এই আশ্রমের উপর নানা অভিযোগ এনে আশ্রমিকদের মনোবল ভেঙ্গে দিল। বিচারালয়ে তাদের অভিযোগ অসত্য প্রমাণিত হল। কিন্তু এতে ব্যথিত দয়ালানন্দজী ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা ত্যাগ করে জলপাইগুড়ি চলে গেলেন এবং সেখানে এক বড় আশ্রম নির্মাণ করেন। তাঁর দেখাদেখি

অন্যান্য স্বামীজিরাও চলে গেলেন। অনাথ ছাত্রাবাস বন্ধ হল। কর্মযজ্ঞে ভাটা পড়ল। বিদ্যালয়ের ভার সরকার নিল।

পুরাণে বর্ণিত ত্রিকালদর্শী এক বৃদ্ধ কাকের নাম ভূষণ্ডি। ধলেশ্বরস্থিত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনা কুটীর-এর জন্ম, উত্থান,পতন-এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত স্বামী অদ্বৈতানন্দ কিন্তু সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে আশ্রম ছাড়েননি। ভূষণ্ডির মতো এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মূল্যবোধের অবক্ষয়ে, গৃহদাহে, সোনারতরী ডুবে যাওয়ায়, বাগান শুকিয়ে যাওয়ায়, হাট ভেঙ্গে যাওয়ায় শোকে বিহ্বল। কিন্তু তাই বলে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারান নি। অন্যের প্রতি অন্তরের স্নেহ, মুখের হাসি, উপমাসহ প্রাঞ্জল প্রবচন আজও পাওয়া যায়, দেখা যায়, শুনা যায়। তিনি মণি মহারাজ নামে বেশী পরিচিত। ❑

সমতল ত্রিপুরায়, কমলাসাগর কালীবাড়ীর পশ্চিমে খৈরালা নামক গ্রাম-নিবাসী নিবারণচন্দ্র রায়-এর পুত্র হলেন অমূল্যরতন রায়। অমূল্যরতন-এর ডাক নাম হল খোকা রায়। ডাকনামেই তিনি বেশী পরিচিত। তাঁর জন্মদিন হল শুক্রবার, আশ্বিণ মাস, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ।

পিতামহ রমেন্দ্র রায় ছিলেন সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থ। রমেন্দ্র ছিলেন পাঁচ পুত্রের পিতা। পুত্রদের নাম হল যথাক্রমে নিবারণ, চিন্তাহরণ, প্রতাপ, বিহারীলাল এবং পূর্ণচন্দ্র। নিবারণের দুই পুত্র। তাঁদের নাম হল অমূল্যরতন ও বিধুভূষণ। অমূল্যরতনের তিন পুত্র, তাঁদের নাম হল জয়ন্ত, প্রশান্ত এবং সুশান্ত। অমূল্যরতনের পিতা নিবারণ চন্দ্র (আঃ ১৮৮৯-১৯৩৮ খ্রীঃ) এবং মাতা কাদম্বিনীবালা (আঃ ১৮৯৯ - ১৯২৭ খ্রীঃ) অল্প বয়সে মারা যান। বিধুভূষণের বয়স যখন সবে মাত্র ২১ দিন, তখনই কাদম্বিনীবালা মারা যান। বিধুভূষণকে লালন-পালন করেন চিন্তাহরণ ও তাঁর স্ত্রী হেমন্ত বালা। এই ভাবে বিধুভূষণ থাকেন কাকা-কাকীমার নিকট। অমূল্যকে নিয়ে যান কাদম্বিনীর পিতা দীনবন্ধু দেবরায়। দীনবন্ধুর বাড়ী ছিল ভৈরবপুরে। অমূল্যর জন্ম হয়েছিল মামার বাড়ীতে এবং পরে লালিত-পালিত হন মামার বাড়ীতেই।

অমূল্যরতনের শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন মামার বাড়ীতে অতিক্রান্ত হয়েছে। মাতুলালয়ে বসবাস করে লেখাপড়া শিখেছেন। মামা অতুলচন্দ্র দেবরায় ছিলেন স্থানীয় বিচারালয়ের পেস্কার। দাদু দীনবন্ধু-এর খুড়াত ভাই রমেশচন্দ্র দেবরায় ছিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। দাদু রমেশচন্দ্র, নাতি অমূল্যরতন। দাদু ও নাতি একই বিদ্যালয়ে যেতেন, দাদু পড়াতে যেতেন, নাতি পড়তে যেতেন। অমূল্যরতন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার অব্যবহিত পরেই চলে যান কলিকাতাতে। জীবিকার সন্ধানে কলিকাতা মহানগরে ব্যস্ত আছেন। জুটে গেল চাকুরী। নিয়োগপত্র পেলেন, যোগদান করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করছেন। নিয়োগ পত্র পাওয়ার দুইদিন পরেই তারবার্তা পেলেন যে, পিতা নিবারণ চন্দ্র মারা গেলেন। ইহা ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। পিতৃশ্রাদ্ধ করতে এলেন গ্রামের বাড়ীতে।

অমূল্যরতন চাকুরীতে যোগদান করেন ১লা জানুয়ারী ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ। অবসর

গ্রহণ করেন ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে। চাকুরীর শুরু কলিকাতাতে, শেষ নাগপুরে। টাইপ মেশিন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান রেমিংটন র‍্যাণ্ড হল তাঁর চাকুরীদাতা। মাত্র ৩০ টাকা বেতনে প্রবেশ, ১২০০ টাকা মাহিনাতে অবসর গ্রহণ। এই দীর্ঘ কর্মজীবনে (১৯৩৯-১৯৭৭ খ্রীঃ) তিনি কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য ও সততার জন্য পদোন্দতি পেয়েছেন, প্রশংসাপত্র পেয়েছেন। এছাড়া কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই, পাটনা, কানপুর, নাগপুর, জবলপুর, রায়পুর, প্রভৃতি মহানগরে কার্য উপলক্ষে প্রেরিত হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানকে তিনি অন্নদাতাজ্ঞানে ভালবাসতেন। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কখনো দলবাজী, সমিতিবাজী করেন নি। যত কম খরচে, যত কম সময়ে রুগ্ন যন্ত্রপাতিকে সারানো যায়, তার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি নাগপুরে বদলী হলেন। সেই থেকে অবসর গ্রহণ কাল পর্যন্ত নাগপুরকে কেন্দ্র করে, তিনি নানা স্থানে গিয়েছিলেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর নাগপুরেই রয়ে গেলেন। ফলে তিনি নাগপুরেই পরিচিত ও জনপ্রিয়। নাগপুরেই তিনি বিবাহ করেন ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তুষারিকা ঘোষ (আঃ ১৯২৬-১৯৮১ খ্রীঃ) নামক মহিলাকে।

চাকুরী ক্ষেত্রের বাইরে, বৃহত্তর সমাজ জীবনে খোকা রায়-এর অবদান সর্বাধিক। নাগপুরে বিভিন্ন সময়ে মিলে মোট প্রায় চার হাজার মৃতদেহ সৎকার করেছেন। অন্নপ্রাসন ও বিবাহে তিনি রান্নার কাজের দায়িত্ব নিতেন। রোগশয্যায় অগণিত রোগীর সেবা করেছেন। ১৯৩৯ থেকে ২০০২ সাল অবধি বাঙ্গালী সমাজ কর্তৃক আয়োজিত বিশাল দুর্গোৎসবে তিনি বিশেষ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ভবিষ্যতেও কাজ করার ঐকান্তিক আগ্রহ আছে। তাঁর বিশেষ সখ হল আরতিতে নাচগান করা, ঘুড়ি উড়ানো এবং ফুটবল খেলা। অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত ভাষায় বান্ধবের এক অতি উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা আছে। সেই সংজ্ঞার অন্যতম উদাহরণ হলেন খোকা রায়। ❑

শ্রী শচীন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারতমাতাকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে স্বাধীন করতে "মুক্তির মন্দির সোপানতলে" যাঁরা জীবন ও যৌবন উৎসর্গ করেছেন, শ্রী শচীন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম, অথচ অখ্যাত, অবহেলিত।

শচীন্দ্রবাবুর আদি নিবাস হল পূর্ব বাংলার এক বিখ্যাতগ্রামে। গ্রামের নাম বিদ্যাকূট, যেখানে ছিল প্রায় দুই শত টোল, যেখানে জন্মেছেন বহু পণ্ডিত, সাধক, স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর পিতার নাম উপেন্দ্র ভট্টাচার্য। উপেন্দ্রবাবু পেশায় ছিলেন চিকিৎসক; অসম-বঙ্গ লৌহবর্ত্মের সরকারী চিকিৎসক। উপেন্দ্রবাবুর পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ শৈলেন্দ্র ও তৃতীয় শচীন্দ্র হলেন মুক্তিসৈনিক। পারিবারিক সম্পর্কে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য বন সংরক্ষক শ্রী নরেশ ভট্টাচার্য-এর খুড়তুতু ভাই হলেন শচীনবাবু; আবার ত্রিপুরার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ তথা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ গোপাল ভট্টাচার্যের ভাগিনা হলেন শচীনবাবু। অকৃতদার শচীনবাবু এক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি কোন দিন।

শচীনবাবুর বাল্যজীবন, কৈশোর ও শিক্ষাজীবন কেটেছে বিদ্যাকূটে ও ঢাকায়। তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকার মিডফোর্ড থেকে এল. এম. এফ. নামক ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবনেই সমাজসেবায় যুক্ত হওয়ায় মাঝে-মধ্যে পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটে, "শ্রীঘরে" যেতে হয়, তাই আর পড়েন নি।

ছাত্র জীবনেই মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে নেমে পড়েন। প্রেরণাদাতা ছিলেন নিজ ঘরেরই অগ্রজ শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য ও নরেশ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, মধ্যে ও পরে মোট সাত বছর কারাবাস করেন তরুণ শচীন্দ্র। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও লাহোর —এই তিন স্থানে কারাগারে রয়েছেন এবং নানা রকম অত্যাচার সহ্য করেন। তরুণ শচীন্দ্র ছিলেন Secret Society of India -এর একনিষ্ঠ ও সক্রিয় সদস্য। ইহার অন্যতম কর্ণধার সতীন সেন ঢাকায় কারাগারে যক্ষারোগে মারা যান।

দেশসেবা করতে গিয়ে শচীন্দ্রবাবু যাঁদের সংগ ও সহযোগিতা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন নরেন দত্ত, সুকুমার দত্ত, সুকুমার ভৌমিক, ক্ষীরোদ সেন ও ইন্দ্র সেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর, পশ্চিমবঙ্গের কাকদ্বীপে যাওয়ার জন্য এই কয়জন

সমাজসেবক তৈরী হচ্ছিলেন, কথাবার্তা চলছিল। এমন সময় গদর দলের বিশিষ্ট নেতা দিবাকরজী বলেন যে, তোমরা পূর্ববঙ্গবাসী ও ত্রিপুরার নিকটবর্তী। ত্রিপুরা অনুন্নত, ত্রিপুরা তোমাদের পরিচিত, সেখানে তোমাদের আত্মীয় রয়েছে, কাজেই সেখানে গিয়ে কাজ কর। দিবাকরজীর কথায় তাঁরা ত্রিপুরায় এলেন। সুকুমার ভৌমিক এখানে এসে সমষ্টি উন্নয়ন মণ্ডলে সরকারী চাকুরী নেন। সুকুমার বাবু খবর দেন যে, জিরানিয়াতে একটি পার্বত্য পল্লীতে আশ্রম করার উপযুক্ত ভূমি পাওয়া যাবে। ব্রহ্মচারী নরেন দত্ত ছিলেন হারলুচ্যা নিবাসী শিক্ষিত সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। তিনি দুলু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে তিন কানি ভূমিদান পেয়ে আশ্রম ও গুরুকুল ছাত্রাবাস গড়েছিলেন। দেশ ভাগের পর সেই আশ্রম ছাড়তে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বাধ্য করল। সুতরাং ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার নিকটবর্তী হারলুচ্যা ছেড়ে তিনিও কলিকাতা যান। কলিকাতা থেকে ত্রিপুরার জিরানিয়ায় আসেন প্রথম এবং মোহনপুরে এক বিদ্যালয় গড়েন। কিছুদিন বাদেই ক্ষীরোদ সেন, শচীন্দ্র ভট্টাচার্য ও ইন্দ্র সেন এসে ব্রহ্মচারী নরেন দত্ত-এর সাথে হাত মেলান।

মোটামোটি ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ থেকে তথা ৫০৫৭ কলিযুগাব্দ থেকে এঁদের আন্তরিক চেষ্টাও কঠোর শ্রমে জিরানিয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে এক পার্বত্য পল্লীতে গড়ে উঠল সর্বোদয় আশ্রম। ত্রিপুরার প্রশাসনের কর্ণধার তখন শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ও সুখময় সেনগুপ্ত। তাঁরা এক বড় ভূখণ্ড আশ্রমের নামে দেবার ব্যবস্থা করেন। সেই আশ্রমেই দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, চরকা কাটার খাদি ও গ্রামোদ্যোগ ভবন হল।

শচীন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৫৫ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত একটানা ৪০ বৎসর সেই আশ্রমেই রয়েছেন। ৭৫ বৎসর বয়স্ক শ্রীশচীন্দ্রবাবু পাড়াপরশীর সুখদুঃখের সাথী। তাদের চিকিৎসা করেন রোগে, গীতা পাঠ করেন শ্রাদ্ধে ও হরিসভায়, পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে চাকরী দিয়েছেন অনেককে, রাস্তা নির্মাণ ও বিদ্যালয় নির্মাণ করিয়েছেন। আবার ১৯৯৪তে চরম আঘাত পেয়েছেন কারো কাছ থেকে।

শচীনবাবুর মতই আরেক জন নির্লোভ স্বাধীনতা সংগ্রামী হলেন প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি দীর্ঘকাল কারাবাস যাপন করে, অশেষ নির্যাতন ভোগ করেন ; শেষ কালে আগরতলাতে বড়মাতা মহারাণীর নাটমন্দিরে একাকী থাকতেন ; স্বাধীনতা সংগ্রামীর ভাতা গ্রহণ করেন নি। ❑

সাধনানন্দ গিরি মহারাজ

পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী জিলার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত নাহারখিল নামক গ্রামে পিতা মনমোহন মজুমদার ও মাতা বিসুকাসুন্দরী মজুমদার-এর ঘরে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন সাধন মজুমদার। মনমোহন-বিসুকাসুন্দরীর পুত্র-কন্যার সংখ্যা হল আট ; সাধন হলেন তৃতীয় সন্তান। পরবর্তীকালে ইনিই সাধনানন্দ গিরি মহারাজ নামে পরিচিতি ও খ্যাতিলাভ করেন।

সাধনের বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয় পৈত্রিক বাসভবনে। সে- সময় ভারতের মুক্তি সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করে গ্রাম-গঞ্জে, দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে প্রবাহিত হয়ে সাধনের বিদ্যা-শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। মাত্র চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। খিলপাড়া বিদ্যালয়ের আদর্শ শিক্ষক ছিলেন নলিনীকুমার মিত্র। নলিনীবাবুর ব্যক্তিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেম সাধনকে অভিভূত করেছিল।

চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে, পারিবারিক চাপে সাধন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর সহধর্মিনীর নাম শ্রীমতী দুলুরানী মজুমদার। সাধন ও দুলুরানীর ঘরে জন্মে চার পুত্র; এদের নাম হল স্বপন , তপন, অরুণ ও তরুণ। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নোয়াখালীতে ভয়াবহ হিন্দুনিধন দাঙ্গা হয়। আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজার দিন দাঙ্গা শুরু হয়। পক্ষকাল যাবৎ নারকীয় অত্যাচার চলে। তখন সাধন ছিলেন চট্টগ্রামে, আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে-খেয়ে ছোট-খাট ব্যবসা করতেন। দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই বাড়ীতে এসে নির্মম অত্যাচারের দৃশ্য দেখেন। পার্শ্ববর্তী নাওড়ী নামক গ্রামের ধনাঢ্য যোশাদারঞ্জন দাশের বাড়ীর ঘটনা মনে এলে আজও সাধন আঁতকে উঠেন। অত্যাচারীরা বল্‌ল, সমস্ত ভূ সম্পতি বিনামূল্যে লিখে দিতে হবে। যশোদা সব লিখে দিয়ে বল্‌লেন, প্রাণ ভিক্ষা চাই। কোপন ও কুটিল অত্যাচারীরা রাজী হল এবং রাত্রে নৌকায় তুলে সীমান্তে ওপারে আনবে বলে রওনা হল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সব পুরুষ ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাটল। মহিলাদের নিয়ে কি করল তা সহজেই অনুমেয়।

নোয়াখালীতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত নারকীয় দৃশ্য দেখে সাধন আর স্থির থাকতে পারেন নি। তিনি সপরিবারে আশ্রয় নেন ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজধানী ও তীর্থস্থান উদয়পুর নগরে। সেখানে কঠোর পরিশ্রম করেন, ব্যবসা, কৃষি, গোপালন প্রভৃতি করে অর্থ বিত্ত ডপার্জন করেন, ঘর-বাড়ী তৈরী করে স্ত্রী-পুত্রদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে গৃহত্যাগ করেন।

কামিনী-কাঞ্চনের মোহ ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে পথে বেরিয়ে পড়েন ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে।

সাধনের মানসিক প্রস্তুতি পূর্ব থেকেই ছিল। মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি দীক্ষিত হন। দীক্ষাগুরু হলেন শ্রীমৎ স্বামী গৌরানন্দ গিরি মহারাজ।

স্বনামধন্য ভোলাগিরি মহারাজের (১৮৩২-১৯২৯ খৃঃ) অন্যতম সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন গৌরানন্দ গিরি। সাধনের অগ্রজ দাদা অকালে অকস্মাৎ মারা যান। তাই সাধনকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হতে অনুমতি দেন নি পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়রা। পিতা-মাতার কথা রক্ষা করে, গৃহী হয়ে, বংশ রক্ষা করে, অবশেষে তিনি ঘর ছাড়েন। ১৯৮০ সালে ত্রিপুরাতে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। এই দাঙ্গার দুই তিন বৎসর পূর্বে সাধনের পিতা মাতা মারা যান। পিতা-মাতার সমস্ত পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি গৃহত্যাগী হন।

তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ করে ত্রিপুরায় ফিরেছেন। আগরতলায়, বিভিন্ন আশ্রমে থাকেন। সাধন-ভজন করেন, প্রত্যহ গীতা পাঠ করেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন, কীর্তন করেন, ভক্তদের বাড়ীতে গিয়ে সৎউপদেশ দেন। তাঁর কয়েকটি উপদেশ এরূপ — প্রত্যহ গীতা পাঠ করা উচিৎ, একাদশী পালন করা উচিৎ, যথাসম্ভব নিরামিষ ভোজন করা উচিৎ, লুঙি, প্যান্ট পরিধান করা উচিৎ নয়, মোরগ পালন করা উচিৎ নয়।

প্রবাহমান জল, চলমান সাধু সমতুল্য। আবদ্ধ জল এবং গৃহবন্ধী সাধক অপেক্ষাকৃত কম উপযোগী। সাধনানন্দ গিরি হলেন চলমান সাধু। আমতলীতে ভোলা গিরি আশ্রমে, আগরতলাতে জগন্নাথ বাড়ীতে, প্রতাপগড়ে লোকনাথ বাবার আশ্রমে, জয়নগরে ভারত সেবাশ্রম সংঘে, নলুয়াতে শংকর মঠে পালাক্রমে সাধনানন্দ গিরি অবস্থান করেছেন।

তিনি সুপণ্ডিত নন। তিনি সুবক্তা নন। তিনি বিচক্ষণ সংগঠক নন। তিনি অতীব উচ্চ মার্গের সাধক নন। তাঁর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব নাই। তাঁর অগণিত শিষ্য নাই, অসংখ্য ভক্ত নাই। তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন না। তাহলে তাঁকে লোকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে কেন ?

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জাগতে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তিনি অকপট ও দৃঢ়চিত্ত। তাঁর মুখ ও মন স্ববিরোধী নয়। তিনি নিজে যা নন, তা ফুলিয়ে জাহির করেন না। তিনি নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন, তিনি নিজের অতীতের ইতিহাস, ঘর-সংসারের কথা বলতে দ্বিধা করেন না। দুনিয়ার অজস্র সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করে, জাগতিক কুটিলতা ও জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে যেতে তিনি নারাজ। নিজের স্বীয় সীমিত ক্ষমতার দ্বারা যতটা লোককে সৎপথে আনা যায়, তাতেই তিনি সন্তুষ্ঠ। গৃহী হয়ে, গৃহত্যাগ করার মতো মনের জোর তাঁর মধ্যে অটুট। গৃহত্যাগজনিত অনুতাপ ও পিছুটান নাই।

আধমনা ও দোটানা ভাব তাঁর চিত্তে নাই। জীবনের দীর্ঘ সত্তর বৎসর (১৯২২-১৯৯২) ভোগের মধ্যে অতিবাহিত করে, অতঃপর তটস্থ্ হন এবং ভোগের মধ্য দিয়ে নির্বিকার চিত্তে ত্যাগের পথে পা বাড়ান। ❑

রমেন্দ্র কুমার সাহা ও শৈলেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য

রমেন্দ্রকুমার সাহা ও শৈলেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ছিলেন ত্রিপুরাতে পূর্ত্তবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। উভয়ের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, শিক্ষা, কর্মজীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ইতিহাস লেখার জন্য নয়, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করাই হল এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ত্রিপুরাতে দীর্ঘ রাজআমলের পর, ১৯৪৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন চালু ছিল। তখন পূর্তবিভাগে কেন্দ্রীয় পূর্তবিভাগ কর্তৃক উচ্চপদস্থ বাস্তুকার প্রেরিত হতেন। রমেন্দ্রকুমার সাহা ছিলেন কেন্দ্রীয় পূর্তবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত ও প্রেরিত মুখ্য বাস্তুকার। উভয়ের মধ্যে রমেনবাবু প্রবীণ, শৈলেনবাবু অপেক্ষাকৃত নবীন। শৈলেনবাবু প্রথমে উত্তরাংশে, পরে দক্ষিণাংশে এবং সবশেষে সদরে আগরতলাতে কাজ করেছেন। কর্মচারী মহলে আর. কে. সাহা এবং এম. কে. ভট্টাচার্য — এই নামে তাঁরা অধিক পরিচিত ছিলেন।

রমেনবাবুর প্রতিভা, বাস্তুশাস্ত্রজ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, ব্যক্তিত্ব, পরিচালনক্ষমতা এত বেশী ছিল যে, তিনি প্রশাসনে প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় পরিচালন সংক্রান্ত একটি নীতিবাক্য আছে। বাক্যটি এইরূপ, যদেব করোতি বিদ্যয়া, শ্রদ্ধয়া, উপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি। ইহার সরলার্থ হল ঃ যাই কিছু করা হয় সংশ্লিষ্ঠ জ্ঞান, নিষ্ঠা এবং দৈহিক উপস্থিতি দ্বারা, তাই হয় নিখুঁত-নির্ভুল। রমেনবাবু ছিলেন এই নীতিবাক্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রখরতা সূর্যরশ্মিতুল্য ছিল। তিনি এখানে বেশীদিন থাকতে পারেন নি।

শৈলেনবাবু ছিলেন ঋষিতুল্য ব্যক্তি। শৈলেনবাবুর প্রতিভা, বাস্তুশাস্ত্রজ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, সরকারী সম্পত্তির প্রতি সহানুভূতি, কৃচ্ছ্রসাধন, সাত্ত্বিক জীবন যাপন এত অনন্যসাধারণ ছিল যে, তাঁর নাম শুনলেই সমস্ত স্তরের সহকর্মীরা ও ঠিকাদাররা দূর হতে করজোরে প্রণাম জানাত। পরিদর্শনে প্রবাসে গেলে তিনি প্রয়োজনীয় চাউল, ডাল, আলু, লবন, মাখন, জ্বালানী, দারুকাঠ, স্টোভ, ডেকচি নিয়ে যেতেন। ডালে-চালে একসিদ্ধ করে খেতেন; অন্যের দেওয়া কোন প্রকার খাবার ও পানীয় খেতেন না। পাছে বিনামূল্যে প্রাপ্ত খাবার ঘুষতুল্য হয়ে যায়। ইহা সততার পরাকাষ্ঠা। সরকারী বিদ্যালয়ে, কার্যালয়ে, চিকিৎসালয়ে, ছাদ ঢালাই হতে থাকলে যাতে উপযুক্ত পরিমাণ মাল-মশলার সংমিশ্রণ করা হয়, তার জন্য সতর্ক নজর রাখতে অধঃস্তন বাস্তুকারকে মোতায়েন রাখতেন।

সরকারী যাবতীয় অট্টালিকার গায়ে ও ছাদে গাছ-গাছড়া উঠে খুব ক্ষতি করে। এরকম ক্ষেত্রে গাছ-গাছড়া দেখ্‌লে তিনি কড়া ব্যবস্থা নিতেন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উপর। রাস্তার আশে-পাশে পূর্তবিভাগের ইট, বালি, লোহা-লক্কর, তার, খাম, পাথর ইত্যাদি যদি অবহেলিত অবস্থায় দেখতেন, তবে আর রক্ষা ছিল না।

মানীর অপমান বজ্রাঘাত তুল্য। ৩৯৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে সক্রেটিস শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তের শিকার হলেন। সেদিন এথেন্সের আত্মার অপমৃত্যু হল। শৈলেনবাবু ঘটনাচক্রে আত্মঘাতী হয়েছিলেন। তিনি নিজেই গলায় ফাঁসী দিয়ে রাত্রে আগরতলাতে মারা যান। শৈলেনবাবুর অপমৃত্যু শুধু শৈলেনবাবুর অপমৃত্যু নয়, ত্রিপুরার আত্মার অপমৃত্যু।

অবহেলা, অন্যায়, অসদাচরণ, কপটতার বিরুদ্ধে আর্থিক শুচিতা, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশহিতৈষণা যদি ঋষিত্বের অন্যতম মাপকাঠি হয় তবে নিঃসন্দেহে রমেনবাবু ও শৈলেনবাবু ঋষি পদবাচ্য। উভয়েই প্রকৌশলী ছিলেন, রাজপুরুষ ছিলেন, বেতনভুক ছিলেন, গাড়ী-ঘোড়া চড়তেন। কিন্তু এহ্‌ বাহ্য। অন্তরে ছিলেন অতীব কর্তব্যপরায়ণ, সৎ, আদর্শবান, অসদাচরণের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত, দেশপ্রেমিক। বহু গেরুয়াধারীর চেয়ে অনেক বেশী মহান ছিলেন। জলের মধ্যে বাস করে, জল না পান করা বড়ই কঠিন। অশুভ শক্তিকে ভয় না পেয়ে, হাত পা না গুটিয়ে, কূর্মনীতি অবলম্বন না করে, জো হুজরী না করে, বীরদর্পে কাজ করেছিলেন বলেই তাঁরা বীর সন্ন্যাসীসম সন্মানীয়। অন্যায়ের সাথে সমঝোতা করা এবং জোড়াতালি দিয়ে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করা ছিল তাঁদের সহজাত প্রবৃত্তি বহির্ভূত। তাই তাঁরা স্মরণীয়। ❑

জ্যোতির্ম্ময় দাসজী গোস্বামী

পূর্ব বঙ্গের শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণ প্রান্তে নারায়ণ ক্ষেত্র নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তিনিই সাধনজীবনে জ্যোতির্ম্ময় দাসজী গোস্বামী নামে পরিচিত। তাঁর জন্মতিথি হল চৈত্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, প্রতিপদ তিথি , ১৩২৯বঙ্গাব্দ(এপ্রিল, ১৯২৩ খৃঃ)। তাঁর পিতা-মাতার নাম হল বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য ও হেমাংগিনী দেবী।

শ্রীহট্ট জিলাকে চারটি মহকুমায় ভাগ করলে, এরকম দাঁড়ায়- উত্তরে-পূর্বে শ্রীহট্ট সদর মহকুমা, উত্তরে-পশ্চিমে সুনামগঞ্জ মহকুমা, দক্ষিণে- পশ্চিমে হবিগঞ্জ মহকুমা, দক্ষিণে-পূর্বে মৌলভী বাজার মহকুমা। এই মৌলভীবাজার মহকুমায় রাজনগর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামের নিকট নারায়ণ ক্ষেত্র নামক পল্লীতে জ্যোতির্ময় দাসজীর জন্ম। তাঁর পিতামহের নাম তারানাথ। তারানাথের পাঁচপুত্র, যথা- অক্ষয়,সূর্যকান্ত, কৈলাসচন্দ্র, বিপিন চন্দ্র ও উপেন্দ্রকুমার। চতুর্থ পুত্র বিপিনচন্দ্র। বিপিনচন্দ্রের তিন পুত্র,যথা- বিনয় ভূষণ, বিজয়কৃষ্ণ এবং বিভূতি। বিপিনের দ্বিতীয় পুত্র বিজয় কৃষ্ণ। বিজয়কৃষ্ণই হলেন জ্যোতির্ম্ময় দাসজী।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরার মুখ্য কর্মকেন্দ্র ছিল শ্রীহট্ট, ধর্মনগর, কৈলাস-হর প্রভৃতি স্থান। ত্রিপুরার ১১৬ তম রাজা আদি ধর্মফা (আঃ৬৩৫-৬৭৫খৃঃ) শ্রী হট্টে বিশাল যজ্ঞ করেন। হোতা ছিলেন মিথিলা থেকে আনীত পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। সময় ছিল ৬৪২ খৃষ্টাব্দ। সদর শ্রীহট্টের পূর্ব প্রান্তে, কুশিয়ারা নদীর পূর্ব তীরে পঞ্চ খন্ড ভুমি দান করা হল ঐ সব ব্রাহ্মণদিগকে । দ্বিতীয়বার বিশাল যজ্ঞ করেন ১৩৩ তম রাজা ধর্মধর (আঃ ১১৬০ -১২২৫ খৃঃ)। স্থান পঞ্চ খন্ড হতে অনেক দক্ষিণে, সময় ১১৯৪খৃঃ। ত্রিপুরার রাজাদের আনুকূল্যে শ্রীহট্টে বহু ব্রাহ্মণের আগমন ঘটেছিল। মধ্যযুগে (১২০৪-১৭৫৭খৃঃ) বহু ব্রাহ্মণকে ছলে-বলে-কৌশলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল।

বিজয়কৃষ্ণের বাল্যজীবন ও কৈশোর কেটেছে পিতৃ গৃহে। নিকটবর্তী রাজনগর বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। ছাত্রজীবনে ফুটবল প্রভৃতি নানারকম খেলার নেশা ছিল প্রচন্ড। নাটক দেখতে, যাত্রা শুনতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর বাড়ীর পরিবেশ ছিল রক্ষণশীল। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন অন্যরকম, আমোদ প্রিয়, চঞ্চল, খামখেয়ালী, ভবঘুরে, বাধাবাঁধনহীন, বাইরে অশান্ত, ভেতরে শান্ত। অব্রাহ্মণদের বাড়ীতে অন্নভোজনে তাঁর আপত্তি ছিল না। এইসব বিষয়ে বাড়ীতে মতভেদ দেখা দেয়। তিনি বাড়ী ছাড়েন, লেখাপড়া ছাড়েন। তাঁর লেখাপড়া সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর বেশী হয় নি।

বিজয়কৃষ্ণ নিজের আত্মজীবনী লিখে, প্রকাশ করে গেছেন। পুস্তকটির নাম সদ্‌গুরু। তাঁর অন্যতম ভক্ত শ্রী সুবোধচন্দ্র রায় কর্তৃক পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে আগরতলা থেকে। ২৩৪ পৃষ্ঠার এই বইটি পাঠ করলে তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা জানা যাবে। বইটিতে পরিকল্পনাগত ও পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, তৎসত্ত্বেও বইটি তথ্যবহুল।

এই বইটি পাঠে জানাগেল, প্রায় দুই দশক যাবৎ(১৯৩১-১৯৫০খৃঃ) তিনি নানা স্থানে ঘুরেছেন, নানা ঘাটের জল পান করেছেন, নানা লোকের সাথে মিশেছেন, কখনো প্রতারিত হয়েছেন, কখনো কারো ফাঁদে আট্‌কা পড়তে-পড়তে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, বহু লোকের কঠিন রোগের নিরাময় করেছেন। তাঁর ভ্রমণক্ষেত্র ছিল শ্রীহট্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, আসাম, শিলং, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান।

অবশেষে, জনৈকা সাধিকার সন্ধান পান। সাধিকার নাম জয়ীকা দেবী। জয়ীকা দেবীর জন্মস্থান-স্থল কুমিল্লার অন্তর্গত টন্‌কি নামক গ্রাম। তিনি বিবাহিতা। তাঁর স্বামীর নাম কৈলাস দাশগুপ্ত। কৈলাসবাবু ছিলেন ত্রিপুরার রাজকর্মচারী। তাঁদের পুত্র আছে। পুত্র বর্ধমানের বার্ণপুরে ঘরবাড়ী করেছেন। জয়ীকা দেবী ও কৈলাসবাবু পুত্রের নিকট চলে যান। জয়ীকা দেবীর মৃত্যু হয় বার্ণপুরে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসের মাঝামাঝিতে।

এদিকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশ বিভাজনকে কেন্দ্র করে ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকে। জয়ীকা দেবী চলে যান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে। বিজয়কৃষ্ণ চলে আসেন ত্রিপুরাতে। কৈলাস-হরের এক গ্রামে এক বাড়ী কিনে কিছুদিন থাকেন। সীমান্তবর্তী ঐ গ্রাম নিরাপদ নয়। অতঃপর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আগরতলায় আসেন। পূর্ব শিবনগরে, জল সরবরাহ্ পথের উত্তর পার্শ্বে একখণ্ড ভূমি কিনেন। বিক্রেতা খেলেন্দ্র সিংহ নামক জনৈক মনিপুরী। ভূমির পরিমাণ দশ গণ্ডা। মূল্য ১,৫০০ টাকা। পরে ভক্ত সুবোধ রায় আরো সাড়ে তিনগণ্ডা ভূমি কিনে দান করেন। এই সাড়ে তের গণ্ডা ভূমিতে ঘর বাড়ী করে কাটিয়ে দেন প্রায় চল্লিশ বৎসর (১৯৫৬-১৯৯৫ খৃঃ)

তিনি বিভিন্ন বৈঠকে, সভা-সমিতিতে, সমবেত কীর্ত্তনে যেতে পছন্দ করতেন না। এককালে যিনি ছিলেন বহির্মুখী, ভবঘুরে, তিনিই উত্তরকালে হয়ে গেলেন অন্তর্মুখী, গৃহবন্ধী। বাড়ীতে কৃষি করতেন, গাভী পালতেন, তামাক সেবন করতেন, নিরামিষ ভোজন করতেন, গল্প করতেন।

তিনি বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। তাঁকে সেবা করতেন তাঁর এক শিষ্যা। নাম শিখা গোস্বামী। শ্রীহট্টের হাকালুকি হাওড়ের নিকটবর্তী বড়লেখা নামক জনপদে শিখার পূর্ব

নিবাস ছিল। পিতা-মাতার নাম প্রমোদচন্দ্র গোস্বামী ও প্রমিলা গোস্বামী। প্রমোদ গোস্বামীর পুত্র-কন্যা তিন জন, যথা প্রাণকৃষ্ণ, শিখা, প্রাণেশ। শিখার জন্ম ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ (নভেম্বর ১৯৩৯ খৃঃ), রাস পূর্ণিমা তিথিতে। শিখা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এবং হিন্দিতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। শিখার বংশে দেখা গেল যে বিয়ের পরেই মেয়েরা মারা যায়। এই ভাবে শিখার দুই জন পিসী মারা যায়। তাই শিখার মা- বাবা শিখাকে দান করে দেন গুরুর হাতে। শিখার পরিবারের সকলেই জ্যোতির্ম্ময় দাসজীর শিষ্য। জ্যোতির্ম্ময় দাসজীর শিষ্য সংখ্যা হাতে গুণা যাবে। একমাত্র শিখার পরিবারই শিষ্য। গুরুর প্রতি অখণ্ড ভক্তি বিশ্বাস রেখে প্রায় ৪০ বৎসর (১৯৫৫-১৯৯৫খৃঃ) গুরুসেবা করে গেলেন শিখা গোস্বামী।

জ্যোতির্ম্ময় দাসজী আর ইহজগতে নেই। তাঁর দেহত্যাগের দিন হল রবিবার, ৯ই বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ (২৩ শে এপ্রিল, ১৯৯৫ খৃঃ)

শিখা গোস্বামী একনিষ্ঠ ভক্তিতে গুরুর স্মৃতি মনে রেখে পূর্ব শিবনগরের আশ্রমিক বাড়ীতে এখনও (২০০২ খৃঃ) আছেন। ❑

শ্রীদাম সাধু

সমতল ত্রিপুরাতে নোয়াখালী জিলাধীন খন্ডল পরগনাতে টেটেশ্বর নামক গ্রামে দীনবন্ধু শীল ও কামিনীবালা শীল নামক দম্পতির পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন এক শিশু,যার পিতৃদত্ত নাম হল শ্রী শ্রীদাম শীল। আনুমানিক ১৩৩০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীদামের জন্ম হয়।

শ্রীদামের বাল্য , কৈশোর, যৌবন ও সাধন-ভজন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। দীনবন্ধু ও কামিনীবালা একাধিক পুত্র-কন্যার পিতা-মাতা হন। কিন্ত তাঁরা দীর্ঘজীবি হন নি। এছাড়া, আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কিশোর বালক শ্রীদাম তাই মামার বাড়ীতে চলে যান। মামার বাড়ী ছিল ফেনী নগরের উত্তরে, রুহিতিয়া নামক গ্রামে। সেখানেই তিনি অন্যান্য ছেলেদের সাথে থাকতেন, খেতেন, খেলতেন এবং এক-আধটু পড়াশুনা করতেন। খণ্ডল পরগনাতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই পড়াশুনার চাইতে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকেই ঝোঁক বেশী ছিল জনমানসে। ফলে পড়াশুনা গৌন হয়ে গেল। যাই হোক, বালক শ্রীদাম সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন। অতঃপর এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ভারত বিভাজন। ফলে অন্য অনেক হিন্দু পরিবারের মত, শ্রীদামের পরিবার হল বাস্তুহারা।

শ্রীদামের পরিবার, বাস্তুচ্যুত হয়ে এল ত্রিপুরার দক্ষিণপ্রান্তে, জোলাইবাড়ী নামক জনপদে। খাস ভূমিতে, বনেজঙ্গলে পর্ণকুটির নির্মাণ করে কৌলিক বৃত্তি অর্থাৎ ক্ষৌরকর্ম শুরু করে দিলেন। কতিপয় বাস্তুহারা চিন্তাশীল সমাজসেবক দ্বারা ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ৯ ই মার্চ জোলাইবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে জোলাইবাড়ী বিদ্যালয়ের আশে-পাশে জনপদ, ছাত্রাবাস, বাজার, রাস্তা ইত্যাদি গড়ে উঠল। শ্রীদাম শীল কালক্রমে জোলাইবাড়ী বাজারে দোকান খুলে বসেন ও ক্ষৌরকর্ম করতে থাকেন। তাঁর ব্যবহারের মধ্যে, কথাবার্ত্তার মধ্যে এমন মাধুর্য এবং আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র তাঁর দোকানে আড্ডা দিত, চুল কাটাত। তখনও দেখা যেত, তিনি ব্রহ্মচারীর শুভ্র পোষাক পড়তেন এবং মাথায় ছোট একটি জটা রাখতেন। কৌলিক বৃত্তিতে তিনি সিদ্ধহস্ত হয়ে যথেষ্ট উপার্জন করেছেন। বাস্তুচ্যুত হবার ধাক্কা সামলে উঠেন, ঘরবাড়ী মেরামত করেন, ভাই-বোনদের প্রতিষ্ঠিত করে দেন। কিন্তু নিজে রয়ে যান ব্রহ্মচারী। অবশেষে একদিন হলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী।

শ্রীদাম কখন দীক্ষিত হন, তা জানা যায় নি। তাঁর মাতুলালয়ের পরিমন্ডলে শ্রীশ্রী রামঠাকুর (১৮৬০-১৯৪৯খৃঃ) ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় মহাপুরুষ। ফেনীতে ও ফেনীর নিকটবর্তী গ্রামসমূহে শ্রীশ্রী রামঠাকুর প্রায়ই আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। শ্রীদাম মামার বাড়ীতে থাকাকালীন কোন একসময়ে শ্রীশ্রী রামঠাকুর থেকে কৃপা লাভ করেন এবং নাম মহামন্ত্র প্রাপ্ত হন। সমস্ত প্রকার ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও শ্রীদাম গুরু-দত্ত নাম জপ করতে ভুলতেন না। ত্রিপুরাতে উঠে আসার পর, পারিবারিক গুরুদায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে এল। সেই দায়িত্ব পালন করছেন পরিবারের বড় ছেলে হিসাবে। পাশাপাশি মনে-মনে সাধনা করে গেছেন। মন মে রাম, হাত মে কাম- এই প্রণালীতে প্রায় ত্রিশ বৎসর গৃহী-সন্ন্যাসী রূপে অতিবাহিত করে, অবশেষে ঘর-বাড়ী ভাইদের দিয়ে, নিজে একা ভিন্ন পথ ধরলেন।

জোলাইবাড়ী জনপদের উত্তরে মনু নামক স্থানে, আগরতলা- সাব্রুম জাতীয় সড়কের পূর্ব্ব দিকে ছোট একটি টিলাতে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। সেই আশ্রমে তিনি দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন। কতিপয় ভক্ত ও শিষ্য জুটে গেল। তারপর অমরপুরে নতুন বাজার নামক স্থানে আরেকটি আশ্রম স্থাপন করেছেন।

তিনি কোন বই লিখেন নি, জনহিতকর সেবাপ্রকল্প গড়েন নি , সমাজসংস্কার মূলক কোন আন্দোলন করেন নি, নৈষ্টিক,কঠোর সাধন-ভজন করে নিজের চারিদিকে এক বিরাট ভক্ত ও শিষ্য মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করে যান নি। অনাড়ম্বর জীবন যাপন, মধুর ব্যবহার, গুরুভক্তি, নির্লোভ স্বভাব-প্রভৃতি ছিল তাঁর গুণাবলী। এই সব গুণাবলীকে দেশাত্মবোধ, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি নীতি দ্বারা শক্তিশালী করতে পারলে এবং গঠনমূলক কাজে পরিচালনা করতে পারলে দেশের ও দশের অনেক কল্যাণ হত। তিনি যদি উন্নতমনা বন্ধু-দার্শনিক-পথপ্রদর্শক পেতেন তবে তাঁর দ্বারা অনেক গঠনমূলক কাজ হয়ত হত। ❑

স্বামী কৃপালানন্দ গিরি মহারাজ

পশ্চিম বঙ্গে, বর্ধমান জিলাতে, সাতগাছিয়া নামক গ্রামের ঈশ্বর চন্দ্র বসু ও সখীসুন্দরী বসু-এর অন্যতম পুত্র হলেন জগদীশ বসু, যিনি পরবর্তী জীবনে স্বামী কৃপালানন্দ গিরি মহারাজ নামে খ্যাত হয়েছেন। ত্রিপুরাতে আগরতলা নগরের উত্তর প্রান্তে, কুঞ্জবনে ভোলাগিরি আশ্রমের অধ্যক্ষ হিসাবে এবং সনাতন ধর্ম পরিষদের অধ্যক্ষরূপে কৃপালানন্দ গিরি মহারাজ সুপরিচিত।

সাতগাছিয়া নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র বসু (আঃ ১৮৮০-১৯৫৫ খৃঃ) ছিলেন বৃটিশ রাজকর্মচারী। তিনি সাতজন পুত্র-কন্যার পিতা, তাদের নাম হল যথাক্রমে পূর্ণেন্দু, কৃষ্ণকান্ত, হরিপদ, কালিপদ, শংকর, জগদীশ এবং জয়ন্তী। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা কার্যোপলক্ষে পূর্ববঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী জিলাতে এই বসু-পরিবার কিছু দিন কাটান। পিতামহের ও পিতার কর্মোপলক্ষে এই পরিবারের ছেলে-মেয়েরা নানা স্থানে, নানা পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছে।

জগদীশ বসুর জন্ম আনুমানিক ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর কৈশোর এবং যৌবন নানা স্থানে কেটেছে, কয়েক বৎসর কলকাতাতে ছিলেন এবং লেখাপড়া বেশীর ভাগই কলকাতাতেই। কলকাতাতে চিকিৎসাবিদ্যা পড়ার সময় ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। ইহা ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। জগদীশের সহপাঠী নগেন বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত হলেন দাঙ্গাকারী মুসলমানদের দ্বারা। একটি পরিচিত মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল দাঙ্গাকারীরা। এই সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জগদীশ এত বেশী মর্মাহত হলেন যে তিনি কলকাতা মহানগর ছেড়ে চলে গেলেন উত্তরভারতে, তীর্থক্ষেত্রে। জগদীশের জীবনের প্রথম পর্ব্ব (১৯২৩-১৯৪৬ খৃঃ) এই করুণ ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হল।

জগদীশ বসুর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব্ব (১৯৪৭-১৯৬৭খৃঃ)নানা আশ্রমে, নানা তীর্থে, নানা গুরুর সন্ধানে তিক্ত মধুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কেটেছে। এই পর্ব্ব হল পরিব্রাজনের পর্ব্ব। গুরু-শিষ্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারটা একতরফা নয়। উভয়কে উভয়ের মনঃপুত হওয়া চাই। মহাবিদ্যালয় ছেড়ে কয়েকমাস বাড়ীতে কাঠালেন। তখন মামা মহেন্দ্রনাথ দাস প্রায়ই উৎসাহ দিতেন বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পড়তে। দেশের পরিস্থিতি তখন উত্তাল। রক্তাক্ত পরিস্থিতিতে দেশ বিভাজন হল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই যুবক জগদীশ ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যান। একাধিক মঠে, মন্দিরে, আশ্রমে, থাকা-খাওয়া হল। নানা সাধু-সন্তের আদেশ-উপদেশ শুন্‌লেন।

জগদীশের জীবনের তৃতীয় পবর্ব (১৯৬৯-১৯৭৮) শুরু হল ভোলাগিরি আশ্রমে যোগদানের মধ্যদিয়ে। এতদিনে মন এক স্থানে নিবিষ্ট হল । শ্রীশ্রী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ (১৮৩২-১৯২৯খৃঃ) ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী সন্ন্যাসী ও কুশল সংগঠক। তিনি নানা তীর্থে সেবাশ্রম স্থাপন করে গেছেন । তাঁর প্রতিষ্ঠিত পরম্পরা অকালে শুকিয়ে যায় নি। এই আশ্রমের নিয়ম-কানুন, সাধন-প্রণালী পছন্দ হল উদ্‌ভ্রান্ত যুবক জগদীশের। এখান থেকেই দীক্ষা নিয়ে তিনি কালক্রমে স্বামী কৃপালানন্দ গিরি মহারাজে উন্নীত হলেন।

অতঃপর তাঁর জীবনের চতুর্থ পর্ব্ব (১৯৭৯-) শুরু হল ত্রিপুরায় আগমনের মধ্যে দিয়ে । তিনি ১৯৭৯খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাতে আসেন। কুঞ্জবন শ্রীশ্রী ভোলানন্দ সেবাশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হল।

প্রসঙ্গতঃ কুঞ্জবন ভোলানন্দ সেবাশ্রম স্থাপনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলা যেতে পারে । মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্যের ধর্মপত্নী মহারানী প্রভাবতী দেবী (১৮৯০-১৯৭১খৃঃ) ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রমের জন্য এক বড় ভূখন্ড দান করেন। ভোলাগিরি আশ্রম ও প্রভাবতী দেবীর মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোজন করার কাজ করেছিলেন মহারাজকুমার সহদেব বিক্রম-কিশোর। মন্দির নির্মিত হল ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে। আগরতলাতে এই আশ্রম গড়ার উদ্যোগ পর্ব্বে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তাঁরা হলেন স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজ (১৮৮৮-১৯৭৫ খৃঃ),হরানন্দ গিরি মহারাজ, অক্ষরানন্দ গিরি মহারাজ, বিমলানন্দ গিরি মহারাজ ।

এঁরা যাবতীয় কায়িক শ্রম করে আশ্রমকে দাঁড় করান। তারপর এলেন শিবানন্দ গিরি মহারাজ। শিবানন্দ ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে চলে যান অন্যত্র। অতঃপর আসেন কৃপালানন্দ গিরি মহারাজ। অতএব বলা যায়, কৃপালানন্দ পেয়েছেন সাজানো উদ্যান, তৈরী আশ্রম। তাঁর কাজ সংরক্ষণ করা ও সংহত করা।

বিগত ১৪.১.১৯৯৬.দিনাংকে আগরতলাতে গঠন করা হল সনাতন ধর্ম পরিষদ। ইহার উদ্দেশ্য হল সনাতন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। কৃপালানন্দ গিরি মহারাজ ইহার সভাপতি পদে মনোনীত হন। এছাড়া, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে গঠিত সর্ব্ব ভারতীয় সনাতন ধর্ম সংসদ-এর অন্যতম সদস্য হলেন কৃপালানন্দ গিরি মহারাজ।

শ্রীশ্রী ভোলানন্দ সেবাশ্রমের অভ্যন্তরে যাত্রীনিবাস, ছাত্রাবাস, বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করে এই আশ্রমকে প্রাণবন্ত রাখা হয়েছে। শাশ্বতী ভাবনা নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ডঃ সীতানাথ দে মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশ করে চলেছে এই আশ্রম।

অধিকন্তু, প্রায় প্রতি মাসেই কোন-না-কোন পূজা-পার্ব্বন লেগেই আছে।

আগরতলাস্থিত মহানাম অঙ্গন হল পরমপূজনীয় ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর পবিত্র স্মৃতি বিজরিত আশ্রম। এই অঙ্গন ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে আগরতলাতে মানব ধর্ম সম্মেলন করে আসছে। এই সব সম্মেলনে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দেশের অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন কৃপালানন্দ গিরি মহারাজ।

আশ্রম আর নির্জন দ্বীপ সমতুল্য নহে। আশ্রমের সাথে আশে-পাশের, দূরের-নিকটের লোকের সম্পর্ক গড়ে উঠে। আশ্রমবাসীর সাথে নানা প্রকার লোকের সম্পর্ক গড়ে উঠে। তন্মধ্যে কারো-কারো কুটিল ব্যবহারে আশ্রমবাসী মর্মাহত হয়। কৃপালানন্দজীও যখন এমন মর্মবেদনায় সাময়িক ভোগেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করে নিজেকে সান্ত্বনা দেন। বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত মন্তব্য কৃপালানন্দের খুব প্রিয় —

যত উচ্চ তোমার হৃদয়
তত দুঃখ জানিবে নিশ্চয়।
হৃদিবাণ নিঃস্বার্থ প্রেমিক
এজগতে নাহি তব স্থান।
মুখে মধু, অন্তরে গড়ল, সত্যহীন স্বার্থপরায়ণ
তবে পাবে এজগতে স্থান। ❑

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গে, নদীয়া জেলায়, আলমডাঙ্গা গ্রামে বাস করতেন তারাপদ গোস্বামী এবং তাঁর স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী গোস্বামী। এই দম্পতির এক কন্যা ও তিন পুত্র। নাম হল যথাক্রমে অন্নপূর্ণা, কুমারেশ, নরেশ ও সুরেশ। অন্নপূর্ণার জন্ম হল ১৩ই আশ্বিন, সোমবার, জন্মসন হল খুব সম্ভবতঃ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ,অর্থাৎ ১৯২৪খৃঃ। তিনি জীবিত আছেন, আগরতলাতে, জগহরি মুড়াতে, রঘুনাথ জীউউর আশ্রমেই আছেন, কিন্তু তিনি জন্মসন সঠিক করে বল্‌তে পারছেন না।

অন্নপূর্ণার বিবাহ হয়েছিল নয় বৎসর বয়সে,১৩৪০ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। একমাত্র কন্যা জন্মাবার পর তিনি বিধবা হন। ভারত বিভাজনের এক বৎসর আগে তিনি স্বামীহারা হন।১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দীক্ষা নেন। তাঁর গুরুদেবের নাম হল শ্রীমৎ স্বামী জগবন্ধু গোস্বামী মোহান্ত মহারাজ (আঃ ১৮৮৪-১৯৬৪খৃঃ)। দীক্ষান্তে গুরুদেবের আলম ডাঙ্গাস্থিত রঘুনাথ জীউর আশ্রমে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। কিছুদিন পরে একমাত্র কন্যাকে নিয়ে তিনি আশ্রমেই বসবাস করতে থাকেন। রঘুনাথের সেবা, গুরুসেবা চল্‌তে থাকে। কিছুদিন পর, আলমডাঙ্গা থেকে বগুলাস্থিত আশ্রমে আসেন অন্নপূর্ণা।

১৯৬১ সালে গুরুদেবের আদেশ হল-আগরতলাতে নতুন আশ্রম খোলা হবে, সেখানকার কাজ দেখাশুনা করার জন্য অন্নপূর্ণা যেন আগরতলায় যায়। গুরুদেবের আদেশ অমান্য করা যায় না। তাই তাড়াতাড়ি করে কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করা হল। ৫ই ফাল্গুন ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে (ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ খৃঃ) কন্যাকে পাত্রস্থ করা হল। অতঃপর ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৯৬১খৃঃ) গুরুদেব সাথে করে শিষ্যাকে নিয়ে এলেন আগরতলাতে।

বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে গেলেন অখিল ঘোষ ও সুকুমার পাল মহাশয়। আগের দিন খুব বৃষ্টি হওয়াতে অখিল ঘোষের বাড়ীতে যাওয়া হল না, সুকুমার পালের বাড়ীতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। গুরুদেব এখানকার ভক্ত-শিষ্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুকুমার পালের বাড়ী হল জগহরি মুড়াতে। বিদ্যাপত্তনের জন্য এই স্থান রাজা বীর বিক্রম কর্তৃক বরাদ্ধ ছিল। পূর্ব্ব বঙ্গ থেকে আগতউদ্বাস্তু আপাততঃ সেখানে বাস করতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে ফেলে। সুকুমার বাবু নিজ দখলীকৃত ভূমি থেকে আড়াইগন্ডা ভূমি দেন গুরুদেবকে। সেখানেই মন্দিরের কাজ শুরু করে, গুরুদেব চলে যান পশ্চিমবঙ্গে।

অন্নপূর্ণা দেবীর ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে আগরতলার কতিপয় মহানুভব ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। তাঁরা শিষ্য নন, তাঁরা হলেন ভক্ত। কালক্রমে বহু লোকের দানে গড়ে উঠল পাকা মন্দির, সন্তনিবাস, ইত্যাদি। যাঁরা মোটা অংকের ধনরাশি এই মহৎ কাজে দান করেছেন তাঁরা হলেন কৃষ্ণ বসাক, কানাই সাহা,নিতাই সাহা, মহাপ্রভু সাহা, রাইচরণ সাহা, রামচন্দ্র পাল, শৈলেন সাহা, গোপাল সাহা, চন্দ্রমোহন ঘোষ, সুরেশ দাস প্রমুখ। বাস্তুকার মানিক সেন তন-মন-ধন দিয়ে সমগ্র কাজকে এগিয়ে নিয়েছেন।

গুরুকৃপায় এবং ভক্ত-শিষ্যদের আন্তরিক আগ্রহে স্থাপিত আশ্রমের নাম হল শ্রীশ্রী রঘুনাথ জীউর আশ্রম। এই আশ্রমে রঘুনাথের ও গৌর-নিতাই -এর নিত্য সেবাপূজা চলে। এছাড়া প্রতি বৈশাখে গুরুদেবের তিরোধান দিবস পালিত হয়। শ্রাবণে ঝুলন যাত্রা, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী, কার্ত্তিকে অন্নকোট, নিয়ম মাস, মাঘে গুরুদেবের আবির্ভাব দিবস, ফাল্গুনে দোলযাত্রা- প্রভৃতি উৎসব পালিত হয়।

এই আশ্রমের জন্য কোন নির্দিষ্ট চাঁদার ব্যবস্থা নেই। আয়ের উৎস অনিশ্চিত। অথচ কোন উৎসব অর্থাভাবে বাদ যায় না।এছাড়া অন্নপূর্ণা দেবী ব্যতীত আরো কয়েকজন নিত্য অন্নপ্রসাদ পান। ভক্তদের দানেই ইহা সম্ভব হয়ে আসছে।

এই আশ্রম সমাজ সেবামূলক কি কাজ করে ? ঝড়ায়, খরায়, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, দাঙ্গায় ভূমিকম্পে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সেবা করেছে এমন উদাহরণ নেই। তাহলে সমাজ কেন ইহার ব্যয়ভার বহন করবে ? কয়েকটি কারণে ভক্তরা এই আশ্রমকে জীবিত রেখেছে। কারণ গুলো হল-প্রথমতঃ, মানুষের স্বাভাবিক বদান্যতা। দ্বিতীয়তঃ, অন্নপূর্ণা দেবীর অপত্যসুলভ স্নেহ ও শাসন। তৃতীয়তঃ, গুরুদেবের প্রতি ভক্তিপ্রসুত কর্তব্যবোধ। চতুর্থতঃ, পাড়াপ্রতিবেশী বালক- বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এই নিকটবর্তী আশ্রমে এসে শান্তি পায়। পঞ্চমতঃ, বারোমাসে তেরো পার্বণে চাঁদা দিয়ে, কাজ করে, প্রসাদ খেয়ে ও খাইয়ে ভক্তরা আনন্দ পায়। ষষ্ঠতঃ, এই আশ্রমে কয়েকজন বিধবা অনাথা মহিলা আশ্রয় পেয়ে আসছে। এমন কয়েকজনের নাম হল বাসন্তী সাহা, শৈলবালা বণিক, মাধবী চক্রবর্তী। বাসন্তী ও শৈলবালা ১৪০৬ বাংলাতে মারা গেছেন। কিছুদিন আগে এসেছেন শ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী। সততা ও নিষ্ঠার প্রমাণ রাখতে পারলে বৃদ্ধা অন্নপূর্ণা দেবী হয়ত নারায়ণ চক্রবর্তীকে আশ্রমের দায়িত্ব দেবেন। জগবন্ধু চক্রবর্তীর পুত্র নারায়ণ চক্রবর্তীর জন্ম ১৩ই কার্ত্তিক সোমবার, ১৩৬২ বাংলা। ❑

বৃন্দাবনদাস গোস্বামী

ত্রিপুরা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানাধীন বগাসাইর-চান্দপুর নামক গ্রামের আনন্দমোহন শর্মার তৃতীয় পুত্র হলেন বীরেন্দ্র শর্মা, যিনি পরবর্ত্তীকালে বৃন্দাবনদাস গোস্বামী নামে পরিচিত হন। আনন্দমোহন শর্মা ও গঙ্গা শর্মা হলেন বৃন্দাবন দাসের পিতা ও মাতা। আনন্দমোহন ও গঙ্গার দুই কন্যা ও তিন পুত্র; তাদের নাম হল যথাক্রমে-শান্তবালা, চিন্তাহরণ, নিরদা, বীরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। ইহারা ব্রাহ্মণ। বীরেন্দ্রের জন্মদিন হল শনিবার, শ্রাবণমাস, আনুঃ ১৩৩১বঙ্গাব্দে (১৯২৪খৃঃ)

বীরেন্দ্রের শৈশব,কৈশোর, বাল্যকাল ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে চৌদ্দগ্রামে। গ্রামের পাঠশালাতে সামান্য পড়াশুনা করেন। অর্থাভাবে অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। যজন-যাজনে সংসার চলে না। তাই দর্জির কাজ শিখে জামা-কাপড় সেলাই করতেন।১৬.৮.১৯৪৬ সালে কলিকাতাতে দাঙ্গা হল,১০.১০.১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে দাঙ্গা হল। নোয়াখালীর দাঙ্গার এক বৎসর আগে বীরেন্দ্র বিবাহ করেন নোয়াখালীর লেমুয়া গ্রাম-নিবাসী নন্দরানী ভট্রাচার্যকে। তখন বীরেন্দ্রের বয়স ২১ বৎসর, নন্দরানীর বয়স ১৩ বৎসর মাত্র। নন্দরানীর জন্মদিন হল বৃহস্পতিবার,শ্রাবণ মাস,আঃ১৩৩৯ বাং (১৯৩২ খৃঃ) তিনি জীবিত আছেন। তাঁর কাছ থেকেই অদ্য(২৬.১১.২০০০খৃঃ) এসব তথ্য সংগ্রহীত হল।

বিধর্মীদের অত্যাচারে নববিবাহিত দম্পতি শরণার্থী হয়ে আগরতলায় এলেন। সেদিন ছিল ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭বাংলা (মে,১৯৫০ইং)আগরতলাতে রাজবাড়ীর সামনে অবস্থিত দুর্গাবাড়ীতে একরাত্র রইলেন। সে সময় শরণার্থীরা প্রথমেই এই দুর্গাবাড়ীতে আশ্রয় পেত। বীরেন্দ্র এই ভাবেই মা-বাবা,ভাই-বোনকে নিয়ে আগরতলায় এলেন। তারপর মেলার মাঠে জনৈক শিষ্যবাড়ীতে কয়েকমাস থাকলেন। ত্রিপুরার বহু স্থানে অস্থায়ী শিবির নির্মাণ করা হল । জেলাশাসক রঞ্জিৎ ঘোষ,কর্মচারী রঞ্জিত সেন, চন্দ্রদয়াল বর্মন, পীযুষ দাশগুপ্ত, শচীন্দ্র দত্ত, বিশু চট্রোপাধ্যায় (৯.৬.১৩৩৪ -) প্রমুখ সরকারী কর্মচারীরা তখন অক্লান্ত পরিশ্রম করে উদ্বাস্তুদের থাকা-খাওয়া ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন।আগরতলার দক্ষিণ প্রান্তে আমতলী ও মধুবন প্রভৃতি স্থানে বহু শিবির হল। বীরেন্দ্র রইলেন মধুবনে। সপ্তাহে মাথাপিছু ৩ টাকা দেওয়া হত। তদুপরি উদ্বাস্তুরা ছোট-খাট কাজ করে পরিবার নির্বাহ করত। বীরেন্দ্র দর্জির কাজ করতেন। পরে চাম্পামুড়াতে পাঁচ কানি জঙ্গলাকীর্ণ টিলাভূমি পেলেন পুনর্বাসন হিসাবে। সেখানেই তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ে জন্মগ্রহণ

করে।

বালক বয়সে উপনয়নের সময় কুলগুরু থেকে প্রথম দীক্ষা পান। তারপর ১৯৬০এর দশকে রানীরবাজার নিবাসী কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কাছ থেকে পেয়েছেন দেহতত্ত্ব শিক্ষা। অতঃপর ১৯৭১ সালে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছেন পান্ডবপুর নিবাসী মনমোহন গোস্বামীর কাছ থেকে ।

সন্ন্যাস পাওয়ার পর তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শাকাহারী হয়ে যান। স্বামী ও স্ত্রীতে সম্পর্ক তদবধি ভাই- বোনের মত। তিনি তামাক সেবা করতেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ছিল জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। কৃষ্ণ কথা শুনবার ও শুনাবার লোক পেলে সারারাত জাগতেন। সারারাত গান-বাজনা করতেন কখনো-কখনো। তাঁর প্রায় হাজার খানেক শিষ্য ছিল। শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করতেন শিষ্য বাড়ী গিয়ে-গিয়ে। কিন্তু তিনি তীর্থ ভ্রমণে যেতে চাইতেন না । তিনি বলতেন -গয়া কাশী বৃন্দাবন, সকলি মনের ভ্রম, সকল তীর্থ আছে শ্রী গুরুচরণ। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে তাঁর গুরুদেব মনমোহন গোস্বামী পরলোক গমন (১০ই চৈত্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ) করেছেন। গুরুপত্নী প্রেমদাসী গোস্বামী এখনও জীবিত, অতি বৃদ্ধা। তাই গুরুপত্নীকে সেবা করতে আসেন পান্ডবপুরে। অথচ গুরুপত্নী জীবিত থাকতেই শিষ্য বৃন্দাবনদাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ ১৪০৭ বাংলা(১৯.১১.২০০০খৃঃ)

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ (২৩.১১.২০০০খৃঃ) আগরতলাতে এক বিশাল বৈষ্ণব সম্মেলন হল। উদ্দেশ্য হল ত্রিপুরাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জনিত ভয়াবহ পরিস্থিতির নিরসন কল্পে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানানো। ইহার প্রধান-উদ্যোক্তা হলেন গিরীন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণ গোপাল মজুমদার, বৃন্দাবনদাস গোস্বামী, মনমোহন গোস্বামী, সদানন্দ গোস্বামী, শ্যামসুন্দর গোস্বামী, নিশু দেববর্মা, প্রমুখ চিন্তাশীল নাগরিকরা। এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য আগরতলার দক্ষিণে,নানা স্থানে বৈঠক ও ছোট-খাট বৈষ্ণব সম্মেলন করেন বৃন্দাবন দাস । এতে যথেষ্ট পরিশ্রম হল। তিনি বেশ দুর্বল হয়ে যান। তাই সম্মেলনের মাত্র চারদিন আগে তিনি ইহধাম ছেড়ে গেলেন। ❑

শ্রীশ্রী জয়মনোবাবা

সমতল ত্রিপুরাতে, কুমিল্লার পশ্চিম-দক্ষিণে, মুরাদনগর থানাধীন বাঁশকাইট নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এক শিশু, যাঁর পিতৃদত্ত নাম হল মনোরঞ্জন দেব, এবং উত্তরকালে আশ্রমিক নাম হল শ্রীশ্রী জয় মনোবাবা। তাঁর আয়ুষ্কাল হল ১৩৩৩-১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৯২৬-১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ।

বাঁশকাইট-নিবাসী এই বর্ধিষ্ণু বাড়ীটি দফাদার বাড়ী নামে পরিচিত ছিল। বংশের কেউ-কেউ দফাদার পদে চাকুরী করত, তাই এই নামেই বাড়ীটি সুপরিচিত ছিল। শশীভূষণ দেব ও প্রেমদাসুন্দরী নামক দম্পতি ছিলেন একাধিক পুত্র-কন্যার পিতা-মাতা। তাঁদের নাম হল, যথাক্রমে — মনোরঞ্জন, গৌরাঙ্গ, সাধনা, বাসনা এবং গীতা। এই পাঁচ জনের মধ্যে, মনোরঞ্জন গেলেন পরমার্থের সন্ধানে, অন্যেরা রয়ে গেলেন গৃহস্থ্য জীবনে।

মনোরঞ্জনের আবির্ভাব তিথি হল কৃষ্ণপক্ষ, চতুর্দ্দশী, মহালয়ার পূর্ব মুহূর্ত, সোমবার, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ। উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে, কন্যা লগ্নে জন্ম, সিংহ রাশি, নরগণ। জন্মলগ্নে বুধাদিত্য যোগ, পরম উৎকর্ষতার ইঙ্গিতবাহক।

বাল্যকাল

মনোরঞ্জনের শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে জন্মভূমিতে, পৈত্রিক বাড়ীতে। মহালয়াতে ভূমিষ্ঠ হওয়ায়, বালকের ডাকনাম ছিল মালু। মহালয়া শব্দের অপভ্রংশ করে মালু শব্দ নিষ্পন্ন করা হল। শৈশবেই এই বালক ছিল প্রাণচঞ্চল, কিন্তু দুরন্ত ছিল না। বালকসুলভ অপরাধপ্রবণতা ছিল না এই বালকের স্বভাবে। কিন্তু গান-বাজনার প্রতি, ভক্তিগীতির প্রতি ছিল অনুরাগ। নয় বৎসর বয়সে জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পেয়েছিলেন।

শিক্ষা

বালকের লেখাপড়া গ্রাম্য পাঠশালাতে হয়েছিল। বাঁশকাইট বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করানো হল ৭ বৎসর বয়সকালে। কিন্তু ৯ বৎসর বয়সকালে রোগাক্রান্ত হওয়ায়, আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা বিঘ্নিত হল। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া নিতান্ত কম হলেও, স্বীয় ধীশক্তিবলে তিনি প্রভূত শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

বিবাহ

যুবক মনোরঞ্জন অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পারিবারিক চাপে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পিতামহ দ্বারিকানাথ চাইলেন আদরের নাতিকে বিয়ে করাতে। দাদুর আবদারের নিকট নতি স্বীকার করে রাজী হলেন। কুমিল্লার এক ধনাঢ্য পরিবারের কন্যাকে বালিকাবধু করে মহাসমারোহে ঘরে আনা হল। তবে সেই বিবাহ্ কার্যতঃ পুতুলখেলা সদৃশ হল। বালিকাবধুর পিতা কিছুদিন পরে স্বীয় কন্যাকে নিয়ে গেলেন। ইহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ঘটনা।

ভারত বিভাজন, দাঙ্গা ও জন্মভূমি ত্যাগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সমগ্র ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে চরম অস্থিরতা, অশান্তি, অরাজকতা বিরাজ করছিল। অগণিত হিন্দুর ঘরবাড়ী ছারখার করা হয়েছিল বিধর্মীদের দ্বারা। তাই পরিবারের লোকজনের সাথে মনোরঞ্জন উদ্বাস্তু হয়ে পার্বত্য ত্রিপুরার কাকড়াবন নামক জনপদে আশ্রয় নেন। ইহা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তৎকালে সাথী ছিলেন কাকা ও কাকীমা। মনোরঞ্জনের পিতা-মাতা ত্রিপুরাতে আসেন ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে।

জীবন ও জীবিকা

শরীরম্ আদ্যম্, খলু ধর্মসাধনম্। ত্রিপুরাতে এসে তিনি সাজানো বাগান, তৈরী বাড়ী, গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু পান নি। বাঁশকাইট নামক গ্রামে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ঘরবাড়ী, ক্ষেত-খামার ছিল। সব ফেলে দিয়ে, এখানে রিক্তহস্তে এলেন। সম্বল নিজের দেহবল, মনোবল। তাই সম্বল করে, তিনি যখন যে-কাজ জুটেছে সে কাজই করেছেন; যেমন — সেলাই, সাইকেল মেরামত, ঘরছানি, মাটি কাটা, যোগালী, ভূমিপরিমাপ, ধানকাটা ইত্যাদি এবং অবশেষে ভূমিরাজস্ব বিভাগে সরকারী কাজ। এসব চল্ল বার বৎসর (১৯৫০-১৯৬২ খৃঃ) থেকে কিঞ্চিৎ অধিক কাল সময়। তখন তাঁর 'হাত মে কাম, মন মে রাম'।

তীর্থভ্রমণ

মকর সংক্রান্তির শুভ লগ্নে তীর্থভ্রমণে যাবেন বলে মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিলেন আগেই। সেজন্য আর্থিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিছুদিন যাবৎ। অবশেষে নীরবে, নিভৃতে রওনা হলেন উত্তর ভারতের তীর্থ দর্শনে। পেছনে পরে রইল কাজকর্ম, চাকুরী। উত্তর ভারতের অধিকাংশ তীর্থ দর্শন করে, বীরভূমের তারাপীঠে এলেন, কিছুকাল সাধন-ভজন করলেন। তারাপীঠে থাকাকালীন উপলব্ধি হল যে ত্রিপুরার কাকড়াবনে প্রত্যাবর্তন করে সাধনভজন ও সমাজসেবা সম্ভব। প্রথম শ্রেণীর উত্তম ইট সর্বত্র সমান উপযোগী !

প্রত্যাবর্তন ও সাধনভজন

কাকড়াবনে প্রত্যাবর্তন করে তিনি পিসীর বাড়ীতে অবস্থান করেন কিছুকাল। তৎকালে তিনি মৌনব্রত, অজগরব্রত, পক্ষীব্রত অবলম্বন করেন। কথা না বলা, আসন না ছাড়া, সঞ্চয় না করা — এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়াতে সাধন চল্‌ল কয়েক বৎসর যাবৎ।

আশ্রম স্থাপন

সাধন ভজনে যতই অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চল্‌ছিলেন, ততই ভক্ত সমাবেশ ক্রমবর্দ্ধমান হারে হচ্ছিল। পিসীমার পারিবারিক ছোট পরিসরে এই সমাবেশের সঙ্কুলান হচ্ছিল না। তাই পুনরায় উপলব্ধি হল যে, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় পরিসরে আশ্রম গড়া আবশ্যক। কাকড়াবন-নিবাসী বিশিষ্ট নাগরিক রত্নেশ্বর দত্ত জানতে পারলেন সেই কথা। তিনি উদ্যোগ নিয়ে ভূমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর ভক্ত-শিষ্যদের আন্তরিক আগ্রহে আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। তিনি পিসীমার গৃহ ছেড়ে আশ্রমে বসবাস শুরু করেন।

সমাজসেবা

তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী, আত্মপ্রচার বিমুখ, গুপ্তযোগী, নীরব সাধক। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল নিতান্ত সাধারণ। তিনি নামজাদা বাগ্মী ছিলেন না, অতি উচ্চ ডিগ্রীধারী পণ্ডিত ছিলেন না, বহু গ্রন্থরচয়িতা ছিলেন না, সহস্র-সহস্র শিষ্যের গুরু ছিলেন না, বিরাট বিদ্যালয়-স্থাপয়িতা খ্যাতিমান সমাজসেবক ছিলেন না। তাঁর চলনে-বলনে জমকালো পরিপাটি ছিল না।

আগরতলা নিবাসী স্বামী দয়ালানন্দের ছিল সাংগঠনিক প্রতিভা, অপরপক্ষে হংসরাজ সোহংমণি বাবার ছিল সাধন-প্রতিভা। দয়ালানন্দ ছিলেন কর্মবীর, হংসরাজ ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ। মনোবাবা ছিলেন হংসরাজ সোহংমণি তুল্য। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল। মনোবাবার কথায়, ইচ্ছায় স্পর্শে, অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। তিনি ছিলেন অন্তর্যামী, দূরদর্শী, অভ্যন্তরীণ সম্পদে সম্পদশালী। তাঁর তিরোধান তিথি হল রবিবার, শুক্লপক্ষ, ১৫ই পৌষ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ খৃঃ।

শ্রী বিভূতিভূষণ চৌধুরী কর্তৃক লিখিতগ্রন্থে "শ্রীশ্রী জয় মনোবাবার কথা", আগরতলা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৮৪, একটি আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বহু অলৌকিক ঘটনার বিবরণ, নাম-ধাম দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রন্থের প্রামাণিকতা বাড়ে। বইটি সুখপাঠ্য। ❑

ললিত সাধু

পূর্ব্ব বঙ্গের শ্রী হট্ট জেলার অন্তর্গত হবিগঞ্জ নামক স্থানে ললিত দাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম লক্ষ্মীকান্ত দাস। তাঁর জন্মসন হল আনুমানিক ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর সম্বন্ধে তথ্যাদি নিশ্চিতরূপে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত বিভাজন হল। ১৯৪৭ সালের ৬ই জুলাই শ্রী হট্টের ভাগ্য নিয়ে জনমত যাচাই করা হয়েছিল। এই জনমত যাচাই করতে গিয়ে যে মতদান অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল। ললিত দাস তখন যুবা বয়সী। সেই গোলমালে জড়িয়ে যান ললিত দাস ।শ্রীহট্ট যাতে ভারতে থাকে, এজন্য কাজ করতে গিয়ে পাকিস্থানপন্থীদের হাতে খুব লাঞ্ছিত হন। প্রাণনাশের আশংকায় তিনি ত্রিপুরাতে আশ্রয় নেন।

ললিত নানা গ্রাম ঘুরে,অবশেষে অমরপুরে এলেন। তখন অমরপুরে চিন্তাহরণ তালুকদার খুব প্রভাবশালী পুরুষ ছিলেন। স্বাস্থ্যবান যুবক ললিত গেলেন তালুকদার বাড়ীতে। তালুকদারের পছন্দ হল। তালুকদারের প্রহরী, চৌকিদার বা লাঠিয়াল হিসেবে নিযুক্ত হলেন। ঘটনাচক্রে ভূমিসংক্রান্ত বিবাদে তালুকদারের এই লাঠিয়াল অভিযুক্ত হলেন ফৌজদারী মামলায়। কয়েক বৎসর কারাবাস হল, কিন্তু প্রমাণের অভাবে কারাবাস থেকে মুক্ত হলেন।

কারাবাস থেকে মুক্ত হয়ে তিনি গেলেন জন্মভূমিতে । কিন্তু জন্মভূমির পরিবেশ-পরিস্থিতি পূর্ব্ববৎ প্রতিকূল থাকায়, ললিত আবার ফিরে এলেন ত্রিপুরায়। এতদিনে বয়সে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ সমাগত। মনে শান্তি নেই, নিবাস নেই, আশ্রয়স্থল নেই, তালুকদারের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। ছন্নছাড়া জীবন ! একক জীবন !

ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে তখন নবদ্বীপ সাধু নামে একজন সন্ত বাস করতেন। ললিত ঘুরতে-ঘুরতে নবদ্বীপ সাধুর নিকট হাজির হলেন, নবদ্বীপ সাধু আশ্রয় দিলেন। সাধন ভজন করতে দীক্ষা দিলেন, সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। হৃদয়ে তীব্র জ্বালা থাকায়, গুরুদেবের উপদেশ উপলব্ধি করলেন।

কয়েক বৎসর পর, গুরুদেব স্নেহাস্পদ শিষ্যকে নিয়ে গেলেন অমরপুরের চণ্ডীবাড়ী নামক মন্দিরে। চণ্ডীবাড়ীতেই বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। তীর্থমুখের মেলায় প্রতি বৎসর যেতেন। তিনি মিষ্টভাষী ও নির্লোভি ছিলেন। ১৫ই মাঘ ১৩৯১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভক্তরা প্রতিবৎসর তাঁর তিরোধান দিবস পালন করে। ❑

শ্রীমৎ স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দজী মহারাজ

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা নগরে,কৃষ্ণনগর নামক গ্রাম-নিবাসী ক্ষীরোদলাল দেববর্মন ও প্রমীলা দেববর্মন নামক দম্পতির অন্যতম সুপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন চন্দ্রগুপ্ত দেববর্মন , যিনি উত্তরকালে শ্রীমৎ স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দজী মহারাজ নামে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন ।তাঁর শুভ আবির্ভাব কাল হল ১৩৩৬ বাংলার, কার্ত্তিক মাস, শুক্লা দ্বাদশী তিথি, অর্থাৎ নভেম্বর ১৯২৯খৃষ্টাব্দ।

ঠাকুর ক্ষীরোদলাল (আনুঃ ১৮৯৭-১৯৫৩খৃঃ) ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ক্ষত্রিয় এবং উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁর দেহের গড়ন ছিল পাতলা ছিপছিপে, রং ছিল কাচা সোনার মত, মেজাজ ছিল কড়া, তিনি ত্রিপুরা রাজসরকারের ভূমি রাজস্ব ও জরীপ বিভাগে কাজ করা কালীন সময়েই অল্পবয়সে মারা যান। তিনি ছিলেন ৮ জন পুত্র-কন্যার পিতা। পুত্র-কন্যাদের নাম হল, যথাক্রমে -প্রতিমা, ষোড়শী, চন্দ্রগুপ্ত, নিভা, যতীন্দ্রমোহন. মণিকা, প্রতীশকুমার এবং সুনিকা। কৃষ্ণনগরে সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় যেখানে,সেখানেই পাশেই ক্ষীরোদ ঠাকুরের বাড়ীর সঙ্কোচিত রূপ অদ্যাপি বিদ্যমান। সেই বাড়ীতে তাঁর পুত্রকন্যারা বসবাস করছেন।

চন্দ্রগুপ্তের শৈশব,বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছে কৃষ্ণনগরেই। তিনি উমাকান্ত একাডেমী থেকে খুব সম্ভবতঃ ১৯৪৯খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চন্দ্রগুপ্তের অনুজ যতীন্দ্রমোহন এবং প্রতীশকুমার এই সব তথ্যাদি দিয়েছেন। আরেক ভদ্রলোক এই জীবনী লিখতে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন শ্রীযুক্ত বাবু অমিয়কুমার দেববর্মন(১৯২৮-)। অমিয়বাবুর পিসীর শ্বশুরবাড়ী হল ক্ষীরোদলালের বাড়ী ।অমিয়বাবুর পিসী মনোরমা দেবী হলেন ক্ষীরোদলালের বউদি, অর্থাৎ ভবানীলালের স্ত্রী। ক্ষীরোদলাল অত্যন্ত সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্মচারী ছিলেন ।এমন আরেকজন সৎ কর্মচারী ছিলেন শশাঙ্ক রায়। পিতার অকাল মৃত্যুতে চন্দ্রগুপ্ত মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। তিনি সংসারের দায়িত্ব পালন করতে, ভাই-বোনদের ভরণ-পোষণ করতে কৃত সংকল্প হন এবং সরকারী চাকুরী নিতে বাধ্য হন।

স্থিতধী চন্দ্রগুপ্ত নিজের উচ্চ শিক্ষার চাইতে ভাই-বোনদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেন। ভাই-বোনদের মধ্যে তিনি তৃতীয়, কিন্তু পুত্রদের মধ্যে তিনি বড় ।তাই দায়িত্ব বেশী ।তিনি তিন দশকের অধিক সময় (১৯৫৪-১৯৮৮খৃঃ) চাকুরী করেছেন ত্রিপুরা সরকারের অধীনে। তিনি চাকুরী করেছেন মুখ্যতঃ বিজয়কুমার

বালিকা বিদ্যালয়ে এবং সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে। সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী হিসাবে তাঁর সুনাম আছে।

ভাল খেলোয়াড় হিসাবেও চন্দ্রগুপ্ত এককালে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। ফুটবল, কেরম, তাস এবং দাবা খুব ভালই খেলতেন তিনি। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন হলেন শ্রী অমিয়কুমার দেববর্মা, শ্রী সুবোধ ভট্টাচার্য, শ্রী দীনেশ রায় এবং সুব্রত চক্রবর্তী। সুব্রত বাবু এবং চন্দ্রশেখর বাবু সেবানিবৃত্ত হয়ে একই গুরুর নিকট একই সময়ে এবং একই আশ্রমে সন্ন্যাসব্রত নেন।

আগরতলা নগরের দক্ষিণে আমতলী নামক গ্রাম অবস্থিত। সেই গ্রামে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে ভোলাগিরি আশ্রমের একটি শাখা স্থাপন করা হয়েছে। ভোলাগিরি আশ্রমের গুরু পরম্পরাতে শ্রীমৎ স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরি মহারাজ হলেন অন্যতম গুরু। তিনি খুব স্নেহ করতেন চন্দ্রশেখর ও সুব্রত কে। স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরি মহারাজ হলেন এই অবিবাহিত, শিক্ষাবিদ্ চন্দ্রশেখরের ও সুব্রতের দীক্ষাগুরু। দীক্ষান্তে তাঁদের নাম হল যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। আমতলীস্থিত আশ্রমে আরেকজন সদাশয় ব্যক্তি নীরবে মানব কল্যানে রত আছেন, তিনি হলেন চিকিৎসক শ্রী ধ্বনিচাঁন্দ দেববর্মা। তিনি চন্দ্রশেখরানন্দজীর প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং আত্মীয়। ❑

ব্রহ্মচারী দিব্যাত্মা চৈতন্য

ব্রহ্মচারী দিব্যাত্মা চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন অসম প্রদেশের কামরূপ জেলার অন্তর্গত আমিন গাঁও নামক স্থানে। তাঁর জন্ম দিন হল দুর্গাপূজার সপ্তমী তিথি, ৪ঠা কার্ত্তিক, আনুমানিক ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ (১৯২৯ খৃঃ)। তাঁর পুর্ব্ব নাম দেবী প্রসাদ বসু। তাঁর পিতা-মাতার নাম প্রফুল্লনারায়ণ বসু এবং মৃণালিনী বসু। প্রফুল্লের চার কন্যা ও তিন পুত্র। দেবীপ্রসাদ হলেন সর্বকনিষ্ঠ। প্রফুল্ল রেলওয়ে বিভাগে সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তিনি অকালে মারা যান। তখন দেবীপ্রসাদের বয়স ছিল সাত বৎসর। দেবীপ্রসাদের মামা উপেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বিধবা বোন ও ভাগিনা-ভাগিনীদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উপেন্দ্রনাথও রেলওয়েতে কাজ করতেন। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে দেবীপ্রসাদ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কৈশোরে পিতৃহারা দেবীপ্রসাদ-এর কর্মজীবন শুরু হয় অতি অল্প বয়সে, ১৯৪৫খৃষ্টাব্দে। ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ এই দুই বৎসর শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত একটানা চল্লিশ বৎসর রেলওয়েতে কাজ করেন। অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। মেজাজী রাজপুরুষ রূপে চাকুরীজীবনে তাঁকে লোকে সমীহ করত।

দেবীপ্রসাদের দীক্ষাগুরু হলেন শ্রীশ্রী স্বামী গিরিজানন্দ গিরি মহারাজ। গিরিজানন্দ গিরি বালক বাবা নামে অধিক পরিচিত। গিরিজানন্দ গিরি(১৯০৪-১৯৬৮খঃ) হলেন শ্রীশ্রী স্বামী মোহন্ত মোহন গিরি মহারাজ (আঃ১৮০৮-১৯৩০খৃঃ)-এর শিষ্য। মোহন্ত মোহন গিরি আলেখ বাবা নামে অধিক পরিচিত। আলেখ বাবা ও বালক বাবা ছিলেন উচুমার্গের সাধক ও প্রভাবশালী সমাজসেবক।

চাকুরী জীবনেই,মাঝ বয়সে, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে দেবীপ্রসাদ দীক্ষা লাভ করেন শ্রীমৎ গিরিজানন্দ গিরি মহারাজের কাছ থেকে। খেয়ালী গুরু এবং মেজাজী শিষ্য-এর মধ্যে সম্পর্কটা ছিল মান-অভিমানের,নরম-গরমের। ১৯৬৮খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুপুরিজী মহারাজের সাথে প্রথম পরিচয় হয়। রেলওয়ে মারফত কিছু বই, মালপত্র আনার কাজে দেবীপ্রসাদ বিষ্ণুপুরিজীকে খুব সহায়তা করেন। অতঃপর সম্পর্ক উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠহতে থাকে এবং ১৯৯৩খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরিজীর কাছ থেকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হন। দীক্ষান্তে নাম হল দিব্যাত্মা চৈতন্য।

দীক্ষান্তে ১৯৯৩ সনেই আগরতলায় গুরু-শিষ্য আসেন। সুরেন্দ্র বণিক নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি কর্তৃক শ্রী মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আগরতলার মেলার মাঠ নামক জনপদের পশ্চিমে এবং বঠতলার পূর্ব্বে। সুরেন্দ্র বণিক ছিলেন অপুত্রক। সুরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ঐ মন্দির বিষ্ণুপুরিজী মহারাজের হাতে অর্পণ করেন।

ব্রহ্মচারী দিব্যাত্মা চৈতন্যের গায়ের রং শ্যামলা, উচ্চতা ৫´ ৪´´, দোহারা চেহারা, মাথায় জটা নাই,খাড়া-খাড়া চুল আছে;পরিধানে গেরুয়া পোষাক। পান-সুপারী খেতে ভালবাসেন। অধিকাংশ সময়ে নিরামিষ ভোজন করেন। খাবার ব্যাপারে নৈষ্ঠিক কঠোরতা নাই। প্রায় সারা ভারত ভ্রমণ করেছেন।

তাঁর স্বভাব-চরিত্রে অতীয়ন্ত্রতা,মৌনতা নির্বিকল্প সমাধির ভাব নাই। তিনি হলেন দিল-খোলা, হাত খোলা স্বভাবের, আলাপী, মেজাজী, ভ্রমণ-রসিক, বাহ্যত কঠোর,অন্তরে কোমল, খেজুরগাছ সদৃশ। তাঁর নেশা হল বই পড়া। সমাজসেবার ক্ষেত্রে অনাথদের পড়ানোর দিকে তাঁর ঝোঁক বেশী। ❑

স্বামী অমরেশ্বর পুরী মহারাজ

পূর্ব্ব বঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী বুরুঙ্গা নামক গ্রাম-নিবাসী গজেন্দ্র চক্রবর্তী ও কুমুদবাসিনী চক্রবর্তী ছিলেন পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যার পিতা-মাতা। তাঁদের পুত্র হরেন্দ্র চক্রবর্তীর জন্মস্থান শ্রীহট্টের গ্রামের বাড়ীতে, জন্মদিন হল বুধবার, কার্ত্তিক মাস, ১৩৩৬ বাংলা, রাসপূর্ণিমার পরের দিন, ১৯২৯খৃষ্টাব্দে। এই হরেন্দ্র চক্রবর্তী পরবর্তীকালে স্বামী অমরেশ্বর পুরী মহারাজ নামে পরিচিত হন।

জীবদ্দশায় এই সব তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। তাঁর দেহাবসানের পর তাঁর শিষ্য শ্রীমৎ দয়াল চৈতন্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিখুঁত এবং নির্ভুল হয়েছে-একথা জোর দিয়ে বলা যায় না । হরেন্দ্র চক্রবর্তীর শৈশব,কৈশোর ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে শ্রীহট্টে। এবং শ্রীহট্টে গ্রাম্য পাঠশালাতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ হয়েছে। অতঃপর শ্রীহট্টে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহরূপ ধারণ করলে, তরুণ যুবক হরেন্দ্র চক্রবর্তী ভারতে চলে আসেন, এবং ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। ত্রিপুরাতে এসে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং বিদ্যালয়ের গন্ডি সফলতার সাথে অতিক্রম করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ কুসুমাস্তীর্ণ হতে পারে নি অর্থাভাবে; তাই তিনি চায়ের দোকানে কাজ করতেন। চা নিয়ে খাওয়াতেন লোকদিগকে, চায়ের দোকানেই থাকা,খাওয়া পড়াশুনা করতেন। অতঃপর কাশীতে চলে যান সংস্কৃত , বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ, দর্শন ইত্যাদি শিখতে।

আনুমানিক ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় পরম্পরা অনুযায়ী দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীমৎ শংকরানন্দ দেব। অতঃপর কয়েক বৎসর বাদেই তিনি সন্ন্যাসী হবার বাসনায় গুরুর সন্ধানে থাকেন এবং স্বামী সত্যানন্দ পুরী মহারাজকে সন্ন্যাসগুরু রূপে বরণ করে নেন। গুরুপ্রদত্ত নাম হল স্বামী অমরেশ্বর পুরী মহারাজ।

স্বামী অমরেশ্বর পুরী মহারাজ তীর্থ ভ্রমণে বেড়িয়ে ছিলেন। সমগ্র ভারতের সবকয়টি প্রধান-প্রধান তীর্থ দর্শন করেছেন। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরাতে আশ্রম স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলাতে এবং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাতে তিনি মন্দির স্থাপন করেন। নদীয়াতে করেন ১৯৭০সালে, ত্রিপুরাতে করেন ১৯৭১ সালে। আগরতলা নগর থেকে কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে ডুকলী নামক গ্রামে তাঁর মঠ নির্মিত হয়েছে। মঠের নাম শংকর পুরুষোত্তম মঠ ।

তাঁর চেহারা-কেমন ছিল ? তাঁর স্বভাব কেমন ছিল ? তাঁর আশ্রমের খরচের উৎস

কি ছিল ? তাঁর ছিল পাতলা ছিপ- ছিপে গড়ন। তিনি ধুমপান করতেন, চা পান করতেন। 'নিত্য ভিক্ষা, তনু রক্ষা' -এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না । তাঁর আয়ের উৎস ছিল আকাশ বৃত্তি এবং জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা। জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। কুষ্ঠী বিচার করতে লোকজন আসত এবং টাকা-পয়সা দিত। তাঁর আয়ের উৎস ছিল অনিশ্চিত। তৎসত্ত্বেও তিনি আশ্রম স্থাপন, মন্দির নির্মাণ, দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি করেও কিছু উদ্বৃত্ত রেখেছেন উত্তরসুরীর জন্য ।

তিনি নিত্যসিদ্ধ সাধক ছিলেন না, কোন বড় মাপের সমাজ-সেবক ছিলেন না, কোন নামজাদা সমাজসংস্কারক ছিলেন না, স্বধর্মরক্ষাকারী ধর্মযোদ্ধা ছিলেন না। ফলে জনমানসে তাঁর প্রভাব সীমিত। কিন্তু এক তরুণ যুবককে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন সেই যুবকের বন্ধু,দার্শনিক,পথপ্রদর্শক। সেই তরুণ বিদ্যার্থীর নাম শ্রী দীপক কুমার ভৌমিক, যিনি পরবর্তীকালে ব্রহ্মচারী দয়াল চৈতন্য নামে খ্যাত হয়েছেন এবং ডুকলী গ্রামে অবস্থিত মঠের কর্ণধার হয়েছেন। ❑

শ্রীশ্রী অমিয় চৈতন্য মহারাজ

শ্রীশ্রী অমিয় চৈতন্য মহারাজ প্রাক্তন ত্রিপুরা জিলার অর্থাৎ অধুনা কুমিল্লা জিলার লাকসাম থানার অন্তর্গত শ্রীয়াং নামক গ্রামে আনুমানিক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুর্বনাম ছিল শ্রীসাধন চন্দ্র ধর। তাঁর পিতার নাম কৈলাস চন্দ্র ধর, মাতার নাম সুশীলা দেবী। কৈলাস -সুশীলার দুই পুত্র ও চার কন্যা। সাধন সর্বকনিষ্ঠ । সাধন আজীবন ব্রহ্মচারী।

সাধনের পড়াশুনা গ্রামের পাঠশালাতে। নেতাজী সুভাষ বসু যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে আসেন, তখন সাধন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। ছাত্র বয়সেই তিনি গ্রামবাসী ও সহপাঠীদের নিকট সাধু নামে পরিচিত ছিলেন। কোমল ও শান্ত স্বভাবের জন্য তিনি তখনই লোকপ্রিয় ছিলেন। কৈশোর বয়সেই একবার তাঁর সকল্প সমাধি হ্ল। সমাধিতে নগ্নদেহী দিব্যপুরুষের দর্শন লাভ করেন। কিছু দিন ভাবাবেশে থেকে, লেখাপড়া বন্ধ করে, মা-বাবার অনুমতি নিয়ে বালক সাধক গৃহত্যাগ করেন গুরুর সন্ধানে। সমগ্র ভারতের অধিকাংশ তীর্থ ভ্রমণ করে অবশেষে কাশ্মীরে উপস্থিত হন। কাশ্মীরে সেই গুরুর দর্শন লাভ করেন। গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন, গুরু তাঁকে গ্রহণ করেন ও দীক্ষা-শিক্ষাদেন। গুরুর সান্নিধ্যে ছিলেন বিশ বৎসর, ১৯৫০ থেকে ১৯৭০খৃঃ পযর্ন্ত। তাঁর গুরুর নাম পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অশোকানন্দজী মহারাজ। শ্রীমৎ অশোকানন্দজী পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ -এই ধারার অন্তর্গত।

গুরুর -নির্দ্দেশে পুনরায় জন্মভূমি দর্শনের জন্য বঙ্গদেশের অভিমুখে রওনা হন। তিনি দেশ বিভাগের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৪৭খৃষ্টাব্দের আগে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। এর মধ্যে বহু ঘটনা, বহু রক্তপাত,বহু দাঙ্গা হয়েছে দেশে। তাই জন্মস্থান দর্শন ভাগ্যে ঘটে নি। উত্তর ভারতের নানা তীর্থ দর্শন করে আসতে-আসতে সময় নিয়েছে (১৯৭১-৭৫ খৃঃ)। অবশেষে ১৯৭৬খৃষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুরায় পদার্পণ করেন।

ত্রিপুরার মধ্যে সোনামুড়া ও উদয়পুর — এই দুই জনপদে তাঁর জন্মভূমি কুমিল্লার বহু লোক বাস করে। জন্মভূমির লোকদের আন্তরিক আগ্রহে তিনি উদয়পুরকে বেছে নিলেন আশ্রম স্থাপনের জন্য। কিন্তু উদয়পুর নগরে, নাকি, গ্রামে আশ্রম স্থাপন করবেন — এ প্রশ্ন উঠল। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মতো, তিনিও আরণ্যক সভ্যতায় বিশ্বাসী। তাই গ্রামের খোলা-মেলা, ছায়াঢাকা, পাখী ডাকা পরিবেশ তাঁর পছন্দ। উদয়পুর নগরের উত্তরে-পশ্চিমে ধ্বজনগর নামক একটি ঐতিহাসিক জনপদ আছে। সেখানে অধুনা উদয়পুর

মহাবিদ্যালয় ও সেনানিবাস রয়েছে। ধ্বজনগরে উত্তরে কুপিলং নামক পার্বত্য পল্লী। ধ্বজনগর ও কুপিলং এই দুই গ্রামের সীমানায় স্থাপিত হল তাঁর আশ্রম।

তাঁর আশ্রমের নাম শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মহাসম্মেলন আশ্রম। ইহা শুরুতে, ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে, কুপিলং নামক গ্রামে ছিল। বছর খানেক পরেই সামান্য দক্ষিণে একটি নীচু টিলাতে সরিয়ে আনা হল। আশ্রম স্থাপনের কাজে তিনি অনেকের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত, উচ্চপদস্থ অধিকর্তা কে. ডি. মেনন, উদয়পুর নিবাসী অহিভূষণ নন্দী, নেপাল নন্দী এবং ব্রহ্মচারী ব্রহ্মানন্দ চৈতন্য, খগেন্দ্র চৈতন্য, কালিদাস চৈতন্য ও সুবল চৈতন্য. শেষোক্ত পাঁচজন ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মানন্দ, খগেন্দ্র, কালিদাস ও সুবল) জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ যাবতীয় কাজে আজও (১৯৯৬ইং) তাঁর নিত্য সহচর।

চল্লিশ কানি ভূমির উপর স্থাপিত আশ্রমে আছে কার্যালয়, দেবালয়, গুরুমন্দির, যাত্রীনিবাস, ছাত্রাবাস, অনাথ আশ্রম, ভোজনালয়, গোশালা, বাগান, জলাশয়, কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি। আশ্রমের ছাত্রাবাসে থাকে ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং এবং চতুবর্ণের বাঙালী ছাত্র। তাদের থাকা খাওয়া পড়াশুনার ব্যবস্থা আশ্রমেই। আশ্রমের কতিপয় বিদ্যার্থী এখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্বামীজীর পরিধানে গেরুয়া, মাথায় সামান্য জটা, গোফে দাড়ি, মুখে পূর্ববাংলার কথ্য ভাষা, ভোজনে নিরামিষ। শ্যামলা মাঝারি গড়ন তাঁর। অনাড়ম্বর নিরাভিমান স্বামীজী জনসেবার মাধ্যমে ভগবৎসেবা করে চলেছেন। ❑

শ্রীশ্রী জয়গুরুদেব অন্তর্যামী

পিতা দেবেন্দ্র চন্দ্র গুহ এবং মাতা প্রভাবতী গুহ-এর অন্যতম সন্তান হলেন শ্রী সুখেন্দুবিকাশ গুহ। সুখেন্দুবিকাশ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তিনি এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু থাকেন আগরতলা থেকে দূরে, কমলপুরে। তাঁর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন, সহজে কিছু বলতে চান না।

যতদূর জানা গেছে, সুখেন্দু বিকাশ জন্মগ্রহণ করেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থানে। খুব সম্ভবতঃ ১৯৩১ খৃষ্ঠাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্থানেই বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্থানেই লেখাপড়া করেছেন বিদ্যালয়ের স্তর অবধি। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্থানে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল, বহু হিন্দু নিহত ও বিতাড়িত হয়েছিল। তখন সুখেন্দুর পরিবারের লোকজন নিহত হলেন, ঘরবাড়ী ছাড়খার করা হল। কোন মতে প্রাণে বেঁচে গেলেন সুখেন্দু। ত্রিপুরায় আশ্রয় নিলেন, সেই থেকে ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলেই তিনি থাকেন।

ত্রিপুরায় আসার পর প্রায় দশ বৎসর যাবৎ (১৯৬৪-১৯৭৫ খৃঃ) সুখেন্দু ঠিকাদারের গদিতে সামান্য কর্মচারীরূপে কাজ করেছেন। কিন্তু সেই প্রাক্তন স্মৃতি কোন দিন ভুলতে পারেন নি। সেই বিয়োগ-ব্যাথা তলে-তলে অন্তর্দাহরূপে তুষের আগুনের মত জ্বলত। তাই সদাগরী কার্যালয়ের চাকরী ছেড়ে দিয়ে সাধন ভজনে বসে যান।

আনুমানিক ১৯৭৫ খৃঃ-এর পর থেকে তিনি নীরবে সাধন ভজন করে চলেছেন। এক জায়গায় বসে থাকেন বেশীর ভাগ সময়। কথা বলেন খুব কম। তাঁর পরিধানে শুভ্র ধুতি। ভক্তরা খুশী হয়ে খেতে দিতে চান। তিনি আতপ দুধ পছন্দ করেন। আশ্রম গড়া, শিষ্য করা, সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করা, হরিসভাতে গান বাজনা করা, ধর্মসভাতে ভাষণ দেওয়া — ইত্যাদি তাঁর স্বভাব বহির্ভূত। ❑

শ্রী পাদ কৃষ্ণদাস গোস্বামী

শ্রীল শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভু পূর্ব্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তিনি কৈবর্ত্তদাস সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং ৪৪ বৎসর বেঁচে ছিলেন। তাঁর আয়ুস্কাল আনুমানিক ১৯৩৪ থেকে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ। তিনি অল্পবয়সে পিতৃহারা হন এবং বাল্য শিক্ষা অবধি পড়াশুনা করেন।

ত্রিপুরার পশ্চিম প্রান্তে,পূর্ব্ব বঙ্গের পূর্ব্বতম প্রান্তে কসবা ও মোগড়া নামক জনপদ অবস্থিত। কসবা ও মোগড়ার মাঝা মাঝিতে গোঁসাইস্থলী ও মণি অন্ধ নামক দুইটি গ্রাম বিদ্যমান। গোসাইস্থলীতে সনাতন গোস্বামীর আশ্রম ও সমাধিস্থল আছে। মণি অন্ধে জন্ম গ্রহণ করেন সুরেন্দ্র সাধু। সুরেন্দ্র সাধু গোসাইস্থলীতে সনাতন গোস্বামীর আশ্রমে যেতেন,সাধন-ভজন করতেন। তৎকালে সনাতন গোস্বামী জীবিত ছিলেন না। সুরেন্দ্র সাধুর আশ্রমিক নামক শ্রীশ্রী ঠাকুর হংসরাজ সোহংমনি। হংসরাজ সোহংমনির আয়ুস্কাল ১৮৯৩-১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ। কৃষ্ণদাস গোস্বামীর আয়ুস্কাল ১৯৩৪-১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং জ্যেষ্ঠ হংসরাজ কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। সুরেন্দ্র সাধু যখন সনাতন গোস্বামীর আশ্রমে যেতেন, তখন কৃষ্ণদাস সেই আশ্রমে নবাগত ব্রহ্মচারী মাত্র।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে পুর্ব্ব পাকিস্থানে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। তাতে হাজার-হাজার হিন্দু নিহত হয়। হিন্দু নারী নির্যাতিত হয়। মঠ-মন্দির আক্রান্ত হয়। সেই সময় অতি কষ্টে সুরেন্দ্র সাধু ও কৃষ্ণদাস গোস্বামী আগরতলায় আশ্রয় নেন। তখন প্রবীন ও মৌনী সুরেন্দ্র সাধু আগরতলা নগরের ভট্টপুকুর নামক গ্রামে,এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে কিছু দিন অবস্থান করেন। তখন নবীন কৃষ্ণদাস আগরতলায় ইতঃস্তত ঘুরছেন, কোথাও আশ্রম পান নি। কৃষ্ণদাস তখন প্রায়ই সুরেন্দ্র সাধুর নিকট ভট্টপুকুর যেতেন।

আগরতলা নগরের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে আমতলী নামক জনপদ অবস্থিত। ইহা মহা সড়কের উভয় পাশ্ববর্তী গ্রাম। ইহা আগরতলার শহরতলী। এই গ্রামের অধিবাসীদের অনেকেই গোঁসাইস্থলী থেকে আগত বাঙালী হিন্দু। এই গ্রামের প্রাচীন বাসিন্দা হলেন শ্রী হরেন্দ্র রায়। হরেন্দ্র বাবু ধনাঢ্য ও ধার্মিক ব্যক্তি এবং কৃষ্ণদাস অপেক্ষা বছর দশেক বড়। হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীটির অবস্থান একটি পুকুরের উত্তর পাড়ে। পুকুরটির নাম হল কুরির দীঘি। খই, চিড়া, মুড়ি ভেজে বিক্রয় করা যাদের কৌলিক বৃত্তি তাদের বলা হয় কুরি। হরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর আয়তন বিশাল। তিনি চাইলেন দীঘি সমেত দক্ষিণাংশে একটি আশ্রম স্থাপন করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি গ্রামবাসীদের সাথে পরামর্শ করেন।

গোঁসাইস্থলীতে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ মেলা বসত। ইহা অতি প্রাচীন মেলা। দেশ ভাগের পর হিন্দু স্থান-পাকিস্থান হল,সীমান্ত অতিক্রম কষ্টকর হল। ঐ মেলায় ত্রিপুরা থেকে বহু ত্রিপুরী নোয়াতিয়া, জমাতিয়া,রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত পাহাড়ী ভক্তরা যেত। দেশভাগের পর তাদেরও মনোবাঞ্ছা জানলেন হরেন্দ্রবাবু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কুরির দীঘির পাড়ে বৈশাখী মেলা প্রবর্তন করলেন।

পাহাড়ী-বাঙালী এই উভয় অংশের ভক্তদের কথা ভেবে হরেন্দ্রবাবুরা সুরেন্দ্র সাধুকে আমন্ত্রন জানালেন, আমতলীতে আশ্রম গড়তে। সুরেন্দ্র সাধু প্রথমে পাঠালেন শান্তময়ী সরকারকে জায়গাটা দেখে নিতে। পরে স্বয়ং এলেন সুরেন্দ্র সাধু। তিনি দেখে নীরবে চলে গেলেন। নির্দিষ্ট সময়ে দন্ডায়মান শতাধিক লোকের সাথে কথাও বলেন নি। মহাসড়কের নিকটবর্তী কোলাহলময় স্থান তাঁর পছন্দ নয়। তিনি কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে বল্‌লেন আমতলীতে আশ্রম গড়তে।

অতঃপর শুরু হল আশ্রমগড়ার কাজ। বনকাটা, মাটিকাটা, মাটির দেওয়াল,পাতিটিনের ঘর নির্মাণ হল। ১৩৮৩ বাংলাতে অর্থাৎ ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয় পাকা সমাধি মন্দির। গোঁসাইস্থলী থেকে মাটি এনে সনাতন গোস্বামী সমাধি মন্দির গড়া হল। আশ্রমের নাম হল সনাতন গোস্বামীর আশ্রম।

কৃষ্ণদাস গোস্বামীর চেহারা ছিল পাতলা, লম্বা কালো, আজানু লম্বিত হাত ছিল। শুভ্র পোষাক পরিধান করতেন। মস্তক মুন্ডিত ছিল, নিরামিষ ভোজন করতেন। গল্পগুজব করতে, হাসি, তামাসা করতে ভালবাসতেন। কিন্তু পাকস্থলীর প্রদাহ রোগে কষ্ট পেতেন। আগরতলায় মহারাজগঞ্জ বাজারে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে কীর্তন হয়। তাতে তিনি আসতেন। এমনই একবার কীর্তনে এসে তিনি অসুস্থ হন, পেটে অস্ত্রোপাচার হয়। কিন্তু মারা যান। ❑

শ্রীমৎ স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

সমতল ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার অন্তর্গত মেড়ডা নামক গ্রাম-নিবাসী সুশীল চন্দ্র চক্রবর্তী ও সুনীতি চক্রবর্তী নামক দম্পতির পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন সুব্রত চক্রবর্তী, যিনি পরবর্তী কালে শ্রীমৎ স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নামে খ্যাতহন। তাঁর জন্মতিথি হল আনুমানিক বৃহস্পতিবার, মাঘমাস, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৩৪ খৃঃ।

সুশীল চন্দ্র চক্রবর্তী (আঃ ১৯০২-১৯৮২খৃঃ) এবং সুনীতি চক্রবর্তী (আঃ ১৯১৫-১৯৯০খৃঃ) হলেন তিন পুত্র-কন্যার পিতা-মাতা। পুত্র-কন্যাদের নাম হল যথাক্রমে সুব্রত, সত্যব্রত এবং উমারাণী। সুশীল চক্রবর্তী ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামী। ভারত সরকার তাঁকে তাম্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছেন। রায়বাহাদুর অবিনাশ ভট্টাচার্য ও সুশীল চক্রবর্তী ছিলেন সম্পর্কে ভাই। সুশীল চক্রবর্তী সাধু-সন্তদিগকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাই সাধু-সন্তরা প্রায়ই তাঁর গৃহে এসে আদর-আপ্যায়ন পেতেন। কালিকানন্দ অবধূত নামক জনৈক তান্ত্রিক মহাত্মা প্রায়ই উত্তর ভারত থেকে মেড়ডাতে আসতেন এবং সুশীল চক্রবর্তীর গৃহে অবস্থান করতেন। সুনীতি চক্রবর্তী একবার কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হলে পর, ঐ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীই মরণের পাড় থেকে ফিরিয়ে আনেন। সুশীল চক্রবর্তীর অনুরোধেই কালিকানন্দ অবধূত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হলেন বালক সুব্রত-এর পৈতা-গুরু হতে ।

সুব্রতের শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে। তাঁর লেখাপড়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরপুরুষ রায় বাহাদুর অন্নদা রায় (১৮৫১-১৮৮০খৃঃ)-এর নামে স্থাপিত অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন যুবক সুব্রত। তখন দেশের পরিস্থিতি অতীব সমস্যাসঙ্কুল। সুব্রত গেলেন কলিকাতাতে জর্জ টেলিগ্রাফ নামক প্রতিষ্ঠানে কারিগরী শিক্ষা লাভ করতে । কিন্তু এদিকে দেশের বাড়ীতে লেগে গেল মহা উৎপাত। সাম্প্রদায়িক হিংসায় গ্রামের বাড়ী ছারখার হল। সুশীল চক্রবর্তী স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে আগরতলায় আশ্রয় নিলেন। সর্বহারা উদ্বাস্তু পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়, কলিকাতাতে উচ্চ শিক্ষার্থী পুত্র সুব্রতকে টাকা পাঠানো। পিতার নির্দেশে সুব্রত আগরতলাতে ফিরে এলেন এবং চাকুরী নিতে বাধ্য হলেন। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে, বিদ্যালয়ে, তিনি প্রায় তিন দশক কাল শিক্ষকতা করেছেন। নাগিছড়া, পানিসাগর, মনু, অভয়নগর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত বিদ্যালয়ে তিনি চাকুরী করেছেন। আগরতলাতে রামনগর ৫ নং রাস্তার পাশেই ঘর-বাড়ী তৈরী করে

সমগ্র পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। সেই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ, শ্রী বীরবল্লভ সাহা, শ্রী স্বপন মুখোপাধ্যায়, শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে সুব্রত বাবুর ব্যক্তিগত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁদের সাথে দাবা খেলতেন প্রায়ই এবং পান খেতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতার প্রভাবে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

স্বেচ্ছায় সেবানিবৃত্ত হবার পর, প্রায় এক দশক কাল (১৯৭৭-১৯৮৬খৃঃ) যাবৎ তিনি ঘরে-বাইরে যাতায়াত করতেন। রামনগর ৫নং রাস্তার পাশে অবস্থিত সুন্দর, সাজানো বাড়ীতে বাবা-মা, ভাই থাকতেন। বোনকে বিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় ১৯৮২ সালে। এই এক দশক তিনি প্রায়ই ভোলাগিরি আশ্রমে যাতায়াত করতেন। আমতলী গ্রামে অবস্থিত ভোলাগিরি আশ্রম স্থাপন করা হয়েছে ১৯৬৮ সালে। সেই আশ্রমের স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরি মহারাজ অত্যন্ত স্নেহ করতেন সুব্রত বাবুকে। সুব্রত বাবুর পরম মিত্র ছিলেন শ্রী চন্দ্রগুপ্ত দেববর্মণ নামক কৃষ্ণনগর নিবাসী শিক্ষাবিদ্। দুই বন্ধু হলেন আগরতলা নিবাসী, শিক্ষাবিদ্, অবিবাহিত, ভোলাগিরি মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত, গোবিন্দানন্দ গিরি মহারাজের স্নেহভাজন শিষ্য, তীর্থ পর্যটনপ্রিয়, মিতভাষী, এবং প্রায় একই সময়ে গৃহত্যাগী। ❑

শৈলেশ চন্দ্র পাল

সমতল ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত খণ্ডল পরগনাধীন ঋষ্যমুখ নামক গ্রাম-নিবাসী কৃষ্ণকিশোর পাল ও জ্ঞানদা সুন্দরী পাল-এর পুত্র হলেন শৈলেশ চন্দ্র পাল। ঋষ্যমুখ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পশ্চিমাংশ পূর্ব পাকিস্থানে গেল, পূর্বাংশ বিলোনীয়া মহকুমাধীন ভারতীয় গ্রাম রূপে চিহ্নিত হল।

কৃষ্ণকিশোর পাল ছিলেন চিকিৎসক। লোকসমাজে তিনি কৃষ্ণ কবিরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক এদেশে কবিরাজ বলে অভিহিত। তারাকুচা নিবাসী রামসুন্দর বৈদ্যের কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরী বৈদ্য হলেন কৃষ্ণকিশোরের সহধর্মিনী। এই দম্পতির পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা। তাদের নাম হল যথাক্রমে সুরেশ, রমেশ, অমরেশ, যোগেশ, শৈলেশ এবং কিরণ্ময়ী। এই ছয়জনের মধ্যে পাঁচ জনই গৃহী, একমাত্র শৈলেশ আশ্রমিক জীবন যাপন করছেন জোলাইবাড়ীতে। সম্ভবতঃ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সুরেশের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধু ঘরে আনেন কৃষ্ণকিশোর, যাতে জ্ঞানদাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সুখ সইল না। শৈশবে শৈলেশ অনাথ হয়ে গেলেন। আনুমানিক ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝিতে জ্ঞানদাসুন্দরী মারা যান। তিন মাসের পরই কৃষ্ণকিশোর মারা যান। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে চলছে। একই বৎসর মাতা-পিতাকে হারানোতে, গোটা পরিবার কাণা হয়ে গেল। পুত্রদের জন্য পাকা বাড়ী নির্মাণ করতে পরিকল্পনা নিয়ে ব্যর্থ হলেন কৃষ্ণকিশোর। স্ত্রীর অকাল মৃত্যু, গ্রাম্য ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ পরিকল্পনা, নাবালক পুত্র কন্যা ইত্যাদি স্মৃতি রেখে মর্মাহত কৃষ্ণকিশোর নিজেই চির বিদায় নিলেন।

শৈলেশের জন্মতিথি সঠিক রূপে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। সম্ভবতঃ ১৯৩৫/১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহা অনুমান মাত্র। কোন প্রমাণপত্র দেখার সুযোগ হয় নি। শৈলেশের শৈশব, বাল্য, কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে ঋষ্যমুখে। সমগ্র অঞ্চলে তখন আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। কুমিল্লাতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন আনন্দমোহন রায়। বিলোনীয়া নগরে আঃ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রকিশোর বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ঋষ্যমুখে রামবলী গণ (১৮৫০-১৯১২খৃঃ) ও গগন বিশ্বাস কর্তৃক আঃ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, নবীন ন্যায়পঞ্চানন বসন্তকুমার চক্রবর্তী ঋষ্যমুখ বিদ্যালয় গৃহে মাটির গুদাম ও টিনের ছানি দেন। খণ্ডলে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভগবান বৈদ্য ও নিশিকান্ত বৈদ্য থেকে দানে প্রাপ্ত ভূমিতে স্থাপিত হল খণ্ডল উচ্চ বিদ্যালয়। ইহার মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন নিবারণ চৌধুরী (১৯০৭-১৯৯২খৃঃ)

এবং যামিনী চৌধুরী (১৯১০-১৯৯৬খৃঃ)।

শৈলেশের পৈত্রিক বাড়ী থেকে মাত্র দুইশত হাত পূর্ব দিকে ঋষ্যমুখ বিদ্যালয়। সেখানেই সমগ্র অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করে। শৈলেশ ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি হল। মেধাবী, হাসিমুখী, কর্মচঞ্চল, ছোটখাট শৈলেশ সকলের প্রিয়। যেমন পড়ায়, তেমন খেলায় শৈলেশ অদ্বিতীয়।

দুর্ঘটনা

শৈলেশ তখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বিদ্যালয়ে রোজকার মত সেদিনও যাবার জন্য প্রস্তুত। বৌদির রান্না ভাত খেয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। বৌদির আদেশ ছুটির পরই বাড়ীতে আসতে হবে, খেলা চলবে না, বাড়ীতে এসে গরু চরাতে হবে, দারুকাঠ সংগ্রহ করতে হবে, নতুবা রাত্রে রান্না হবে না। সহপাঠীদের শত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও শৈলেশ না খেলে বাড়ী এল সোজা। ঘরে ফিরে ভাত খেয়ে শৈলেশ গেল গরু চরাতে। বাড়ীর সামনে পূর্ব দিকে বড় পুকুর, দক্ষিণ দিকে মাঠ। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে গরুকে চরতে দিয়ে, বাঁশি হাতে নিয়ে বকুল গাছের ডালে উঠল শৈলেশ। মনের আনন্দে বাঁশী বাজাতে থাকল।

এমন সময় কি কুক্ষণে এসে হাজির হল পাশের বাড়ীর একটি বালিকা। বকুল ফুলের বড়া খাবার ইচ্ছা হল বালিকার মায়ের। বালিকার অনুরোধে বকুল ফুল সংগ্রহ করে দিতে হবে। বকুল ফুলের ড্যল নরম। উপরে উঠে যেই ফুলে টান দিল, অমনি নীচের ডাল ভেঙ্গে শৈলেশ গেল পরে। বালিকা ছুটে পালাল। শৈলেশের আর্তনাদে লোকজন ছুটে এল। একটি পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেল বালক শৈলেশ। ইহা আনুমানিক ১৯৪৫ সালের ঘটনা। গ্রামের বৈদ্য-ওঝা ডাকা হল। বাঁশের কাইম বা কঞ্চি জড়িয়ে পা বেঁধে দেওয়া হল। পুষ্টিকর খাবার খেতে বলা হল। এভাবে একমাস বাড়ীতে রাখার পর, ঢাকাতে নেওয়া হল। ঢাকাতে একমাস রাখার পর, কলিকাতাতে নেওয়া হল। কলিকাতাতে ১১ মাস রাখতে হল। সেখানে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হল। সেখানে রামকৃষ্ণ দেবের ছবি দেওয়ালে সাজানো ছিল। সেই ছবি দেখে ভাল লাগত। আর ভালো লাগত জনৈকা সেবিকার মাতৃসুলভ ব্যবহার। সুরেশ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চলে আসেন, এগার মাস পরে পুনরায় যান রোগীকে আনতে। হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়ে, অনুজকে পিঠে করে গড়ের মাঠ, গঙ্গা, কালিঘাট ইত্যাদি দেখান। তারপর রেলপথে গৃহমুখে রওনা হন। ইহা ১৯৪৬ সালের ঘটনা।

শিক্ষা

পড়াশুনাতে ছেদ পড়ে গেল। এদিকে দেশ ভাগ হয়ে গেল। শৈলেশের পৈত্রিক বাড়ী পূর্ব পাকিস্থানভুক্ত হল। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় দেশ বিধ্বস্ত। এর মধ্যেই পৈত্রিক বাড়ীতে থেকেই হিন্দুস্থানভুক্ত ঋষ্যমুখ বিদ্যালয়ে শৈলেশ ভর্তি হল তৃতীয় শ্রেণীতে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে বৃত্তি পরীক্ষা দিল এবং সারা ত্রিপুরাতে প্রথম হল। প্রতিমাসে তিন টাকা করে বৃত্তি পাওয়া গেল। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পুনরায় প্রথম স্থান পেয়ে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পাওয়া গেল। ঋষ্যমুখে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত আছে। তাই বিলোনীয়া নগরে গিয়ে ব্রজেন্দ্রকিশোর বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হল। সেখানে থাকার জন্য কোন সহৃদয় ব্যক্তির কৃপা ব্যতীত উপায় নেই। একজনের বাড়ীতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। সপ্তম শ্রেণী এভাবে গেল। অষ্টম শ্রেণীর মাঝামাঝিতে এসে সমস্যা দেখা দিল থাকার ব্যাপারে। অতঃপর ছাত্রদরদী, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মহেন্দ্র পাল মহাশয় নিজের বাড়ীতে কয়েক দিন রাখলেন। বিলোনীয়ার শ্রীগুরু ভাণ্ডারের হরেন্দ্রকুমার সাহা মহাশয়ের নিকট জানতে পারা গেল যে কৈলাস-হরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে ছাত্র রাখে। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাস-হরে নবনির্মিত রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাবাব রাস্তা দুর্গম। তাই পূর্ব পাকিস্থান হয়ে গেলেন। পারপত্র সংগ্রহ করতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। সেখানে রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা হল। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে সেখান থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর দীর্ঘ বিরতির পর, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয় থেকে বেসরকারী পরীক্ষার্থীরূপে পরীক্ষা দিয়ে কলা বিভাগে স্নাতক হন।

চাকুরী

১৯৫৯-৬০ সালে করিমগঞ্জে রামকৃষ্ণ মিশনে শৈলেশ মাত্র দশ মাস থাকেন। বড় ভাই রমেশ বার-বার চিঠি দিতে থাকেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে চিঠি যেত। পূর্ব পাকিস্থানের ঋষ্যমুখে অবস্থিত পৈত্রিক ভূসম্পত্তি বিক্রয় করে বা বিনিময় করে আনতে হলে শৈলেশের স্বাক্ষর আবশ্যক। তখন সেখানে ভয়াবহ পরিস্থিতি। করিমগঞ্জ থেকে রওনা দিয়ে শৈলেশ প্রথমে এলেন জোলাইবাড়ীস্থিত সুরেশের ঘরে। কয়েকদিনের মধ্যে ভারতের ঋষ্যমুখে গিয়ে পৈত্রিক ভূসম্পত্তির কাজ সমাধা করলেন এবং নিজের অংশটুকু রমেশকে দিয়ে দিলেন।

করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজির সাবধানবাণীই সঠিক বলে প্রমাণিত হল। তিনি বিষয়-আসয়ে জড়ানোর পরিণাম নিয়ে শৈলেশকে সাবধান করতেন। জোলাইবাড়ী

উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫১খৃঃ) যাঁরা স্থাপন করলেন তাঁদের অন্যতম উদ্যোক্তা শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী শ্রী ক্ষেত্রমোহন মজুমদার ভাবলেন শৈলেশের মত মেধাবী ও ত্যাগী ব্যক্তিকে শিক্ষক রূপে পেলে ভাল হয়। ক্ষেত্রবাবুর অনুরোধে বেসরকারী জোলাইবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে চাকুরী নিলেন। করিমগঞ্জে ফিরে গেলেন না। এক বৎসর তিন মাস ঐ বিদ্যালয়ে কাজ করলেন। দীর্ঘ বিরতির পর আবার চাকুরী নিলেন, এবার সরকারী বিদ্যালয়ে। ১৯৬৬খৃঃ থেকে মার্চ ১৯৯৯খৃঃ পর্যন্ত একটানা ৩২ বৎসর জোলাইবাড়ীতে চাকুরী করে অবসর গ্রহণ করেন।

দীক্ষা ও সাধন প্রণালী

কিশোর বয়সে দুর্ঘটনাগ্রস্থ শৈলেশ কলিকাতাতে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি দেখেন। সেই স্মৃতি বালকের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেল। অতঃপর তাঁর সমগ্র জীবন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে পরিচালিত হল। পরিণত বয়সে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেন।

আশ্রমিক জীবন

শৈলেশের আশ্রমিক জীবন শুরু হল ছাত্রাবস্থায় যখন তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। অনাথ শৈলেশকে কৈলাস-হরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেন শিক্ষাগুরু মহেন্দ্র পাল। কৈলাস-হরে প্রায় পাঁচ বৎসর রইলেন। তারপর গেলেন করিমগঞ্জে, রইলেন দশ মাস। সেখানে ছাত্রাবাসের প্রমুখ ছিলেন। জোলাইবাড়ীতে ক্ষেত্রবাবু কিছু ভূমি দিলেন আশ্রম গড়ার জন্য। জোড় কদমে কাজ করলেন, ছাত্রদের সাথে করে। কিন্তু মৌখিক দান, লিখিতরূপে, বৈধভাবে দান নয়; তাই সেই ভূমি ছেড়ে দেন। জোলাইবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের চাকুরীও ছাড়লেন।

জোলাইবাড়ী বাজারের পশ্চিমে-উত্তরে খাস ভূমির সন্ধান পেলেন। জঙ্গলাকীর্ণ, টিলাভূমি, বিশাল জায়গা। ১৯৬২-১৯৬৫খৃঃ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই বনভূমিকে আশ্রমে রূপান্তরিত করেন। এই আশ্রম গড়তে প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করতেন টাকার প্রয়োজনীয়তা। টাকা তখন মাটি নয়, টাকা তখন স্বর্ণতুল্য মহামূল্যবাণ। তাই বাধ্য হয়ে পাশাপাশি চাকুরী নিলেন (১৯৬৬-১৯৯৯খৃঃ)। চাকুরীর প্রায় অধিকাংশ উপার্জন আশ্রমের কাজে ব্যয় করলেন। প্রায় ৪৪ কানি ভূমি নিয়ে গড়া আশ্রমে শাল, সেগুন, করই, প্রভৃতি মূল্যবাণ কাঠ যেমন আছে, তেমনি আছে ফল ও ফুলের গাছ, ছাত্রাবাস, মন্দির, সাধুনিবাস, পুকুর, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি।

সমাজ সেবা

আশ্রমে দুর্গাপূজা চলেছে ৩৭ বৎসর (১৯৬১-১৯৯৭খৃঃ) যাবৎ। কীর্তন চলেছে ৩৫ বৎসর যাবৎ। কালীপূজা ১৯৬১খৃঃ থেকে অব্যাহত আছে। বস্ত্রদান ১৯৬১ থেকে অব্যাহত আছে। ছাত্রাবাস ১৯৬৩ থেকে অব্যাহত আছে। আশ্রমের আশে-পাশে বসবাসকারী কয়েকটি দুঃস্থ পরিবারকে স্বাবলম্বী করানোর জন্য গরু, ছাগল, হাঁস, কবুতর, মোরগ কিনে দিয়েছেন। ঘরের ছানি দিতে বাঁশ, ছন, টিন কিনে দিলেন। রুগ্ন ও দুঃস্থ ছাত্র সুমন ঘোষকে ভেলোর নিয়ে অস্ত্রোপাচার করাতে বেশ কিছু টাকা দিয়েছেন। ছোট বোন কিরণময়ীকে বিয়ে দেন এবং জোলাইবাড়ীতে ভূসম্পতিদিয়ে প্রতিষ্ঠা করে দেন। রমেশকে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ দেন এবং রমেশের পুত্রদিগের উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করেন। আশ্রমে বসবাসকারী দুঃস্থ ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করছেন ১৯৬৩ সাল থেকে। রক্তদান শিবির করে সরকারী চিকিৎসালয়ে প্রচুর রক্তদান করেছেন ২০০১ সালে। একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করার কৃতিত্ব তাঁরই। শুভ্র ধুতি-পাঞ্জাবী পরিধান করেন। অধিকাংশ সময়েই নিরামিষ ভোজন করেন।

উপলব্ধি

বিকলাঙ্গ দেহ নিয়েই একজীবনে শৈলেশ মহারাজ অনেক করেছেন। কিন্তু তিনি প্রচার বিমুখ, আত্মভোলা মানুষ। পরিণত বয়সে তিনি উপলব্ধি করলেন অন্য অনেক বারোয়ারী পূজাতে চাঁদা আদায়ে জুলুম হয়, ব্যয়ে দুর্নীতি হয়। তাঁর আশ্রমে ভবিষ্যতে তাই হতে পারে। তাই দুর্গাপূজা ও কীর্তন বন্ধ করে দিলেন নিজে জীবিত থাকতেই। তাঁর আরেকটি উপলব্ধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত মন্তব্যের দ্যোতক। ❑

শ্রীশ্রী ১০৮ মমতাময়ী সরস্বতী

পূর্ব্ব বঙ্গের শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন এক বালিকা, যিনি প্রথম জীবনে বাণী রায় নামে এবং উত্তর জীবনে মমতাময়ী সরস্বতী নামে পরিচিতা হন। তাঁর পিতা-মাতার নাম বঙ্গেশ্বর রায় এবং সুনীলপ্রভা রায়। তাঁর প্রথম দীক্ষাগুরুর নাম বিনয়ানন্দ তীর্থ।

হবিগঞ্জের বৈকুন্ঠনাথ রায় ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবি এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দৃঢ় সমর্থক। বৈকুন্ঠনাথের পুত্র বঙ্গেশ্বর। বঙ্গেশ্বরের পুত্র-কন্যা মোট দশ জন। তাঁদের নাম হল যথাক্রমে বিনয়, বাণী, রাণী, বিমল, বিজয়, সবিতা, বিষ্ণুপদ, উমাধন, বিপ্লব এবং অনুকা। দ্বিতীয় সন্তান শ্রীমতী বাণী রায়। বাণীর জন্মদিন হল আনুমানিক ১৩ই আশ্বিন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ(১৯৩৬ খৃঃ)। বাণীর শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয় হবিগঞ্জে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত বিভাজন, শ্রীহট্টে জনমত যাচাই (জুলাই ১৯৪৭খৃঃ) ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রবল হয়েছিল, তাই কয়েক বৎসর অসমের তিনসুকিয়াতে মামার বাড়ীতে কাটান বাণী রায়। দেশের উত্তেজনা প্রশমিত হলে পর, বাণীকে হবিগঞ্জে আনা হল। সেখান থেকেই ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন বাণী রায়। মহাবিদ্যালয়ে হিন্দু মেয়েকে ভর্ত্তি করানো বিপজ্জনক মনে করে, মা বাবা বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেন অতিশীঘ্র। পাত্র কলিকাতা নিবাসী নলিনী মোহন চৌধুরী । নলিনীমোহন বিপত্নীক, তিনপুত্রের পিতা, পুলিস বিভাগে পদস্থ কার্যকর্তা। কালক্রমে নলিনী ও বাণীর এক কন্যা জন্মিল। নাম রাখা হল কেকা চৌধুরী। বাণী সযত্নে ও সমান আদরে লালন-পালন করেন সতীনের তিনপুত্রকে এবং নিজের কন্যাকে। নলিনীমোহন ভেবে-চিন্তে তিন পুত্রের লেখাপড়ার, জীবনে প্রতিষ্ঠার ও বিবাহের ব্যবস্থা করে যান। নলিনীমোহন (আনুমানিক ১৯১৫-১৯৮১খৃঃ) মারা যান ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর বাণী নিজের কন্যাকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়িয়ে, বিবাহ দিয়ে (জানুয়ারী ১৯৮৭খৃঃ) পারিবারিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান।

বাণী রায় এগার বৎসর বয়সে (১৯৪৭খৃঃ) দীক্ষা লাভ করেন। গুরুর নাম ছিল শ্রীমৎ বিনয়ানন্দ তীর্থ। গৃহী দয়ানন্দ কর্তৃক স্থাপিত অরুণাচল আশ্রম বর্তমানে শিলচরে অবস্থিত। সেই আশ্রমের সাধক বিনয়ানন্দ তীর্থ প্রথম দীক্ষা দেন বাণী রায়কে । লেখাপড়া, দেশ বিভাজন, দেশত্যাগ, মামার বাড়ীতে আশ্রয় ইত্যাদির পাশাপাশি অন্তঃসলীলার মত নীরবে, নিভৃতে সাধন-ভজন করে চলেছেন বাণী রায়। তিনি গৃহিনী হয়েছেন, ঘর-সংসার

করেছেন,মাতা হয়েছেন, কিন্তু বিষয়াসক্ত হন নি, অপত্যস্নেহে অন্ধ হন নি। কলিকাতার বালিগঞ্জে রবীন্দ্র সরোবর-এর উত্তর তীরে কালী মন্দির স্থাপিত। এই কালীমন্দিরে হরিপদ চক্রবর্তী নামক জনৈক পুরোহিত ছিলেন;তিনি শুধু পুরোহিত নন, একজন একনিষ্ঠ সাধকও বটে। ঐ সাধক হরিপদ চক্রবর্তী ক্রমে- ক্রমে বাণী রায়-এর একনিষ্ঠ ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে স্বীয় কন্যা-জ্ঞানে স্নেহ করতেন বাণীকে। এছাড়া, তারকেশ্বর, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, কেন্দুবিল্ব প্রভৃতি পীঠস্থান দর্শনে এবং তথাকার সাধুসন্তদিগকে ভান্ডারা দিতে প্রায়ই যেতেন বাণী রায়। স্বামী প্রয়োজনীয় অর্থ দিতেন। সতীন পুত্ররা সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বামী মৃত(১৯৮১খৃঃ),কন্যা সৎপাত্রস্থ(১৯৮৭খৃঃ)- আর কে ধরে রাখে বাণী রায়কে!

১৩৯৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণী পূর্ণিমা (আগষ্ট ১৯৮৭) হল বাণী রায়ের জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। সেই শুভ দিনে তিনি সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিতা হন। দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী। দীক্ষান্তে মমতাময়ী সরস্বতী-এই নাম প্রাপ্ত হন। মমতাময়ী তান্ত্রিক সাধন প্রণালীতে দীক্ষিতা। তন্ত্র সাধনার জাদুকরী রূপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিতে হুগলী জিলার কেষ্টপুর গ্রামের মহাশ্মশানবাসী নির্মলানন্দ সরস্বতী- এর নিকট কিছু দিন অবস্থান করেন মমতাময়ী সরস্বতী। অসীম ক্ষমতাশালী নির্মলানন্দকে লোকে বলত ভৈরব বাবা বলে। সেই শ্মশানের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা মমতাময়ী স্মৃতির ভান্ডার পুষ্ট করেছে। কিন্তু একবার ভৈরব বাবা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেছেন। এই কথা যখন মমতাময়ী জানতে পারলেন, তখন তিনি দৃঢ়চিত্তে, বলিষ্ঠকণ্ঠে প্রতিবাদ করে সরে পড়েছেন।

বঙ্গদেশ ছেড়ে হিমালয়ের অভিমুখে তীর্থ পযটন শুরু করলেন মমতাময়ী। পথে গয়া,কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, হরিদ্বার, ঋষিকেশ দর্শন হল। তারপর হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ। আত্মবিশ্বাসে ও গুরুকৃপায় ভরসা করে রওনা হলেন অজানার পথে। থাকা-খাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নাই, এছাড়া মহিলার পক্ষে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্তু পূর্ব জন্মার্জিত শুভ কর্মফলের প্রেরণায় গৃহবন্ধী হয়ে থাকবার পাত্রী নন মমতাময়ী। তীর্থপর্যটন কালে যে-কয়জন মহাত্মার সাথে সাক্ষাৎ-দর্শন হল তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন সদানন্দ মৌনীবাবা, রামানন্দ-গিরি এবং পরমানন্দ মহারাজ। উত্তর ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করে মমতাময়ী পূর্ব্বপরিচিত অরুণাচল আশ্রমে অর্থাৎ শিলচর এলেন। ইহা ১৩৯৫ বাংলার ঘটনা। ১৯৪৭ সালের বাণী রায় এবং ১৯৮৮সালের মমতাময়ীর মধ্যে অনেক তফাৎ। এই আশ্রমের কার্যকলাপ ভাল লাগে নি। তীব্র প্রতিবাদ করে সুকৌশলে বেড়িয়ে এলেন।

প্রায় দুই বৎসর (১৯৮৭-১৯৮৮খৃঃ) নানা তীর্থে ভ্রমণ করে অবশেষে ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বরে দাদা বিনয় রায় ছোটবোন মমতাময়ীকে নিয়ে এলেন আগরতলায়।

বিনয় রায় হলেন শিক্ষক, লেখক এবং তীক্ষ্ণধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর উদ্যোগে এবং কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় এক মঠ স্থাপন করা হল। নাম মহা নির্ব্বাণ মঠ, স্থান আড়ালিয়া, উত্তর যোগেন্দ্র নগর। সেই মঠের প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারী চমৎকার। আগরতলা নগরের পূর্ব্বে হাওড়া নদীর তীরে আড়ালিয়া। আড়ালিয়াস্থিত মহানির্ব্বাণ মঠ স্থাপনের শুভদিন হল অক্ষয় তৃতীয়া ১৩ই বৈশাখ ১৩৯৭বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ এপ্রিল ১৯৯০ খৃষ্টাব্দ।

১৩৯৭বঙ্গাব্দের অক্ষয় তৃতীয়াতে মঠ স্থাপন করা হল। ইহা শৈব মঠ। মন্দিরের মধ্যস্থলে পাকা যজ্ঞকুন্ড নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দিরের দক্ষিণ পাশে সন্ত নিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। অগ্রজ বিনয় দাদার ছত্র ছায়ায় অনুজা মমতাময়ী সাধন ভজন ও লোকসেবা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৩৯৭বঙ্গাব্দ থেকে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দেবী পক্ষে পূজা-অর্চনা যাগ-যজ্ঞ করা হয়। মমতাময়ী নবরাত্র উপবাস করে। যজ্ঞ করেন, আহুতি দেন, দশম দিবসে ভক্তদের খিচুরী প্রসাদ খাওয়ান। এত দিন উপবাসে থাকায় শরীরের উপর প্রচন্ড ধকল যায়। প্রায় একমাস লাগে শরীর সুস্থ-স্বাভাবিক হতে।

১৩৯৯ বাংলার চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজার শুভ তিথিতে তিনি এক কঠিন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। কঠোর তপস্যার প্রয়োজন এই যজ্ঞ সমাপন করতে। তিনি স্থির বুদ্ধিতে,দৃঢ় চিত্তে সেই তপস্যা সমাপন করে যজ্ঞ করেন। ফলে নিজের দেহে-মনে ঐশী শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করেন। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ অকস্মাৎ এলে, ঘরের বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সাধক-সাধিকার ক্ষেত্রে ও অনুরূপ প্রভাব কখনো-কখনো পরিলক্ষিত হয়। মমতাময়ীর ক্ষেত্রেও তাই হল। ঠিক সে-সময় প্রতিকূল শক্তি গোলমাল শুরু করল। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বিরুদ্ধাচরণ এমন পর্যায়ে পৌছল যে, তাঁরা মঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাংবাদিক ভূপেন দত্ত-ভৌমিক আগরতলা-কলিকাতা বিমান ভাড়া বহন করলেন। ১৪০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই ত্রিপুরা ছাড়লেন, উত্তর কাশীতে ৪৭ দিন ছিলেন। সেখানে তিন জন সন্ত খুব সহায়তা করলেন, তাঁরা হলেন রামানন্দ গিরি মহারাজ, মহেশ্বর বাবা এবং স্বামী পরমানন্দ। অগ্রজ বিনয় রায়কে কৃপা করে দীক্ষা দেন রামানন্দ গিরি মহারাজ। উত্তর কাশী থেকে গঙ্গোত্রীতে গমন করেন এবং শ্রীমৎ দন্ডী স্বামীর আশ্রমে তিন দিন ছিলেন। অতঃপর ত্রিপুরাতে লোকহিতে কিছু করার জন্য আগরতলায় ফিরে যেতে নির্দেশ দেন পরম পূজনীয় রামানন্দ গিরি মহারাজ। তাই ১৪০০বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের গোড়াতেই মহানির্বাণ মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

মহানির্বাণ মঠের আশে-পাশে বসবাসকারী পরিবার গুলো এই মঠকে ভালোবাসে। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা এই মঠে রোজ আসে।এই মঠের দেবালয়ে বসে কীর্তন করে, নিজেদের পরিবারের সুখ-দুঃখের কথা বলে; আশ্রমের বাৎসরিক উৎসবে সহযোগীতা

করে। মমতাময়ী হলেন বালক-বালিকাদের প্রিয় ঠাকুরমা। ঠাকুরমা তাদের জন্য প্রসাদ দেন, খেলার সরঞ্জাম কিনে দেন; কাপড় দেন, বই দেন। সুরাপান নিবারণ কল্পে ঠাকুরমার অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। গৃহকোণে বউ, মা, ঠাকুরমা সেজে সহজ, স্বাভাবিক জীবন যাপন করার পাত্রী নন মমতাময়ী। দুঃসাহসিক উপায়ে মহৎ কিছু করার দুর্বার আগ্রহ তাঁর মধ্যে প্রবল। হিমালয়-অভিযান-অভিপ্রায় এবং আত্মস্থ হবার অভিপ্রায় — এই দোলায় তাঁর মন দোলে। ❑

শ্রীমৎ ভক্তিশ্রবণ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ

সমতল ত্রিপুরার খণ্ডল পরগনাতে বড়ইয়া নামক গ্রাম-নিবাসী অনন্তকুমার বল ও সুশীলাসুন্দরী বল নামক দম্পতির অন্যতম পুত্র হলেন শ্রী দুলাল বল, যিনি উত্তরকালে শ্রীমৎ ভক্তিশ্রবণ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ নামে খ্যাত হন। দুলালের জন্ম আনুমানিক ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ আনুঃ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে।

অনন্তকুমার বল ছিলেন শিক্ষাবিদ্, কবি এবং লেখক । তাঁর রচিত বহু গান অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। তিনি মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আড়িগান অর্থাৎ কবির লড়াইতে অংশগ্রহণ করে গান গাইতেন। দেশ বিভাজনের কয়েক বৎসর পর তিনি ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে আসেন, উদয়পুরে নিকটবর্তী চন্দ্রপুরে তাঁর ঘর-বাড়ীতে পুত্র-কন্যারা বাস করছেন। তাঁর পুত্র-কন্যাদের নাম হল যথাক্রমে দুলাল, উজ্জ্বলী, অঞ্জলী, মৃণাল, গোপাল এবং বিজলী।

দুলালের শৈশব, বাল্য, কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে বড়ইয়া গ্রামে। পাঠশালাতে তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়েছিল। বাল্যকাল থেকেই তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া গেল। তাই শিক্ষাবিদ্ পিতা মেধাবী পুত্রকে কলিকাতাতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কালক্রমে বিদ্যার্থী দুলাল তিনটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বিষয় তিনটি হল দর্শন, সংস্কৃত এবং বাংলা।

কিন্তু ক্রমেই যুবক দুলালের মনে পার্থিব বিষয়ে উদাসীনতা দেখা দিল। কোন আঘাত থেকে নয়, কোন ব্যাথা-বেদনা থেকে নয়, কোন বেকারত্ব থেকে নয়, কোন অভাব-অভিযোগ থেকে নয়, কোন ব্যর্থতা থেকে নয়, অন্তরের অন্তর্নিহিত সুপ্ত বৈরাগ্যভাব ক্রমেই জাগ্রত হওয়াতেই শিক্ষিত , সুদর্শন যুবক দুলাল গৃহত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন।

কলিকাতাতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অবস্থিত। সেই মঠের সঙ্গে পরিচয় হল। পরিচয় ক্রমেই ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার-বিচার মনঃপূত হল। সেখান থেকেই দীক্ষা নিলেন দুলাল। দীক্ষান্তে নাম হল শ্রীমৎ ভক্তিশ্রবণ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ।

পরমার্থের সন্ধানে তরুণ তপস্বী নানা তীর্থ ভ্রমণ করেছেন, বহু শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। বহু সাধু-সঙ্গ করেছেন। আচারে-বিচারে তিনি কট্টর নৈষ্টিক সন্ন্যাসী। ছাত্রজীবনে তিনি যেমন মেধাবী ছাত্র হিসাবে খ্যাত ছিলেন, তেমনি সন্ন্যাসজীবনে তিনি নিষ্ঠাবান সন্ত,

সুপরিচিত সুবক্তা ও সৎগুরু হিসাবে শ্রদ্ধার পাত্র।

উড়িষ্যা প্রদেশে ভূবনেশ্বর নগরের নিকটবর্তী শহীদনগরে শ্রীগৌরাঙ্গ আশ্রম স্থাপন করে তিনি ইহার মঠাধ্যক্ষ হয়েছেন। অতঃপর কলিকাতা মহানগরের দক্ষিণ প্রান্তে যোধপুর পার্ক নামক স্থানে তিনি আরেকটি আশ্রমিক শাখা স্থাপন করেছেন। তাঁর মেধা, পাণ্ডিত্য এবং তপঃ প্রভাবে ভক্তরা ক্রমবর্দ্ধমান হারে আকৃষ্ঠ হচ্ছে।

কবি অনন্ত বলের মতই কবি ছিলেন শারদা রঞ্জন ভট্টাচার্য , দুর্গাচরণ ধোপী, গোবিন্দ ধোপী, অন্নদা নট্ট, সুবল ভট্ট, নবকান্ত শীল, শচীন শীল, বৈকুন্ঠ শীল, যামিনী তেলীপাল, মহেন্দ্র গণ-চৌধুরী, যশোদা কর্মকার, মাধবচরণ দেবনাথ, হরমোহন দত্ত, কামিনী মিত্র, মিলন মিত্র, সুধন পাল। ❑

শ্রীমৎ স্বামী প্রেম পুরী মহারাজ

পশ্চিম বঙ্গে হাওড়া জিলাধীন খাঁটোরা নামক গ্রামে কালিপদ দত্ত ও সুষমারানী দত্ত নামক দম্পতির অন্যতম পুত্র শ্রীপ্রণবকুমার উত্তরকালে শ্রীমৎ স্বামী প্রেম পুরী মহারাজ নামে আখ্যায়িত হন। প্রণবের জন্মদিন হল ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ।

কালিপদ দত্ত ছিলেন গ্রাম্য চিকিৎসক। তাঁর হাতযশ ছিল। তাই উপার্জন ভাল ছিল। তিনি হলেন নয় জন পুত্র-কন্যার পিতা। তাদের নাম হল যথাক্রমে পদ্মারানী,বেলারানী, দিলীপকুমার,ভক্তিপদ,করবী, সনৎকুমার, প্রণবকুমার এবং দেবকুমার। প্রণবের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে পিত্রালয়ে, কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে মাতুলালয়ে। ডাঃ কালিপদ দত্ত মারা যান ১৯৪৬ সালে। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহারা প্রণব মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। খাঁটোরা গ্রামে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত বিশাল বাড়ী থাকা সত্ত্বেও সনৎ, প্রণব ও দেবকুমার নাবালক বিধায় মাতুলালয়ে আনীত হলেন। তাঁদের মাতুলালয় হল হাওড়ার কদমতলাতে। মামা রবীন্দ্রনাথ কুন্ডু হলেন গাড়ী-ব্যবসায়ী এবং নেতৃস্থানীয়, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। মামার বাড়ীতে প্রায় ১২ বৎসর রইলেন, থাকা, খাওয়া, কাপড়, ঔষধ, লেখাপড়া প্রভৃতি বাবদ সব খরচ মামা বহন করেন। প্রণব সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত মামার বাড়ীতে থাকার পর নিজের বাড়ীতে এলেন;ততদিন বড় ভাইরা উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

১৯৫৮ থেকে ১৯৯০খৃঃ পর্যন্ত প্রণব নিজের বাড়ীতে রয়েছেন এবং নানাভাবে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেছেন। প্রনব ও দেবকুমার এক সাথে বিভিন্ন ব্যবসা করেছেন। দিন মজুর, কাঠমিস্ত্রী, বিদ্যুৎ মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, বিয়ে বাড়ীতে আলোক সজ্জাকারী, যাত্রামন্ডপ সজ্জাকারী, পুস্তক বাঁধাইকারী দপ্তরী হয়ে কাজ করেছেন । নিরীহ ও নির্ভরযোগ্য কর্মী হিসাবে গ্রামে সুনাম ছড়িয়ে গেল। তাই এক দিন ব্যাঁটরা থানার দারোগা বাবু ডেকে পাঠালেন। থানার বড় বাবু ডেকেছে , শুনে প্রণব একটু অপ্রস্তত হলেন। থানায় গিয়ে পেলেন ভাল ব্যবহার এবং থানার নথিপত্র বাঁধানোর দায়িত্ব। এই সরকারী কাজটি নিষ্ঠার সহিত করে দিলেন। সেই খবর কলিকাতার লাল বাজারে পৌঁছল। সেখানে গিয়েও পেলেন ভাল ব্যবহার এবং নথিপত্র বাধানোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১৯৮৫ সালে দাদা দিলীপকুমার এবং ১৯৮৭ সালে মাতা সুষমারানী মারা যান। এই দুই মৃত্যু প্রণবকে চিন্তিত করে ফেল্‌ল । ১৯৯০ সালের একেবারে শেষ দিকে

শীতকালে প্রণবের জীবনে এল পরিবর্তন। জীবনের অনিত্যতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হল এবং বিষয়-বাসনা হ্রাস পেতে লাগল। প্রণবেব পাড়া-প্রতিবেশী জনৈক যুবক গৃহত্যাগী হয়েছিলেন কয়েক বৎসর আগেই। তিনি থাকতেন হৃষীকেশ তীর্থে। তাঁর আশ্রমের নাম জয় মা কালী আশ্রম। তাঁর আশ্রমিক নাম সিদ্ধেশ্বর ব্রহ্মচারী। সিদ্ধেশ্বর ব্রহ্মচারী ১৯৯০ সালের শেষ ভাগে শীতকালে এলেন জন্মভূমিতে। প্রণব কথা বলেন সিদ্ধেশ্বর ব্রহ্মচারীর সাথে। প্রণবের পছন্দ হল। সিদ্ধেশ্বর ব্রহ্মচারীর সাথে চলে যাবেন বলে ঠিক করে ফেলেন মনে-মনে। অনুমতি নিলেন ভাই-বোনদের ।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সাত বৎসর কাল পরিব্রাজক রূপে নানা তীর্থে ভ্রমণ করেছেন প্রণব দত্ত। বাংলা,বিহার,উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ-এই কয়টি প্রদেশে যত তীর্থক্ষেত্র আছে প্রায় সব কয়টিতেই গেছেন। বিভিন্ন আশ্রমে রয়েছেন। নানা সন্ত সম্মেলনে যোগদান করেছেন। এই কয় বৎসর তিনি রামায়ণ ও মহাভারত অধ্যয়ন করেছেন।

১৯৯৮-সালে পরিব্রাজক জীবন শেষ হল। মহামন্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণু পুরীজি মহারাজের দর্শন পেলেন। তাঁর সাথে কথা বলে ভাল লেগে গেল। মনে হল যেন এক নির্ভর যোগ্য আশ্রয়স্থল পাওয়া গেল। তিনি কৃপা করে দীক্ষা দিলেন এবং ত্রিপুরাতে নিয়ে এলেন। দীক্ষান্তে নামকরণ করা হল শ্রীমৎস্বামী প্রেম পুরী মহারাজ নামে। ১৯৯৮ সাল থেকে আগরতলাতে মেলার মাঠে অবস্থিত পরমার্থ সাধক সঙ্ঘের আশ্রমে আছেন। শ্রীমৎ স্বামী অনির্বাণ পুরী মহারাজ আছেন এই শাখার পরিচালক রূপে। এখানে ছাত্রাবাস ও দেবালয় পরিচালিত হচ্ছে আশ্রমের পক্ষ থেকে। মঠাধ্যক্ষের ভক্ত-শিষ্যরা একাজে সহযোগীতা করেন।

আগরতলাতে জনসমাজে এবং সাধুসমাজে প্রেম পুরী মহারাজ বিখ্যাত ব্যক্তি নন। তিনি সুপন্ডিত নন, সুবক্তা নন, সুসংগঠক নন, সুগায়ক নন। তিনি নিরীহ, গোবেচারা গোছের লোক। কারো সাথে, পাছে থাকেন না। তাঁর গড়ন পাতলা; গায়ের রঙ শ্যামলা। তাঁর উদ্যম,উৎসাহ,উদ্যোগ নিম্নগ্রামে। তিনি অল্পতেই তুষ্ট। গুরুদেবের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা অগাধ। কোন উচ্চঅভিপ্রায় নেই। যখন যেখানে পাঠানো হবে সেখানেই হাসিমুখে যাবেন, নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ নেই। পরিচালন করার মেধা নেই, কিন্তু পরিচালিত হবার নিষ্ঠা আছে তাঁর স্বভাবে। ❑

শ্রীমৎ দীনদয়ালানন্দ মহারাজ

পূর্ব্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত বড়শর নামক গ্রাম-নিবাসী দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী ও প্রিয়বালা চক্রবর্ত্তীর পুত্র হলেন শ্রী সুরেশ চক্রবর্ত্তী। তাঁর জন্মতিথি হল ২৭ শে বৈশাখ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ; সেদিন ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমা; খৃষ্টাব্দের হিসাবে মে মাস ১৯৪১ খৃঃ। তিনি উত্তর জীবনে শ্রীমৎ দীনদয়ালানন্দ মহারাজ নামে পরিচিত। ভক্তবৃন্দ আদর করে ডাকেন দাদা মহারাজ।

তাঁর পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন রাঢ় দেশীয় ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ পরিবার অদ্বৈত মহাপ্রভুর শাখার শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বংশাবতংশ। গঙ্গার পশ্চিম উপকূল ত্যাগ করে পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় আগমনের কারণ ঐতিহাসিক ও পারিবারিক। কবে, কয় পুরুষ আগে, পুর্ব্ববঙ্গে, কে আসেন-এসব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। উত্তর পুরুষ একজনের নাম পাওয়া গেল। তাঁর নাম বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী। বৈদ্যনাথের সপ্তম পুত্রের নাম প্রাণনাথ। প্রাণনাথের তিনপুত্রের নাম হল হরিবন্ধু,জগদ্বন্ধু,দীনবন্ধু। দীনবন্ধুর পুত্র হলেন সুরেশ,অর্থাৎ দীনদয়ালানন্দ মহারাজ।

দীনবন্ধু দীর্ঘায়ু হন নি। তিনি মারা যান অকালে। তখন সুরেশের বয়স মাত্র আট মাস। অনাথ সুরেশের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে ময়মনসিংহ জেলায়। মাতা প্রিয়বালা দেবী তখনও জীবিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাজন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পিতৃবিয়োগ, অভিভাবকশুন্যতা ইত্যাদি কারণে সুরেশের পাঠশালাগত বিদ্যাশিক্ষা খুব বেশী অগ্রসর হয় নি। গ্রাম্য পাঠশালাতে যতটুকু সম্ভব তাই পড়াশুনা হল,যদিও মেধার কমতি ছিল না।

বালক সুরেশের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয় বার বৎসর বয়সকালে,১৩৫৯ বঙ্গাব্দে। উপনয়ন সংস্কার পাবার আগেই শিবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ জেগেছিল কিশোর সুরেশের মনে। তিনি পিতৃদেবের খোঁজ করতেন প্রায়ই। তখন মাতা ও পিসি নিকটবর্ত্তী শিবমন্দিরে নিয়ে বল্তেন, ইনিই তোমার বাবা, এবং ধ্যানমগ্ন বলেই নীরব। শিবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা কিশোর মনে স্থায়ী রেখাপাত করল এই ভাবে অজ্ঞাতসারে। উপনয়ন পাবার পর এক সন্তের আগমন হল বালকের গ্রামে। বালকের সাথে সাক্ষাৎ হল। ঐ গৌরকান্তি দিব্যাত্মার কথায় মোহিত হয়ে, বালক সুরেশ গৃহ ছাড়লেন। দীর্ঘ ছয়টি বৎসর কাটালেন উত্তর ভারতের নানা তীর্থ দর্শন করে-করে। হিমালয়ের প্রায় সমস্ত তীর্থই তাঁর দেখা হল। ভরা যৌবন, দেহবল, মনোবল অটুট। প্রাণভরে শিবের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করলেন ঐ সাধুর সান্নিধ্যে অবস্থান করে। বহু মহাত্মার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। শ্যামানন্দ পুরী নামক এক সাধু

তাঁকে দীক্ষা দিয়ে কৃপা করেন।

এদিকে ময়মনসিংহে মাতা ও পিসি চিন্তায়-চিন্তায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। পারিবারিক খবর নিয়ে সন্ত মহাত্মারা উপলব্ধি করলেন যে সুরেশের উচিৎ হবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করা। তাই তাঁদের নির্দেশে আঠার বৎসরের যুবক সুরেশ গৃহে ফিরে এলেন। সুরেশকে ফিরে পেয়ে, মাতা ও পিসি এবং অন্যান্য আত্মীয়রা আনন্দে আত্মহারা হলেন। শুধু তাই নয়, আর যেন পালাতে না পারে, তাই মায়ার বন্দনে আবদ্ধ করার কৌশল পাকাপাকি করলেন। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মনীন্দ্র চক্রবর্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রী কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে যান। অতঃপর মনীন্দ্র চক্রবর্তীর তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। যথা সময়ে এই দম্পতির চার কন্যা এবং এক পুত্র (শ্রীমান সুজিৎ)লাভ হয়।

১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝিতে তিনি ভারতে আশ্রয় নেন। ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত শৈব তীর্থ উদয়পুর তাঁকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করল। অমর সাগর নামক বিশাল দীর্ঘির পশ্চিমকূলে কিছু কাল অবস্থান করেন। ক্রমে-ক্রমে জানাজানি হল ভক্ত সমাবেশ হতে লাগল । জপতপ যাগ-যজ্ঞ চলল। আর্তজন পেল উপকার।

১৯৭০-এর দশকের গোড়াতে তিনি আগরতলা চলে আসেন। রামনগর চার নং রাস্তার পাশেই একবাড়ীতে থাকেন। এখানেও ভজনকীর্তন, পূজা-অর্চ্চনা চলল। লোকজনের,ভক্তের, শিষ্যের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এদিকে পরিবারের লোকসংখ্যা,পুত্রকন্যা বড় হচ্ছে। ভাড়া বাড়ীতে আর থাকা যায় না । ১৯৭৪ সালে আগরতলা নগরের দক্ষিণে-পশ্চিমে অরুন্ধুতি নগরে একখন্ড ভূমি ক্রয় করে স্থাপন করলেন দীনদয়াল আশ্রম।

দীনদয়াল আশ্রমের পরিবেশ অতীব মনোরম। নানারকম ফলের, ফুলের গাছ, পাখীর কলরব, দেবালয়, নাটমন্দির, নিত্যপূজা,বাৎসরিক উৎসব, নানারকম রোগীর সমাবেশ- এই সব মিলে আশ্রমটি কর্ম্মমুখর।

দীনদয়ালানন্দ মহারাজ ভাল গান করতে পারেন, বাজাতে পারেন; ভক্তিগীতি রচনা করেছেন অনেকগুলো। তিনি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় পারদর্শী। তিনি তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ। তিনি পক্ষীমিত্র। ভোগের মাধ্যমে ত্যাগে, প্রবৃত্তির নিবৃত্তির মাধ্যমে মোক্ষে যাওয়ার যে-পথ সহজ, সরল ও স্বাভাবিক, সে-পথ নিজে আচরণ করে তিনি জীবেরে শিক্ষা দেন। তাঁর চরিত্রে একটা অনন্য মাধুর্য আছে, আর আছে অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ। ❑

শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

সমতল ত্রিপুরাতে, আগরতলা নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে কমলাসাগর ও কালিবাড়ীর পশ্চিমে কসবা ও কুঠি নামক জনপদে কামিনীকুমার দাস নামক জমিদারের পৌত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন কিশোরকুমার, যিনি উত্তরকালে শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী নামে বিশ্ববিখ্যাত হন। কিশোরকুমারের জীবনের সম্যক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

কামিনীকুমার ও চঞ্চলাময়ী নামক দম্পতির ঘরে ছয় পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রদের নাম হল যথাক্রমে ধরণী, কুমুদ, প্রমোদ, অমিয়, বিশ্বপতি ও অনাদি। ভারত বিভাজনের আগে-পরে দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে জমিদারী ছাড়খার হয়ে যায়, যৌথ পরিবার ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কেউ এল আগরতলাতে, কেউ খোয়াইতে, কেউ কলিকাতাতে, কেউ শিলিগুড়িতে। প্রমোদের দুই পুত্র এবং এক কন্যা, নাম হল যথাক্রমে কুশল, কিশোরকুমার ও ব্রততী।

অমিয়ের স্ত্রীর নাম অন্নপূর্ণা। অমিয় ও অন্নপূর্ণার তিন পুত্র, তাদের নাম হল অঞ্জন, অচ্যুত ও অসীম। সুতরাং কুশল, কিশোর কুমার, ব্রততী, অঞ্জন, অচ্যুত ও অসীম হলেন সম্পর্কে ভাই-বোন। প্রমোদের স্ত্রী অল্পবয়সে মারা যান, কন্যা ব্রততী তখন সদ্যজাত শিশু মাত্র।

কুশল, কিশোর ও ব্রততী মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হলেন। সেই শুন্যস্থানে তাঁদেরই কাকীমা অন্নপূর্ণা দেবী আদর-যত্ন করে লালন-পালন করেন। কুশল, কিশোর ও ব্রততীর জন্মদিন সঠিক করে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। খুব সম্ভবতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ভারত বিভাজন (১৯৩৯-১৯৪৭) এই সময়ের মধ্যে তাঁদের তিনজনের জন্ম হয়, জন্মস্থান কুঠি। পিতা প্রমোদ বাবু পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কলিকাতাতে আশ্রয় নেন। টালিগঞ্জে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও নামক বিখ্যাত ছবি নির্মাণকারী সংস্থাতে তিনি চাকুরী নেন এবং ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। প্রমোদের অনুজ অমিয় তখন সস্ত্রীক খোয়াইতে। অন্নপূর্ণা দেবী খুব স্নেহ করতেন ভাসুরের পুত্র-কন্যাকে। তাঁরই আগ্রহে কিশোরকুমারকে পাঠানো হল কলিকাতা থেকে ত্রিপুরার খোয়াইতে। খোয়াই সরকারী বিদ্যালয়ে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে অন্তিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর আগরতলাস্থিত মহারাজ বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। খুব সম্ভবতঃ ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে। আগরতলাতে মহাবিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে যুবক কিশোরকুমার যান শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়িতে থাকতেন কাকা বিশ্বপতি। এদিকে বড় ভাই কলিকাতাতে ও শিবপুরে পড়াশুনা করে

প্রযুক্তিবিদ্যাতে স্নাতক হয়েছেন। কিছুদিন পরে প্রযুক্তিবিদ কুশল চলে যান আমেরিকাতে।

ছাত্রজীবনে কিশোর ছিলেন ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড়, স্বভাবে ছিলেন প্রাণচঞ্চল, উদ্যোগী ও উৎসাহী। শিলিগুড়ি থেকে তিনি এলেন কলিকাতাতে। কলিকাতা থেকে উচ্চ শিক্ষার্থে জার্মানীতে গেলেন। জার্মানীতে পড়াকালীন এক ফাঁকে কলিকাতা এসে ছোট বোন ব্রততীকে বিবাহ দেন। তারপর পুনরায় জার্মানীতে চলে যান।

জার্মানীতে থাকা কালীন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সাথে পরিচয় ঘটে। সেই পরিচয় ক্রমেই আন্তরিক ও গভীর হতে থাকে। শুভদিনে শুভক্ষণে উচ্চ শিক্ষিত যুবক কিশোরকুমার দীক্ষিত হন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের জনৈক গুরুর নিকট। দীক্ষান্তে তাঁর নাম হল শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৬-১৫৩৩খৃঃ) তিরোধানের পর বঙ্গদেশে ধর্মের গ্লানি খুব প্রকট হয়েছিল। ইহাকে সংস্কার করতে বদ্ধপরিকর হলেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (১৮৩৮-১৯১৪খৃঃ) এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর (১৮৭৪-১৯৩৭খৃঃ)। নব জাগ্রত ভক্তি আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যান শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ (১৮৯৬-১৯৭৭খৃঃ)। ভক্তিচারু স্বামী হলেন সেই পরম্পরার উত্তরসুরী। শ্রীল রূপ গোস্বামী কর্তৃক রচিত **ভক্তিরসামৃত সিন্ধু** নামক গ্রন্থটিকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ। ইংরাজীতে ইহার নাম দেন The Nectar of Devotion সেই ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন ভক্তিচারু স্বামী। ভক্তিচারু স্বামী বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিবেকবান, শুভভক্তিপরায়ণ, লেখক, সংগঠক এবং কর্মতৎপর। ❑

শ্রীমৎ অশোকানন্দ ব্রহ্মচারী

পূর্ববঙ্গের পূর্ব প্রান্তস্থিত চান্দপুর মহকুমার অন্তর্গত বাবুরহাট নামক গ্রামের এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারের অন্যতম সুসন্তান হলেন অশোকানন্দ ব্রহ্মচারী। অশোকানন্দের জন্মদিন হল ২৫ শে চৈত্র, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ (৮ই এপ্রিল, ১৯৪৩ খৃঃ)। পারিবারিক জীবনে, ছাত্র জীবনে ও চাকুরী জীবনে তাঁর নাম ছিল রথীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। রথীন্দ্রের পিতা-মাতার নাম হল সুরেশ ও প্রীতিলেখা।

রথীন্দ্রনারায়ণ কোন বিচারেই ভুঁইফোড় নন, গোবরে পদ্মফুল নন। তিনি এমন পরিবারে জন্মেছেন যে-পরিবার শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-গরিমায়, যজনে-যাজনে, লোকহিতৈষণায় বিশিষ্টতা দাবী করতে পারে। রথীন্দ্রের বাবারা পাঁচ ভাই, দাদুরা সাত ভাই। এক বিশাল একান্নবর্তী পরিবার। রথীন্দ্রের পিতামহ হলেন উমাচরণ, পিতা হলেন সুরেশ। সুরেশের পুত্রকন্যার সংখ্যা আট জন; পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা। আট জনের নাম যথাক্রমে বেলা, রাজেন্দ্রনারায়ণ, রণেন্দ্রনারায়ণ, রবীন্দ্রনারায়ণ, সন্ধ্যা, রথীন্দ্রনারায়ণ, গায়ত্রী, এবং রূপনারায়ণ, এঁরা প্রত্যেকে উচ্চশিক্ষিত, কর্তব্যপরায়ণ, দেব-দ্বিজ ভক্তিপরায়ণ। সুরেশের পিতার নাম উমাচরণ ও জ্যেঠার নাম শ্যামাচরণ। শ্যামাচরণ ছিলেন সাধক, উমাচরণ ছিলেন খুব ভাল জ্যোতিষশাস্ত্রী। বাবুরহাটস্থিত বাড়ীটি ছিল বিশাল, ছিমছাম পরিচ্ছন্ন, পরিকল্পিত। উত্তরে- দক্ষিণে লম্বা অতি দীর্ঘ উঠান, উঠানের পশ্চিমপ্রান্তে পূর্ব দুয়ারী সারিসারি বসতিগৃহ, উঠানের পূর্বপ্রান্তে উত্তর দক্ষিণে লম্বা বিশাল দীঘি, দীঘির উত্তরপ্রান্তে টোল, ছাত্রাবাস, অতিথিশালা, দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে কাছারী ঘর, দীঘির উত্তর পূর্ব কোণে দেবালয়। সেই দেবালয়ে সাধন ভজন করতেন যোগী শ্যামাচরণ। টোলের ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করত এই পরিবার। এছাড়া অতিথি-অভ্যাগত ছিল প্রায় প্রতিদিনই। এই বিশাল পরিবারে কেবলমাত্র রথীন্দ্রের প্রজন্মের ভাই-বোনের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। প্রতি বেলায় দুই শতাধিক লোকের রান্না হত। এই পরিবারে আয়ের উৎস ছিল ভূসম্পত্তি ও রাজসেবা। সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ছিল না এই পরিবার। বৃটীশ আমলে সরকারী চাকুরী করতেন কয়েকজন। সুরেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক হয়ে রেল বিভাগে কাজ করেছেন। একবার নোয়াখালীতে ভয়াবহ জল প্লাবন হয়েছিল; তাতে সুরেশ প্রথমে আমজনতাকে নিরাপদ স্থানে পাঠান; অতঃপর জেলা শাসকের পরিবারকে পাঠান। জেলা শাসক ছিলেন বৃটিশ সাহেব। এতে সুরেশের সাথে সাহেবের মনোমালিন্য হয়েছিল। রেল বিভাগে থাকা কালীন সুরেশ মাঝে-মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরূপে আগরতলায় আসতেন এবং মহারাজ বীর বিক্রমের সহিত কথাবার্তা

বলতেন ত্রিপুরার ভূখণ্ড স্পর্শ করে রেলপথ গড়ার বিষয়ে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের আগে-পরে বহু দাঙ্গা হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচার বহুজন বিদিত। সেই অত্যাচারের অন্যতম শিকার হল এই পরিবার। আক্ষরিক অর্থে ও বাস্তবিক পক্ষে এক কাপড়ে উঠে এল সমগ্র পরিবার। মুসলমানদের অতর্কিত আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এত বড় পরিবার। আগরতলার কৃষ্ণনগর-নিবাসী হরিদাস ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য-এর সাথে পরিচয় ছিল সুরেশবাবুর। সেই সূত্রে তাঁরা ১৯৪৭ সালের অব্যবহিত আগে ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু হয়ে আসেন। মহারাজ বীর বিক্রম তখন জীবিত। বীর বিক্রমের মহাপ্রয়ান হয় ১৭ই মে, ১৯৪৭ সালে। বীর বিক্রম খুবই সহৃদয় ব্যবহার করেন। সুরেশবাবু চাকুরী করে এই পরিবার প্রতিপালন করেন। তাঁর ভাইদের কেউ-কেউ পশ্চিমবঙ্গে চলে যান।

রথীন্দ্রনারায়ণের বাল্য, কৈশোর ও ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছে আগরতলায়। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, মহাত্মা গান্ধী বিদ্যালয়, মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয় এবং ত্রিপুরা অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় — এই কয়টি শিক্ষালয়ে তিনি লেখাপড়া করেছেন। ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় থেকে কারিগরী বিদ্যায় স্নাতক হন।

রথীন্দ্রনারায়ণ কেন্দ্রীয় সরকার ও অসম সরকারের অধীনে সততা ও নিষ্ঠার সহিত বিশ বৎসর (৮.১১.১৯৭৪খৃঃ— ২৮.২.১৯৯৫খৃঃ) চাকুরী করেছেন। দূর সঞ্চার বিভাগ ও পূর্ত্ত বিভাগ ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাঁর কর্মস্থল ছিল ডিব্রুগড়, শিলচর, শিবসাগর প্রভৃতি স্থান।

আগরতলায় ৮ বৎসর বয়সে, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে রথীন্দ্রের উপনয়ন হয়। তখন থেকেই নিয়মিত জপ-তপ করে চলেছেন। শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা (১৮৯৬-১৯৮২খৃঃ)সম্বন্ধে ভক্তিপূর্ণ আলোচনা হত আগরতলার পূর্ব শিবনগরস্থ বাড়ীতে। ১৯৭২ সালেই শ্রীশ্রী মায়ের প্রথম দর্শন পান রথীন্দ্র। ঘটনাটি এভাবে হল — খড়গপুরে কারিগরী মহাবিদ্যালয়ে কয়েকদিনের জন্য যান রথীন্দ্র। সেই বৎসর শ্রীশ্রী মা উত্তর প্রদেশের সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত ঐতিহাসিক নৈমিষারণ্যে কয়েকদিন অবস্থান করছিলেন। রথীন্দ্রের ছোট বোন গায়ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহ নৈমিষারণ্যে গিয়ে মাকে প্রণাম জানাবেন। গায়ত্রীর অনুরোধে রথীন্দ্র নিয়ে গেলেন বোনকে । এইভাবে প্রথম সাক্ষাৎ হল। মায়ের কাছ থেকে একটি তোয়ালে আশীর্বাদ রূপে পেলেন রথীন্দ্র। অতঃপর বিশটি বৎসর (১৯৭৪-১৯৯৫খৃঃ) চাকুরী উপলক্ষে অসম প্রদেশে অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু শ্রীশ্রী মায়ের কথা অনুক্ষণ মনে রেখেছেন। ১৯৭৩ সালে পিতা সুরেশ চক্রবর্তী এবং দিদি সন্ধ্যা চক্রবর্তী উত্তরকাশীতে শ্রী শ্রী মায়ের জন্মতিথিতে বৈশাখ মাসে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পিতা ও দিদির সাথে ছিলেন

রথীন্দ্র। ডিব্রুগড় নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ভক্তদের ঐকান্তিক আগ্রহে শ্রী শ্রী মা ডিব্রুগড়ে পদার্পণ করেন। রথীন্দ্র তখন ডিব্রুগড়ে কর্মরত; খবর পেয়ে রথীন্দ্র লেগে যান উদ্যোগ-আয়োজনে। ১৯৭৬ সালে রথীন্দ্র হরিদ্বারে গিয়ে মায়ের দর্শন পেয়ে আসেন। এইভাবে ক্রমেই শ্রী শ্রী মায়ের আকর্ষণী শক্তিতে ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন রথীন্দ্র। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ও সাত্ত্বিক জীবনযাপন দেখে তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে মনে-মনে শ্রদ্ধা করতেন। অবশেষে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ পর্যন্ত চাকুরী করে, ১লা মার্চ ১৯৯৫ থেকে সেবা নিবৃত্ত হয়ে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে আশ্রমিক জীবন কাটাতে শুরু করেন। স্মরণ করা আবশ্যক যে ২৭শে আগষ্ট ১৯৮২তে শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী অপ্রকট হন। সাধন জীবনে তাঁর নাম রাখা হয় অশোকানন্দ ব্রহ্মচারী। তাঁর দিদি সন্ধ্যা চক্রবর্তী সাধন জীবনে নামানন্দ গিরি নামে পরিচিতা।

অশোকানন্দজীর পিতা শ্রী সুরেশ চক্রবর্তীর জন্মদিন হল ২৩শে ডিসেম্বর ১৯০০ খৃষ্টাব্দ। এই শতায়ু বৃদ্ধ হলেন নিষ্ঠাবান, স্থিতধী ব্যক্তি। বৃদ্ধ, অসুস্থ পিতাকে দেখতে অশোকানন্দ ১৪০৭ বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মকালে আগরতলায় আসেন। তখনই এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

সুরেশ চক্রবর্তীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা ভক্তিমার্গের ও ত্যাগমার্গের পথিক। এঁরা হলেন রণেন্দ্রনারায়ণ, সন্ধ্যা, রথীন্দ্রনারায়ণ ও গায়ত্রী। রথীন্দ্র ও সন্ধ্যা গৃহ ছেড়েছেন, রণেন্দ্র ও গায়ত্রী গৃহ ছাড়েন নাই বটে, তবে তাঁরাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নি, নিষ্কাম কর্মযোগ করে চলেছেন।

অশোকানন্দজীর গায়ের রঙ শ্যামলা, পাতলা, ছোটখাট গড়ন, স্বভাবে তিনি মৃদুভাষী, শান্ত মেজাজী, নিরীহ প্রকৃতির কিন্তু দৃঢ় চিত্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ।

বিগত মঙ্গলবার ২৬শে আষাঢ় ১৪০৭ বঙ্গাব্দে (১১ই জুলাই ২০০০খৃঃ) পূর্বাহ্নে আগরতলাস্থিত শ্রীশ্রী আনন্দময়ীমার আশ্রমে সাক্ষাৎকার সেরে আসার সময় তাঁর প্রিয় শ্লোকের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি খুসী হয়ে শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকের কথা উল্লেখ করলেন। সেই শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ —

ধৈর্য দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, ক্রমশঃ মনকে আত্মাতে নিহিত করিবেন, কোনও কিছু চিন্তা করিবেন না। ❑

শ্রীমৎ স্বামী নির্গুণানন্দ গিরি মহারাজ

পূর্ব্ব বঙ্গে শ্রীহট্ট জিলা-নিবাসী যামিনীনাথ ভট্টাচার্য ও প্রভাসিনী ভট্টাচার্য নামক দম্পতির অন্যতম পুত্র হলেন শ্রী শান্তিব্রত ভট্টাচার্য, যিনি উত্তরকালে শ্রীমৎ স্বামী নির্গুণানন্দ গিরি মহারাজ নামে খ্যাত হন । শান্তিব্রতের জন্মতিথি হল আনুমানিক শিবরাত্র, ১লা ফাল্গুন, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ খৃঃ।

যামিনীনাথ পুরুষানুক্রমে শ্রীহট্টে বাস করছিলেন। চারপুত্রের পিতা যামিনীনাথ ভারত বিভাজনের পরই বাধ্য হলেন জন্মভূমি ছাড়তে । তিনি সপরিবার ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরার উত্তরাংশে আশ্রয় নিলেন। সুতরাং শান্তিব্রতের জন্ম শ্রীহট্টে, কর্ম ত্রিপুরাতে, ধর্ম উত্তরভারতে ।

শান্তিব্রত বরাবরই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, মেধাবী, হাসিখুসী মেজাজের, প্রাণচঞ্চল। তাই পড়াশুনাতে কোথাও বিফলতা, ব্যর্থতা নেই, সিড়ি অতিক্রম করেছেন অবলীলাক্রমে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা উত্তর ত্রিপুরাতে, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা পশ্চিম ত্রিপুরাতে মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কলিকাতাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর হয়ে, অতঃপর গবেষণা কর্ম সেরেছেন । ১৯৬০ এর দশকে পড়াশুনার সিংহভাগ সেরেছেন ।

১৯৭০ এর দশকে ডঃ শান্তিব্রত ভট্টাচার্য-এর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এল । সেই পরিবর্তন -এর চরম পর্যায় হল ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ । দীক্ষা নবজীবন লাভ তুল্য । অতঃপর নাম হল শ্রীমৎ স্বামী নির্গুণানন্দ গিরি । জন্মদাতৃ মাতাকে হারিয়েছেন আগেই, দীক্ষাদাতৃ মাতাকে পেয়েছেন তৎস্থলে । নতুন মাতার নিকট যত অধিকার, আবদার করতে মজা পেয়েছেন নব দীক্ষিত সাধক ।

তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন কোন অপদার্থতা থেকে নয়, কোন আঘাত থেকে নয়, কোন ব্যর্থতা থেকে নয়, জীবন সংগ্রামে কোন পরাজয় থেকে নয়, কোন পড়াশুমুখতা থেকে নয়। দিয়াশলাই কাঠিকে যদি বারুদের সাথে সামান্য ঘর্ষণ দেওয়া যায়, তৎক্ষণাত্তই আগুন জ্বলে উঠে । তদ্রুপ ঘঠেছে শান্তিব্রতের ক্ষেত্রে। কনখল ও আলমোড়াতে থাকেন বৎসরের বেশীর ভাগ সময় । কিন্তু গুরুর বাণী প্রচারে ভারতের নানা প্রান্তে এবং বিদেশে পর্যটন করেন তিনি । জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ সমন্বিত এই সাধক যদি জনসেবামূলক কর্মমার্গে হাত লাগান তবে অসাধারণ কিছু করতে সক্ষম হবেন। ❑

শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ

পূর্ব বঙ্গের পূর্বপ্রান্তস্থিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামক বর্ধিষ্ণু জনপদে, সরাইল নামক থানাধীন শাখাইতি নামক গ্রামে নীলমণি দেবনাথ ও বিলাসিনী দেবনাথ নামক দম্পতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। তাঁর জন্মদিন হল শুক্রবার, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ (নভেম্বর ১৯৪৪ খৃঃ)। উত্তরকালে ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ পরিচিত হন শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ নামে।

শাখাইতি গ্রাম-নিবাসী নীলমণি দেবনাথ কর্মঠ গৃহস্থ, স্নেহপরায়ণ পিতা এবং ধর্মভীরু ব্যক্তি হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। বিলাসিনী ছিলেন স্বামীপ্রিয়া ও পুত্রবতী মহিলা। এই দম্পতির একাধিক পুত্র-কন্যা। তাঁদের নাম হল যথাক্রমে হরিশ্চন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, ধীরেন্দ্র, হীরেন্দ্র, জহর, কুমুদিনী, কুসুম, পারুল এবং চারুবালা। ধীরেন্দ্র চন্দ্র-এর শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে শাখাইতি গ্রামে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পশ্চিম পাশ দিয়ে বিখ্যাত মেঘনা নদী প্রবাহিত। বালক ধীরেন্দ্র চন্দ্র বাল্যবন্ধুদের সাথে মেঘনা নদীতে স্নান করতেন, সাঁতার কাটতেন, মাছ ধরতেন, লাই খেলা খেলতেন।

গ্রামের পাঠশালাতে ধীরেন্দ্র চন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। সরাইল ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শিক্ষায়-দীক্ষায় অত্যন্ত অগ্রসর জনপদ হিসাবে বিখ্যাত। সরাইলে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। সরাইল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। ইহা অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয় নামে খ্যাত। ইহার স্থাপয়িতা হলেন আশুতোষনাথ রায় (১৮৭৫-১৯০৬খৃঃ)। পিতা রায় বাহাদুর অন্নদা রায়-এর নামে ইহা স্থাপিত। কৃষ্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর বংশধর হলেন অন্নদা রায়। বৃটীশ সরকার কর্তৃক নানাবিধ সমাজ সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ রায়বাহাদুর খেতাব প্রাপ্ত হন। সেই থেকে চট্টোপাধ্যায় স্থলে রায় পদবী ব্যবহার করা হয়। অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন ধীরেন্দ্রচন্দ্র এবং ১৯৬০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

পূর্ব পাকিস্থানের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপ হতে থাকে। হিন্দুদের ধন-জন-মান বিপন্ন হতে থাকে। তাই এই পরিবার দেশত্যাগ করে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিল এবং আগরতলা থেকে মাত্র কয়েক ক্রোশ পূর্ব দিকে রানীর বাজার নামক জনপদের নিকট কালিকাপুর নামক পল্লীতে থাকার ব্যবস্থা করে নিল।

আগরতলাস্থিত মহারাজ বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়-এ ভর্তি হলেন ধীরেন্দ্র চন্দ্র

এবং প্রথম বিভাগে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। পরে এই বিখ্যাত মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালে ত্রিপুরার মহাবিদ্যালয়সমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ধীরেন্দ্র চন্দ্র ছিলেন মেধাবী ছাত্র। তাঁর ছাত্রজীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তাঁর জন্মভূমির নিকটেই ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। দেশ বিভাজন, দাঙ্গা, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু জীবন — এসবই তাঁর ছাত্রজীবনকালে ঘটল। এসব দ্বারা তিনি রীতিমত বিব্রত হন। তৎসত্ত্বেও তিনি ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ধীরেন্দ্র চন্দ্র ত্রিপুরা সরকারের অধীনে চাকুরী করেছেন। তাঁর চাকুরী জীবন প্রায় ৩৩ বৎসর (১৯৬৫-১৯৯৭খৃঃ)। তাঁর কর্মজীবনের বেশীর ভাগ শিক্ষাবিভাগে শিক্ষকতার কাজে অতিবাহিত হয়েছে। রানীর বাজারের নিকটবর্তী কবরার খামাব বিদ্যালয়ে বেশ কিছুকাল কাজ করে সেবা নিবৃত্ত হন ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে।

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ হল ধীরেন্দ্র চন্দ্রের জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন। এই বৎসর তিনি পারমার্থিক বিষয়ে দীক্ষালাভ করেন। তাঁর দীক্ষাগুরু হলেন শ্রীমৎ স্বামী হংসরাজ সোহংমণি (১৮৯৪-১৯৭৯খৃঃ)। সোহংমণিবাবা ছিলেন সহজিয়াপন্থী, নিত্যসিদ্ধ, অন্তর্যামী মহাপুরুষ। একই গুরু থেকে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হলেন। অতঃপর তাঁর নামকরণ করা হল শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ। স্পষ্টতই, সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হবার পরও তিনি প্রায় বিশ বৎসর সরকারী চাকুরী করেছেন। মেধা ও চারিত্রিক মাধুর্য বশতঃ চাকুরীজীবন ও সন্ন্যাসজীবনের মধ্যে বিরোধ এড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

১৯৬৮ সালে দীক্ষা পাওয়ার পর থেকেই গুরুদেবের সহিত এবং আশ্রমের সহিত সম্পর্ক উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর গুরুদেবের দুটি ডাকনাম ছিল, যথা — মোগড়ার সাধু এবং সুরেন্দ্র সাধু। আগরতলার পশ্চিমে মোগড়া নামক স্থানে শ্মশানে তিনি সাধন-ভজন করতেন। ১৯৬৪ সালে ভয়াবহ দাঙ্গা লাগে সেদেশে। তাই তিনি ত্রিপুরাতে আসেন। ১৩৭১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি এক মনোরম আশ্রম স্থাপন করেন। রানীর বাজারের পূর্বে-উত্তরে, মোহনপুরের উত্তরে, ব্রজনগরে এই আশ্রম অবস্থিত। সুরেন্দ্র সাধুর তিরোভাব তিথি হল ২৫. ১১. ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১০. ৩. ১৯৭৯ খৃঃ।

গুরুদেব লোকান্তরিত হবার পূর্বেই সুযোগ্য শিষ্য যোগানন্দজীকে উত্তরাধিকারী পদে মনোনীত করে যান। যোগানন্দজী তন-মন-ধন ইত্যাদি সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে গুরুসেবা করে ধন্য হয়েছেন এবং গুরুদেবের অশেষ কৃপা লাভ করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৯৯১খৃঃ) এবং স্বামী যোগানন্দ একই রাশিভুক্ত। উভয়ের বৃষরাশি। আদর্শনিষ্ঠা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, স্বজাতি বাৎসল্য, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস, দানশীলতা, শ্রেয়ঃনিষ্ঠা, চারিত্রিক দৃঢ়তা — প্রভৃতি গুণাবলী এই জাতকের মধ্যে বর্তমান থাকে। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই সব গুণের আকর। যোগানন্দের মধ্যেও এই সব গুণাবলী রয়েছে। গুরুর পরম্পরা অনুসরণ করে স্বামী যোগানন্দ মৌনব্রত পালনে কটিবদ্ধ হয়েছেন। বুদ্ধদেব যেমন বলেছিলেন যে, এই আসনে বসে যদি শরীর ধ্বংস হয় হোক, তবু বুদ্ধত্ব লাভ না করা অবধি আসন ছাড়বেন না। যোগানন্দজীর একাসনে বাস দীর্ঘকাল মৌনব্রত পালন - দৃশ্য সেই বুদ্ধদেবের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ❑

ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ

পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিং জিলার টাঙাইল মহকুমার অন্তর্গত গাঢ়-হট্ট নামক গ্রামে আনুমানিক ১৩৫২ বঙ্গাব্দে (১৯৪৫ খৃঃ) ভূমিষ্ঠ হন এক সুদর্শন শিশু, যিনি উত্তর কালে ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ নামে পরিচিত হন। তাঁর পিতা-মাতার নাম যতীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী ও সুকুমারী চক্রবর্তী। যতীন্দ্রমোহন ও সুকুমারীর দুই পুত্র এবং দুই কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাধন জীবনে ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি কমল বৈষ্ণব মহারাজ নামে খ্যাত।

নরেন্দ্রনাথের শৈশব, বাল্য,কৈশোর ও যৌবন জন্মভূমিতে অতি বাহিত হয় নি। সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রাবল্যে অন্য অনেক হিন্দু পরিবার বাস্তহারা হয়ে অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল । যতীন্দ্রমোহনের আত্মীয় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে, তথা বেলঘরিয়া এবং যাদবপুর নামক জনপদে। যতীন্দ্রমোহন শিশুপুত্রকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। নরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া করেছেন আত্মীয়বাড়ীতে বসবাস করে। বাস্তহারা ছন্ন ছাড়া জীবন হল প্রগতির অন্যতম প্রতিবন্ধক। নরেন্দ্রনাথ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করানোর কথা ভাবছিলেন বাবা-মা;কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে দিলেন।

নরেন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার যখন হয়, তখন তাঁর বয়স ১২ বৎসর । এই ঘটনাকাল হল আনুমানিক ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ (১৯৫৭খৃঃ)। তখন থেকেই বালক নরেন্দ্রনাথ প্রত্যহ গীতাপাঠ করতেন, অন্ততঃ একটি অধ্যায় সমাপ্ত করতেন। সেই পাঠে ছিল আন্তরিকতা ও ভক্তিবিশ্বাস। ফলে বৈরাগ্যভাব বালকের মনে অঙ্কুরিত হতে লাগল। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হবার পর সাংসারিক,পারিবারিক বন্ধনমুক্তির ভাব প্রবল হতে লাগল। বাবা-মাকে প্রণাম করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন কৃষ্ণভাবনামৃতের সন্ধানে। একাই পথ চলা, একাই খোঁজ-খবর নেওয়া। কোন বয়ঃজ্যেষ্ঠ পথপ্রদর্শক সাথে ছিল না। একাধিক আশ্রমে কালাতিপাত করেছেন জাতশ্রদ্ধ বালক নরেন্দ্রনাথ। প্রথমে গেলেন বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠে। সেখানে কিছু কাল রইলেন। কিন্তু কিছু দিন যেতেই উপলব্ধি করলেন যে, সেখানে কৃষ্ণভাবনামৃত অপেক্ষাকৃত গৌন। দ্বিতীয়তঃ গেলেন বরাহনগরে পাঠবাড়ীতে । কিছু দিন কাটার পর একই উপলব্ধি হল। তৃতীয়তঃ গেলেন শেওড়াপুলীতে জনৈক গৃহস্থ ভক্তের বাড়ীতে। চতুর্থতঃ গেলেন শ্রীরামপুরে হৃষিকেশ মহারাজের আশ্রমে। পঞ্চমতঃ গেলেন সন্তোষপুরে চুনীলাল দত্ত নামক জনৈক ধনাঢ্য ভক্তের বাড়ীতে । চুনীলাল

দত্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একনিষ্ঠ ভক্ত। চুনীলাল দত্তের মাধ্যমে, ষষ্ঠতঃ এলেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে। সেই মঠে অভিষ্ট লাভ হল কৃষ্ণগতপ্রাণ নরেন্দ্রনাথের।

কয়েক বৎসর নানা স্থানের অভিজ্ঞতা নিয়ে, অবশেষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে যখন প্রথম এলেন তখন সময়টা ছিল ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ। স্থান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ; ৩৫, সতীশ মুখোপাধ্যায় সরণী, কলিকাতা ২৬। মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ (আয়ুস্কাল ১৯০৪-১৯৭৯খৃঃ)। এই মুক্তাত্মা, মহানপুরুষকে দর্শন করে বালক নরেন্দ্রনাথের মন- প্রাণ ভরে গেল। বালককে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মাধব গোস্বামী মহারাজ নানা রকম প্রশ্ন করেন এবং সাধন জীবনের কন্টকাকীর্ণ পথের কথা বলেন। কিন্তু বালকের অচলা ভক্তি বিশ্বাস দেখে এবং নিষ্কপট-বিষয় বৈরাগ্য অনুভব করে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ মাধব গোস্বামী মহারাজ অতঃপর মঠে থাকার অনুমতি দেন। নরেন্দ্রনাথ সেদিন থেকেই মঠের যাবতীয় কায়িক শ্রম নিষ্ঠার সহিত এবং অফুরন্ত উদ্যমের সহিত করেন। পরবর্তী রাস পূর্ণিমাতে ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে হরিনাম মহামন্ত্র জপের দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষান্তে নামকরণ হল ননীগোপাল ব্রহ্মচারী। মাধব গোস্বামী মহারাজের সাহচর্যে সমগ্র ভারতের অধিকাংশ তীর্থস্থান দর্শনের সুযোগ লাভ করেন ননীগোপাল ব্রহ্মচারী।

শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হয়েছিল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ (১৮৭৪-১৯৩৭খৃঃ) কর্তৃক। সরস্বতী ঠাকুরের ছিল বিশুদ্ধ বিবেক, অচলা ভক্তি, প্রখর বুদ্ধি, প্রখর পান্ডিত্য, অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা, নিখাত আন্তরিঁকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রভৃতি দৈবী সম্পদ। তিনি ভারতে ও বিদেশে ৬৪টি মঠ স্থাপন করে যান। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতি যুগ প্রভাবে গ্লানি প্রাপ্ত হয়েছিল। বিশুদ্ধ বিবেকবান, যুক্তিবাদী লোক এই সব অধর্মকে ঘৃণার চোখে দেখ্‌ত। কিন্তু কেউ সংস্কার করতে বদ্ধ পরিকর হল না। সেই মহান কাজ হাতে নিলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (১৮৩৮-১৯১৪খৃঃ) ও সরস্বতী ঠাকুর। কতিপয় সম্প্রদায়ের আচরণকে সরস্বতী ঠাকুর শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা খন্ডন করেন। এমন কয়েকটি সম্প্রদায়ের নাম হল- আউল, বাউল, নেড়া-নেড়ী, দরবেশী, সখী, ভেকী, কর্তাভজা, স্মার্তজাত, সহজিয়া, কালাচান্দা, অতিবারি, চুড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী প্রভৃতি। সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন সব্যসাচী। তিনি একদিকে অপধর্মকে খন্ডন, অপরদিকে সঠিক ধর্মকে পঙ্কিল থেকে, গভীর গর্ত থেকে উদ্ধার করে সঠিক স্থানে স্থাপন করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। প্রায় ২০০ পুস্তক রচনা করে, ৬৪ টি মঠ স্থাপন করে, এক একজন দিক্‌পাল শিষ্য তৈরী করে , সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গোষ্ঠী তৈরী করে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত সাধন প্রণালীকে তিনি পুনরায় সঞ্জীবিত করে যান।

আগরতলাতে মহারাজ রাধাকিশোর (১৮৯৬-১৯০৯খৃঃ) এবং তদীয় রানী

তুলসীবতী দেবী ১৩১৬ ত্রিপুরাব্দে (১৯০৬খৃঃ) নির্মাণ করেছিলেন শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির। কালের প্রভাবে ঐ মন্দির জরাজীর্ণ ও রাহুগ্রস্থ হয়ে যায়। আগরতলার কতিপয় ভক্তের প্রচেষ্টায় ঐ মন্দির ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের হাতে হস্তান্তর করা হয়। ঐ সব ভক্তদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন গোপাল চন্দ্র দে(আঃ ১৯১৯-১৯৮১খৃঃ), যজ্ঞেশ্বর সেনগুপ্ত (আঃ ১৯০৩-১৯৮৭খৃঃ), সুখময় সেন গুপ্ত (১৯১৯-১৯৯৫খৃঃ), কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য।

২৪.৬.১৯৭৬ দিনাংকে শ্রীমৎ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ আগরতলা থেকে দূরভাষে জানালেন কলিকাতাতে মঠাধ্যক্ষ মাধব গোস্বামী মহারাজকে । দূরভাষে বলা হল আগামীকাল (২৫.৬.১৯৭৬খৃঃ) জগন্নাথ মন্দির আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হবে। সুখবর পেয়েই মঠাধ্যক্ষ মঠে বসে দুরভাষযোগে বিমানের ৭ টি প্রবেশপত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। সাতজন সন্ন্যাসী পরদিন (২৫.৬.১৯৭৬খৃঃ) সকালে বিমানযোগে আগরতলায় পদার্পণ করলেন। সেই ৭জনের মধ্যেই ছিলেন ননীগোপাল ব্রহ্মচারী।

সেই যে এলেন, অদ্যাবধি (১৯৭৬-২০০২খৃঃ) ননীগোপাল ব্রহ্মচারী আগরতলাতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ তথা জগন্নাথ মন্দিরেই রয়ে গেলেন। তখন সেটি মন্দির তো নয়, বন জঙ্গঁল, নানা প্রকার কুকাজের নরক। সেদিন যাঁরা স্বহস্তে বনজঙ্গল কেটে মন্দির প্রাঙ্গণকে সুন্দর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমৎ ভক্তি প্রমোদ বন মহারাজ, ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, বৃষভানু ব্রহ্মচারী , বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখরা।

পরবর্তীকালে আরো অনেক সাধু-সন্ত, ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থী আগরতলার মঠে যুক্ত হয়েছেন।

আশ্রমবাসীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি দাতা, ভক্ত, দর্শক ও পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ । উভয় পক্ষের সম্মিলিত প্রয়াসে মূল মন্দিরের আশে-পাশে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে নাট মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, ভোজনালয়, গ্রন্থাগার, সাধুনিবাস, অতিথিশালা, চন্দন পুকুর, রামলীলা প্রদর্শনী, কৃষ্ণলীলা প্রর্দশনী, বিশ্বরূপ প্রদর্শনী ইত্যাদি।

শ্রীজগন্নাথ মন্দির তথা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। ইহার সাথে যুক্ত হয়েছে, বিভিন্ন ভক্তদের পারিবারিক অনুষ্ঠান। অন্নপ্রাসন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পারিবারিক অনুষ্ঠানে অতিথিদের ভোজন করানোর দায়িত্ব যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে মঠ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাহ করে দেওয়া হয় অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত। আবার ত্রিপুরার ভক্তদিগকে নবদ্বীপ পরিক্রমা এবং ব্রজমন্ডল পরিক্রমাতে নিয়ে যাওয়া হয়।

ত্রিদন্ডী স্বামী ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ কতিপয় দুর্লভ দৈবী সম্পদের অধিকারী।

তন্মধ্যে সাত্ত্বিক আচরণ, ঠান্ডা মেজাজ, মিতাহার, শ্রীকৃষ্ণে অচলাভক্তি, বিনয়, অক্লান্ত কায়িক ও মানসিক শ্রমশক্তি প্রভৃতি গুণাবলী বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর হৃদয় ষড় রিপু শূন্য পরম পবিত্র। ভক্তি,কর্ম ও জ্ঞান- এই ত্রিবিধ স্রোত তাঁর অন্তরে সুসামঞ্জস্যভাবে বিরাজ করায় অক্লান্ত শ্রম করতে সক্ষম হচ্ছেন। আনুমানিক,১৩৯১ বঙ্গাব্দের রাস পূর্ণিমাতে তিনি সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হয়েছেন। তাঁর দীক্ষাগুরু হলেন প্রভুপাদ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী। দীক্ষান্তে তাঁর নাম হল ভক্তি কমল বৈষ্ণব মহারাজ। তিনি ভক্তবৎসল। তিনি ঐশ্বর্যময়। ❑

স্বামী চিদানন্দ মহারাজ

পূর্ব বাংলার পাবনা জেলার অন্তর্গত সয়দাবাদ নামক গ্রাম-নিবাসী মনোরঞ্জন মজুমদার ও শান্তিময়ী মজুমদার নামক দম্পতিকে পিতা-মাতার রূপে স্বীকার করে ভূমিষ্ঠ হন এক শিশু, যাঁর পারিবারিক নাম হল শ্রী চিত্তরঞ্জন মজুমদার এবং উত্তরকালে আশ্রমিক নাম হল স্বামী চিদানন্দ মহারাজ। তাঁর আবির্ভাব তিথি হল জন্মাষ্টমী তিথি, সোমবার সকাল ৮ ঘটিকা, ১৬ই ভাদ্র ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ (১. ৯. ১৯৪৭ খৃঃ)।

পাবনার এই পরিবার ধনে-জনে খ্যাতিমান, জমিদার বাড়ী নামে পরিচিত। এই বংশে সাত পুরুষ যাবৎ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হবার দুর্লভ ঐতিহ্য আছে। স্বামী চিদানন্দ হলেন সপ্তম প্রজন্ম। মনোরঞ্জন মজুমদারের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। ইহাদের নাম হল যথাক্রমে চিত্তরঞ্জন, দিলীপ, বাসন্তী, সূর্যময়ী, উদয় এবং ইতি। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে, পরিবারের বড় ছেলে ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী হলেন।

চিত্তরঞ্জনের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে পাবনাতে এবং গ্রামের পাঠশালাতে প্রথম পড়াশুনা করেছেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ সন পর্যন্ত পাবনাতে, অতঃপর দিনাজপুরে। মেধারগুণে তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে ছাত্রবৃত্তি পান এবং এক লাফে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পুনরায় ছাত্রবৃত্তি পান এবং সপ্তম শ্রেণী ডিঙ্গিয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এইভাবে তিনি মহাবিদ্যালয়ে সাহিত্য বিষয়ে স্নাতক হন। তাঁর শিক্ষাজীবনের বেশীর ভাগ দিনাজপুরে কেটেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি গান-বাজনাতে এবং চিত্রাঙ্কণে তাঁর নেশা আছে।

দিনাজপুরে যে-স্থানে ছিলেন, তার অনতিদূরে রামকৃষ্ণ মিশন ছিল। ছাত্রাবস্থায় বালক চিত্তরঞ্জন নিকটবর্তী রামকৃষ্ণমিশনে প্রায়ই যেতেন এবং আশ্রমিক পরিবেশ তাঁকে হাতছানি দিত। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্থানে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। তখনই জন্মভূমি ত্যাগের পরিকল্পনা হল। মহাবিদ্যালয়ের পড়াশুনা সেরেই চলে আসেন হিন্দুস্থানে। ইহা ১৯৬৮ সনের ঘটনা। দিনাজপুর থেকে সোজা উত্তরে ভারতভূখণ্ড জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়িতে প্রথম আশ্রয় নেন। অতঃপর ভারতের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। আবার ফিরে আসেন জলপাইগুড়িতে।

জলপাইগুড়িতে আছে রামকৃষ্ণ আশ্রম। ইহা ব্যক্তিগত আশ্রম। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দ্বারা স্বীকৃত নয় এই আশ্রম। সেই আশ্রম বিশাল, প্রায় দেড় শত কানি ভূমি আছে,

কৃষিক্ষেত্র, গোশালা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, যাত্রীনিবাস, দেবালয়, জলাশয়, বাগান রয়েছে। সেই আশ্রমের মধ্যে গোশালার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে নিষ্ঠার সহিত কাজ করে চলেছেন শিক্ষিত যুবক চিত্তরঞ্জন। দায়িত্ব নেবার সময় ছিল মাত্র ৫টি গাভী, দায়িত্ব ছাড়ার সময় হল ২৫টি গাভী। তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠায় তুষ্ট হয়ে দীক্ষা দেন গুরুদেব। গুরুদেবের নাম শ্রীমৎস্বামী দীনানন্দ মহারাজ। সেদিন ছিল মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ (১৯৭০ খৃঃ)। দীক্ষান্তে নাম হল চিদানন্দ।

১৯৮০ সালে ত্রিপুরাতে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। সেই সময় দাঙ্গা-পীড়িত আর্তজনের সেবা করতে আশ্রম কর্তৃক প্রেরিত হন তরুণ সন্ন্যাসী চিদানন্দজী। কিছুদিন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাতে থাকেন। কয়েকদিন রানীর বাজারে থাকেন। ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে জলপাইগুড়ি ফিরে যান। কিন্তু ত্রিপুরার স্মৃতি ভুলতে পারেন নি।

১৯৮৪ সালে দ্বিতীয়বার এলেন আগরতলাতে। রানীর বাজার নিবাসী কানুলাল সাহা মহাশয়ের বাড়ীতে কয়েকদিন থাকেন এবং ভূমির খোঁজে থাকেন। অবশেষে আগরতলা নগর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত যোগেন্দ্রনগর নামক জনপদের পাশেই বনকুমারী নামক স্থানে এক কানি ভূমি ক্রয় করে নেন ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে। সেই স্থানেই তিনি গড়ে তুলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অভাবগ্রস্থ পরিবারকে সাহায্য করার বাসনা প্রবল। এই বাসনাবশতঃ তিনি ছাত্রাবাস খুলেছেন এই আশ্রমের ভিতরেই। কয়েকজন বিদ্যার্থী এই আশ্রমে থেকে-খেয়ে পড়াশুনা করেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, চাকুরী পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই আশ্রম চলে কিভাবে ? ব্যয়ভার কে বহন করে ? আয়ের উৎস কি ? আবাসিক ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হয় না। স্বামীজীর শিষ্যসংখ্যা নেহাত কম নেই। প্রায় দুই হাজার হবে। শিষ্যরাই দান-দক্ষিণা দেন। ভক্তরা দান দেন। মুষ্টি ভিক্ষা করতে বেড় হন জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্য। আশ্রমের যাবতীয় কাজ গুরু-শিষ্য মিলে করেন। ছাত্ররাও কাজ করে। ছাত্ররা যাতে শ্রম বিমুখ না হয়, স্বাবলম্বী হয় সেদিকে তিনি নজর রাখেন, কাজ বন্টন করেন। আবার বাইরে গিয়ে যাতে আড্ডাবাজ, বাচাল না হয় সেদিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

আশ্রমের নিত্যপূজা হয়, এছাড়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব, সারদা মাতার জন্মোৎসব, কুমারী পূজা ইত্যাদি পালিত হয়। এছাড়া আর কিছু পালিত হয় না।

স্বামী চিদানন্দ মহারাজ কর্মতৎপর, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, লোকহিতৈষী, গতিশীল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। গান, বাজনা, চিত্রাঙ্কন এবং ভক্তিগীতি রচনা করা হল তাঁর বিশেষ নেশা ও সখ। এ পর্যন্ত তিনি প্রায় দুই হাজার গান রচনা করে নিজেই সুর দিয়েছেন। ❑

শ্রীমৎ স্বামী অনির্বাণ পুরী মহারাজ

পূর্ব বঙ্গে শ্রীহট্ট জিলায় মুড়াকরী নামক গ্রামে এক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত। গৃহকর্তার নাম দুর্গেশ ভট্টাচার্য। তাঁর সহধর্মিনীর নাম শিবদাসুন্দরী। দুর্গেশ ও শিবদাসুন্দরীর দুই কন্যা ও দুই পুত্র। পুত্রদের নাম হল কালীকেশ ও শংকর। শংকরের জন্ম তিথি হল ১০ই পৌষ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ। শংকর উত্তর জীবনে শ্রীমৎ স্বামী অনির্বাণ পুরী মহারাজ নামে খ্যাত হন।

যৌথ পরিবার

দীনেশ ও দুর্গেশ হলেন ভাই। দীনেশের চার পুত্র, তাদের নাম হল রাকেশ, নরেশ, দীপেশ ও তাপস। দুর্গেশের দুই পুত্র। নাম হল কালীকেশ ও শংকর। দীনেশ ও দুর্গেশের মধ্যে সদ্ভাব অটুট ছিল; তেমনি তাঁদের পুত্রদের মধ্যে একের প্রতি অন্যের টান ছিল। রাকেশ ও নরেশ দেশ-বিভাজনের পূর্বেই কলিকাতা মহানগরে গিয়ে পড়াশুনা, চাকুরী, অর্থ উপার্জন প্রভৃতিতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্থানের নানা স্থানে ভয়াবহ দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল সুপরিকল্পিত ভাবে। শত-শত হিন্দু নর-নারী নিহত ও নির্যাতিত হল; হাজার-হাজার হিন্দু দেশত্যাগী হল। তখন এই ব্রাহ্মণ পরিবার চলে গেল কলিকাতাতে। কলিকাতাতে রাকেশ ও নরেশ থাকাতে সামান্য সুবিধা হল। কলিকাতাতে বেলগাছিয়ার দত্ত বাগান নামক পাড়াতে আপাততঃ আশ্রয় নিলেন সকলেই। রাকেশ কাজ করতেন ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগে। নরেশ কাজ করতেন কয়লা খনিতে।

পারিবারিক বিপর্যয়

১৯৫৩ সালে এক অঘটন ঘটে গেল। শিবদাসসুন্দরী মারা যান। তখন শংকরের বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। ১৯৬৫ সালে মারা যান দুর্গেশ (আঃ ১৯০১-১৯৬৫খৃঃ)। শংকরের জেঠাতো দাদারা সুখে-দুঃখে কাকার পরিবারের পাশে দাঁড়ান। তেমনি কালীকেশ ও শংকর জেঠাতো দাদাদিগকে সহোদর ভাই-এর মতই একান্ত আপনজন বলে মনে করেন।

শিক্ষা

দেশ বিভাজন, উদ্বাস্তু জীবন যাপন, মাতার ও পিতার অকাল মৃত্যু প্রভৃতি কারণে শংকরের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ ১৯৭২ সালে শংকর মাধ্যমিক পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হলেন। এরপর আর দাদাদের উপর নির্ভর করে পড়াশুনা করতে শংকরের বিবেক-বুদ্ধিতে বাধল।

অর্থ উপার্জন

১৯৭৩ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বার বৎসর শংকর অর্থ উপার্জন করতে খুব তৎপর ছিলেন। কোন কাজের প্রতি অনিহা ছিল না। সৎপথে যে-কোন সমাজ-স্বীকৃত কাজ করতে তিনি সংকোচ করেন নি। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমাতে, জামুরিয়া থানাধীন খাসকেন্দা নামক গ্রামে থাকতেন নরেশ ভট্টাচার্য। দাদার গৃহকে আশ্রয়স্থল হিসাবে ধরে নিয়ে, শংকর যখন যে-কাজ জুটে তখন সেকাজ করতেন। গৃহ শিক্ষকতা, ফলের ব্যবসা, দিন মজুরী, ঘরছানি, মনোহারী দোকান, ভোজনালয় চালানো প্রভৃতি কাজ করেছেন। যতটা সম্ভব, কারো গলগ্রহ হয়ে বা পরগাছা হয়ে থাকতে শংকরের জাগ্রত বিবেক-বুদ্ধি সায় দিত না। ইত্যবসরে ডাককর্মী রাকেশ ভট্টাচার্য বদলী হলেন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। রাকেশ অনুজ শংকরকে সেখানে নিয়ে গেলেন। আন্দামানে প্রায় ছয় মাস কাটিয়ে এলেন। ইহা আনুমানিক ১৯৭৫ সালের ঘটনা।

আশ্রমিক জীবন

শংকরের পিতা ছিলেন ভাল গায়ক ও বাদক। তিনি ভক্তিমূলক গান গাইতেন। নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। পিতার কাছ থেকে জন্মসূত্রে এই গুণটি শংকর পেয়েছেন। মাতৃদেবী ছিলেন মহাদেবের প্রতি একান্ত অনুগতা। তাই পুত্রের নাম আদর করে রাখেন শংকর। মায়ের কাছ থেকে ভোলানাথের প্রতি নিষ্ঠা পেয়েছেন পুত্র শংকর।

জন্মসিদ্ধ শিবভক্ত বালক শংকর কোন কালেই গৃহী হবার স্বপ্ন দেখেন নি। নানা প্রকার বিপর্যয়ের মধ্যেও নিজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন নি। ছাত্র জীবনে এবং অর্থ উপার্জন কালে মনের গভীরে সুপ্ত বাসনাকে ধরে রেখেছেন, কেবলই আদর্শ আশ্রমের সন্ধানে থাকতেন; ঘনিষ্ঠ মহলকে বলে রেখেছিলেন উপযুক্ত গুরুর সন্ধান দিতে।

জেঠাতো ভাই দীপেশ হলেন শংকর থেকে প্রায় দুই বৎসরের বড়। দীপেশ কয়েক বৎসর আগেই শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুপুরীজি মহারাজের সংস্পর্শে আসেন। দীপেশ থাকেন বিষ্ণুপুরীজির আশ্রমে। নবাগত ও অনুগত দীপেশ আশ্রমের কাজে সহায়তা করেন। চারিত্রিক গুণে ক্রমেই মঠাধ্যক্ষের আস্থাভাজন হচ্ছেন বালক দীপেশ। মঠাধ্যক্ষ আরো নিষ্ঠাবান শিষ্যের সন্ধানে আছেন। দীপেশ একদিন কথা প্রসঙ্গে অনুজ শংকরের কথা বল্‌লেন। মঠাধ্যক্ষ রাজী হলেন। দীপেশ নিজে গেলেন বর্ধমান জেলার খাসকেন্দা

নামক গ্রামে। ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও শংকর আর্থিক লেন-দেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রাখতেন। দীপেশের মুখে বিষ্ণুপুরীজির মাহাত্ম্য শুনে শংকর এক কথায় রাজী হলেন। অনতিবিলম্বে দোকান গুটিয়ে নরেশ দাদাকে প্রণাম করে দীপেশ ও শংকর রওনা হলেন কলিকাতা অভিমুখে। দক্ষিণ কলিকাতাতে বিষ্ণুপুরীজির আশ্রম অবস্থিত।

২৩শে জুন ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ শংকরের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিন। সেদিন দীপেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শংকর পৌঁছলেন বিষ্ণুপুরীজির আশ্রমে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, দুই ভাই। স্নান, থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থাদি মঠাধ্যক্ষের নির্দেশে হল। এক পরিবারের দুই সুসন্তান একই আশ্রমে সৎ-চিদ্-আনন্দময় জীবন যাপন করছে। তখনও কারো দীক্ষা হয় নি।

১৯৮৬ সালে মঠাধ্যক্ষ বিষ্ণুপুরীজি আগরতলাতে নিয়ে আসেন শংকরকে। আগরতলার দক্ষিণ প্রান্তে উত্তর বাধারঘাট নামক স্থানে তাঁর আশ্রমের শাখা অবস্থিত। সেই শাখাতে শ্রীমৎ অখণ্ড পুরী কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। অখণ্ড পুরীজির সহায়ক রূপে নিযুক্ত হলেন শংকর।

১৯৮৭ সালেই সম্ভবতঃ আগরতলার বুকে বটতলার পূর্বদিকে অবস্থিত সুরেন্দ্র বণিক মহাশয়ের আশ্রমিক বাড়ীটি দান হিসাবে পাওয়া গেল। সেই বিশাল বাড়ীটিকে আশ্রমের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব এল বিষ্ণুপুরীজি মহারাজের শিষ্য-ভক্তদের উপর। সেই দায়িত্বের অংশীদার হলেন শংকর।

১৯৮৮ সালে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ মেলা হল। লক্ষ-লক্ষ তীর্থ যাত্রীদের সমাবেশ হয় এই প্রাচীন ও বৃহৎ মেলাতে। সেই মেলাতে বিষ্ণুপুরীজি অস্থায়ী আখড়া গড়লেন। প্রতিদিন স্নান-দান-প্রবচন-দীক্ষা চলে। সেই শুভলগ্নে শংকর হলেন দীক্ষিত। দীক্ষান্তে ব্রহ্মচারী আগরতলায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

১৯৯২ সালে উজ্জয়িনীতে পূর্ণ কুম্ভমেলা হল। সেখানেও বিষ্ণুপুরীজি অস্থায়ী আখড়া গড়লেন। যথারীতি স্নান-দান-প্রবচন-দীক্ষা চল্‌ল। সেই কুম্ভে দুই ব্রহ্মচারী ভাই সন্ন্যাস পেলেন। অতঃপর দীপেশ হলেন শ্রীমৎ স্বামী দিবাকর পুরী মহারাজ, শংকর হলেন শ্রীমৎ স্বামী অনির্বাণ পুরী মহারাজ।

শ্রীমৎ স্বামী অনির্বাণ পুরী মহারাজ দীর্ঘদেহী নন, সুঠাম দেহী নন। তাঁর গড়ন পাতলা, গায়ের রঙ শ্যামলা। তিনি সুবক্তা নন, সুপণ্ডিত নন, বিচক্ষণ সংগঠক নন, অতি উচ্চ মার্গের সাধক নন। তাঁর চরিত্রের ইতিবাচক দিক্ অন্য দিকে। তিনি নিষ্ঠাবান শিষ্য, সৎ আশ্রমিক, গুরুর আজ্ঞাপালনে আরুণি সদৃশ্য। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন, গুরুর আশ্রম থেকে অন্যত্র গিয়ে নিজে স্বাধীনভাবে বসার অভিপ্রায় তাঁর নেই। গুরুর আশ্রম ধরে

রাখা, গুরুর উপদেশ যথাসাধ্য প্রচার করা, গুরুর সেবাপ্রকল্প ছাত্রাবাসটি পরিচালনা করা তাঁর লক্ষ্য। একাজে অনেকেই সহায়তা করেন। তাঁর সাথেই থাকেন গুরুভাই শ্রীমৎ স্বামী প্রেমপুরী মহারাজ। গুরুদেবের শিষ্যা শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্তা বৎসরের পর বৎসর প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা আশ্রমের কাজে তদারকি করে চলেছেন। তাঁর নীরব নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। ❑

সাধ্বী উর্মিলা সরকার

ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তে, বিলোনীয়া মহকুমাতে, ঋষ্যমুখ জনপদে কালিকাপুর নামক গ্রাম নিবাসী নিশিকান্ত সরকার ও প্রেমদাসুন্দরী সরকার-এর কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন উর্মিলা সরকার। সৎ, নিরীহ, নির্বিবাদী লোক হিসাবে শ্রী নিশিকান্ত সরকার ঋষ্যমুখ অঞ্চলে সুপরিচিত। তিনি দক্ষিণ শিক পরগণা থেকে ঘর জামাই রূপে কালিকাপুরে আসেন। একই শ্বশুর বাড়ীতে অপর একজন ঘর জামাই হলেন রমেশ চন্দ্র পাল।

নিশিকান্ত ও প্রেমদাসুন্দরীর পুত্র-কন্যা হল মোট আট জন। ইহাদের নাম হল, যথাক্রমে — প্রমিলা, উর্মিলা, আরতি, সুকুমার, বিশ্বেশ্বর, কেশব, কিশোর ও বাবুল। এই আট ভাই-বোনের মধ্যে একমাত্র উর্মিলা হলেন সর্বত্যাগিনী সাধিকা। উর্মিলাদেবীর জন্ম আনুমানিক ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে। উর্মিলার বাল্য, কৈশোর, যৌবন অতিবাহিত হয়েছে পিতৃগৃহে। গ্রাম্য পাঠশালাতে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর, আর জাগতিক পড়াশুনায় মন বসল না। অনুজ সুকুমার সরকার হলেন স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ যুবক এবং সমাজসেবক। সুকুমার ধর্মপ্রাণ, নিরহঙ্কারী যুবক। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে সুকুমার মাটি কাটার সময় পেলেন পবিত্র শালগ্রাম শিলা। উর্মিলা মহাদেব কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হলেন যেন ভক্তিভরে শালেগ্রাম শিলার পূজা করেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে দীক্ষা নিলেন উর্মিলা। দীক্ষা গুরু হলেন প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে উর্মিলা চলে গেলেন বৃন্দাবন ধামে। ৬ বৎসর বৃন্দাবন থাকার পর ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে এলেন ত্রিপুরাতে। কয়েক বৎসর ত্রিপুরাতে থাকার পর আবার গেলেন। এইভাবে আসা যাওয়ার মধ্যে জীবন যাপন করছেন।

উর্মিলা দেবী কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতা। শুদ্ধ, সাত্ত্বিক জীবন যাপনের জন্য উর্মিলা দেবী ছোট-বড় সকলের প্রিয়। শান্ত, ধীর-স্থির, অকপট স্বভাব হল তাঁর জন্মসিদ্ধ। নির্লোভি, নিরহঙ্কার, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা উর্মিলা দেবী সমস্ত মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, অজানা-অচেনা বৃন্দাবনে চলে গেলেন। অন্তরে ঐশী শক্তির প্রাবল্য কত বেশী হলে এমন আদর্শ জীবন যাপন সম্ভব। ❑

সাধ্বী গায়ত্রী দেবী

পূর্ব বঙ্গের শ্রীহট্ট জেলাতে, হবিগঞ্জ মহকুমাতে, মাধবপুর থানাতে বরক নামক গ্রাম-নিবাসী নগেন্দ্র চন্দ্র বণিক ও কুসুমকামিনী বণিক নামক দম্পতির গৃহে ১০ই পৌষ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এক কন্যা, যাঁর পিতৃদত্ত নাম হল উষারানী বণিক। পরবর্ত্তীকালে তিনি সাধ্বী গায়ত্রী দেবী নামে পরিচিতা হন।

বণিক হল বঙ্গজ বৈশ্য। ইহারা ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য। ইহাদের মধ্যে কয়েক প্রকার ভাগ বা গোষ্ঠী আছে, যেমন গন্ধ বণিক, শঙ্খ বণিক, সুবর্ণ বণিক, কাঁসারী বণিক প্রভৃতি। উষারানীর পরিবার হল গন্ধ বণিক। নগেন্দ্রের পাঁচ সন্তান, ইহাদের নাম হল নরেশ, উষারানী, রাকেশ, প্রভাবতী, কিরণবালা। জন্মভূমির কথা কিছুই মনে নাই উষারানীর। অতীব শৈশবে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন নরেশ ও উষারানীর মাত্র জন্ম হয়েছে। রাকেশ, প্রভাবতী ও কিরণবালার জন্ম আগরতলাতে। উষারানীর যখন মাত্র ৬ মাস বয়স, তখন পিতা-মাতা কোলে করে আনেন ত্রিপুরাতে। কিছু দিন আগে (১২.২.১৯৫০) সংঘটিত ভৈরবের দাঙ্গার তীব্র আলোড়ন ও আতঙ্ক হিন্দু জনমানসে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। ১৩৫৯ বাংলার আষাঢ় মাসে কাতলামারা নামক গ্রাম দিয়ে ত্রিপুরাতে প্রবেশ করেন এই পরিবার। পথে বাধা-বিপত্তি হয়েছিল। এখানে এসে প্রথমে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে, পরে বালুছড়া ত্রাণ শিবিরে ও পরে অরুন্ধুতিনগর ত্রাণ শিবিরে থাকেন। ভূমিহীন উদ্বাস্তুদিগকে নগদ ত্রাণভাতা এবং পরে ৫ কানি অনাবাদি ভূমি দিত। এই পরিবার ভুমি পেল বড়জলাতে। সেখানে না গিয়ে, ভট্টপুকুরে ছোট একটুখানি জায়গা কিনে বাড়ী করল।

নগেন্দ্র বণিক জাতে ব্যবসায়ী হলেও, উদ্যোগী ও কর্মবীর ছিলেন না। কোনমতে সংসার চালাতেন। তাঁর উদ্যোগহীনতা ও জন্মভূমিত্যাগ মিলে পরিবারে অশেষ দুর্গতির কারণ হল। আগরতলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তস্থিত ভট্টপুকুর নামক গ্রামে অবস্থিত বাপুজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হল উষারানীকে। উষারানীর পড়াশুনা বাপুজী বিদ্যালয়েই, অন্য কোন বিদ্যালয়ে নহে। বাল্যশিক্ষার পর, তৃতীয় শ্রেণী অবধি।

উষারানীকে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল ১৯৬৭খৃষ্টাব্দে। স্বামীর নাম নেপাল চন্দ্র বণিক। আগরতলা বিমানঘাটির নিকটবর্তী নতুন নগর হল উষারানীর শ্বশুর বাড়ী। সেখানে একটু পাড়াগাঁয়ে তখন বনজঙ্গল। উষাকে বলা হল লাকড়ী কেটে আনতে। লাকড়ী কাটতে গিয়ে একদিন হাতের শঙ্খ ভেঙ্গে গেল। জাঁদরেল শ্বাশুরী নবাগতা পুত্রবধুকে খুব

শাসাল। কয়েক বেলা উপবাসে রাখল। এই ভাবে সম্পর্ক তিক্ত হতে-হতে,অবশেষে শ্বশুর বাড়ী থেকে উষারানী পালিয়ে এলেন পিতৃগৃহে। এক বৎসর পিতৃগৃহে থাকেন; একবৎসর পর স্বামী এলেন এবং ভট্টপুকুরে কার্তিক সাহার বাড়ীতেআলাদা ঘর ভাড়া করে থাকেন; সেখানেই রত্না ও স্বপ্নার জন্ম হল। এখানেও শান্তি হল না। কেন পুত্র হল না এই নিয়ে নেপালের মনে অভিযোগ, যেন এজন্য দায়ী স্ত্রী উষারানী। স্বামী-স্ত্রীতে মন কষাকষি, ঝগড়া, বিচ্ছেদ। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৩৫৯ বাংলার আষাঢ় মাসে উষারানী ৬ মাস বয়সে ঘরছাড়া হন প্রথমবার; আবার ১৩৮১ বাংলার আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়বার ঘরছাড়া হন। প্রথম বার নিজে ছিলেন শিশু, দ্বিতীয়বার দুইটি শিশুর মা হয়ে ঘর ছাড়েন। রত্নার জন্ম ১৩৭৮ বাংলার আশ্বিনে, স্বপ্নার জন্ম ১৩৮১ বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসে; অর্থাৎ ১৯৭১ এবং ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে। উভয় বারেই আশ্রয়স্থল আগরতলার দুর্গাবাড়ীতে। দুর্গাবাড়ীতে তিনজন রইলেন। তখন আম-কাঠালের দিন। পচাঁ পরিত্যক্ত আম-কাঠালের ভোতা খাওয়াতেন শিশু কন্যা রত্নাকে । পাশেই ছিল এক পাগল। সেই পাগল মাটির হাঁড়িতে খর-কুটা দিয়ে ভাত রান্না করে স্নানে গেল। তার পাতিল থেকে এক মুঠ ভাত এনে রত্নাকে যেই দিলেন, অমনি পাগল এসে ক্রোধে আঘাত হানল উষার পিঠে । তখন বিষপান করে আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়েছিল। তৃতীয় দিবস রাত্রে এক সাধু এসে খিচুড়ী খেতে দিল এবং ঠাকুরের নাম জপ করতে বল্‌ল। পরদিবস সকালে পিতা এসে নিয়ে গেলেন ভট্টপুকুরের বাড়ীতে । পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সাথে মাত্র কয়েক দিন থাকার পর, প্রতিবেশী অজিত দত্তের বাড়ীতে কাঁচা ঘর ভাড়া করে আলাদা থাকেন। অবলম্বন ভিক্ষাবৃত্তি এবং কাঁচা ঘাস তুলে বিক্রয় করা। আরেক প্রতিবেশী মাখন কর। তাঁর বাড়ীতে গরুর গামলাতে রাখা ফেন এনে খেতেন। কখনো-কখনো কচুর শাক কাঠালের বীচি রান্না করে খেতেন ও শিশুকে খাওয়াতেন। আরেক প্রতিবেশীর বাড়ীতে অসুখ ও অশৌচ উপলক্ষে এক মাসের জন্য কাজে নিযুক্ত হন; কাজের বিনিময়ে চাইলেন একখানা পুরাণ শাড়ী। কিন্তু মাসান্তে শাড়ী না দিয়ে, দিল মাত্র পাঁচ টাকা। উষারানী সেই টাকা না নিয়ে ঐ বাড়ীর ঠাকুরের আসনে রেখে এলেন। তখন তাঁর কাপড়ের এতই অভাব যে, অর্ধেক কাপড় পরিধান করে, বাকী অর্ধেক রোদে শুকাতে হত। মাত্র একখানা শাড়ী ছিল, তাই কাজের পারিশ্রমিক রূপে একখানা কাপড় চেয়েছিলেন। সেখানে পেলেন বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ । দাদার কাছে চেয়েও পেলেন না কাপড়। ইদুর মারার বিষ পান করে আত্মহত্যার চিন্তা এবারেও মাথায় এল।

১৭ই শ্রাবণ ১৩৮১ বাংলাতে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে উষারানীর পিতৃবিয়োগ হল। মৃত্যুকালে কন্যাকে দিয়ে গেলেন একখানা শ্রীমদ্ভবদগীতা, ওঁকার বিগ্রহ এবং আর্শীবাদ। যাবার বেলায় ক্ষমা চাইলেন, নামজপ করতে বল্‌লেন। ১৯৬২ সনে চীন কর্তৃক ভারত

আক্রান্ত হয়েছিল। তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোরারজী দেশাই স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন করেছিলেন। ইহার প্রতিবাদে ভারতের স্বর্ণশিল্পীরা কিছুটা বিপক্ষীয় মদতে প্রতিবাদী আন্দোলন করেছিল এবং অনেকেই কারাবরণ করেছিল। নগেন্দ্র বণিক ১৪ দিন কারারুদ্ধ ছিলেন। সেই সুবাদে কন্যা উষারানী যদি চাকুরী পায়, এই আশায় হিমাংশু ভট্টাচার্য নামক জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী উষাকে নিয়ে যান স্বাস্থ্য দপ্তরে। কিন্তু সেখানেও কিছু আকস্মিক উৎপাতের প্রাক্‌মুহূর্তে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে দৃঢ়পদে বেরিয়ে আসেন। অতঃপর মাছ বিক্রয় করে কন্যাদের প্রতিপালন করতে থাকেন উষা।

অতঃপর আত্মহত্যা নয়, আত্মশক্তি জাগানোর চিন্তা এল। মানুষের নিকট নয়,দেবতার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে দুঃখদুর্দশা দূর করার পরিকল্পনা নিলেন। কৈশোরে বিদ্যালয়ে ফুল-দুর্ব্বা নিয়ে যেতেন বলে, বইতে দেবতার ছবি আঁকতেন বলে, গাছতলে কোন দেবমূর্তিতে পূজা দিতেন বলে, হাওড়া নদী তীরে বালুতে শিব গড়তেন বলে ধিক্কৃতা হয়েছিলেন, পিতার হাতে মার খেয়ে ছিলেন, প্রহ্লাদের মতো নির্যাতিতা হয়েছিলেন। অথচ মৃত্যুকালে পিতা সেই পথ অবলম্বন করতেই বলে গেলেন। তাই ১৯৭৪ সালের শেষ ভাগেই এই পথ বেছে নেবার বিশ্বাস দৃঢ় হল।

১৯৭৫ সালের আষাঢ় মাসে কালীদেবীর পূজা আরম্ভ করলেন। সেই পূজা আকস্মিক নয়, মানসী নয়, অংশকালীন নয়, বিনোদন নয়, আধমনা নয়। ইহাতে সম্পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস ছিল; ইহা ছিল জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রাম। ফলে পূজাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল অতিশীঘ্র। ইহা প্রচার হতে দেরী লাগল না। ভাড়াটে বাড়ীতেই লোকসমাগম হতে থাকে। গৃহ স্বামী আপত্তি জানালে পর ঐ বাড়ী ছাড়েন। মেলার মাঠনিবাসী ভুবনচন্দ্র দে মহাশয়ের মন্দিরময় বাড়ীতে কিছুকাল থাকেন। ২ বৎসর সেখানে রইলেন। সেখানেও ভীড় হতে থাকে। তখন (১৯৭২-১৯৭৭ খ্রীঃ) ত্রিপুরাতে সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন। এই সময় জাতীয় জরুরী অবস্থা (২৫.৬.১৯৭৫-২০.৩.১৯৭৭ খ্রীঃ) ঘোষিত। ৩০.৩.১৯৭৭ দিনাংকে সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করল। জরুরী অবস্থায় জয়নগর নিবাসী রাসু দত্ত নিরাপত্তা আইনে ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। রাসু দত্তের স্ত্রী স্বীয় স্বামীর মুক্তি কামনা করে উষারানীর নিকট এসে কালীমাতার শ্রীচরণে অনেক দান-দক্ষিণা করেন। রঞ্জিৎ দেববর্মন নামক জনৈক ভক্ত দিতে চাইলেন আসন ও ভূমি। সুখময় বাবু দিতে চাইলেন ভূমিসমেত মন্দির। কিন্তু মন থেকে সাড়া পেলেন না, এত বড় দান গ্রহণ করতে। যাই হোক, এভাবে জনপ্রিয়তা বাড়ছে, আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। এবার তিনি মেলার মাঠনিবাসী সাতলাখীর বাড়ীর পাশেই একবাড়ীতে ঘরভাড়া করে ফেলেন। বিগ্রহ রইল ভুবন দে মহাশয়ের বাড়ীতে। নিত্য পূজা দিয়ে যান। এমন সময় ভাড়াটে বাড়ীতে

একটু অশান্তি হল। ইত্যবসরে শান্তিপাড়া নিবাসী বিখ্যাত ব্যবসায়ী অমর সাহা অনুরোধ জানান নতুন নগরে কাঁঠালতলীতে আশ্রম করে দিলে থাকার জন্য। অমর বাবুর স্ত্রীও এলেন। অবশেষে গেলেন নবনির্মিত আশ্রমে। কিন্তু কিছু দিন যেতেই উপর থেকে শাসন ভাল লাগল না। এদিকে রাসু দত্ত কারামুক্ত হয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন এসব খবর। তাই তিনি একদিন বিনোদ সাহা, মানিক ধর প্রমুখ শুভানুধ্যায়ী সহ গিয়ে লালমোহন পালের গাড়ীতে করে নিয়ে আসেন আগরতলার দক্ষিণে হাতীলেটা নামক গ্রামে। এখানে আসার আগে, তাঁর মা ও ভাই বোনেরা ভট্টপুকুরের বাড়ী বিক্রয় করে বড় জায়গা কিনে বাড়ী করেছিলেন ১৯৭৫ সালে এই হাতী লেটা গ্রামে। তাই মা-ভাইবোনের লপ্তে পৌঁছে দিলেন রাসু দত্ত প্রমুখরা। উষারানীকে ১৯৭৮ সালে হাতী লেটাতে আনা হল। আবার দেখা দিল অশান্তি। বাড়ীতে তামসিক খাবার রান্না হয়; এতে মতভেদ দেখা দিল। ইহার পরিণাম উপলব্ধি করে তিনি ১৯৭৮ সালে মাত্র ২০০০ টাকা দিয়ে ১০ গন্ডা ভূমি ক্রয় করে নেন। ১৯৮০ সালের জুন মাস। ত্রিপুরাতে দাঙ্গা। বাড়ীতে মনোমালিন্য। ভাই স্পষ্ট করে বলে দিল বাড়ী থেকে বের হয়ে যেতে। তাই দুই কন্যাকে সাথে নিয়ে হাতী লেটা গ্রামেই ক্রীত ভূমির পাশেই জীতেন্দ্র দেবনাথের বাড়ীতে ঘর ভাড়া করে চলে আসেন। অমরপুর নিবাসী চিন্তাহরণ তালুকদারের কন্যা সে-সময় এক বস্তা চাউল, ডাল, সব্জি নিয়ে আসেন।

ভূমিহারা হলে মানহারা হয়। মানহারা হলে গুণহারা হয়। তাই পায়ের তলে নিজস্ব ভূমি অত্যাবশ্যক। ভাড়াটিয়া বাড়ীর পাশেই ১০ গন্ডা ভূমি ক্রয় করেছিলেন ১৯৭৮ সালে, ভক্তদের দেওয়া অর্থ ও অলংকার দিয়ে। সেই ১০গন্ডা ভূমিতে ১৯৮০ সালের জুলাইতে (আষাঢ় মাসে, ১৩৮৭ বাংলাতে) স্বহস্তে বন কেটে মাটি সমতল করে নিলেন, মাটির কোঠাঘর করলেন, নিজে ছানি দিলেন । শ্রমিক দিয়ে কুঁয়া কাটালেন। এ সব করলেন আষাঢ় মাসে, ১৩৮৭ বাংলাতে। এত দিনে নিজের ভূমিতে কুড়ে ঘরেই আশ্রয় নিলেন। কুড়ে ঘরে থেকেই শিল্পের বড়াই করার মতো মনোবল হল। পরের বছর কিনেন পার্শ্ববর্তী ৫ গন্ডা ভূমি, এর পরেই কিনেন ৭ গন্ডা ভূমি। এই ভাবে ২২ গন্ডা ভূমির উপর বড় আশ্রম গড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হল।

১৯৮৬ সালে বড় মেয়ে রত্নাকে পাত্রস্থ করা হল। রত্না ১৯৮৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে অর্থাৎ ১৯৮৮ সালের জুলাইতে নির্মিত হল শ্রীশ্রী আনন্দময়ী কালীদেবীর পাকা মন্দির। সেই বৎসরেই বর্ষার শেষভাগে ঝড়তুফানে ভেঙ্গে ফেলল সেই কাঁচা ঘরটি, যেটি ১৩৮৭ বাংলার আষাঢ়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই আদি নিবাস বিনষ্ট হওয়ায়, রাত্রেই তিনি পাকা মন্দিরে আশ্রয় নেন। পরদিন খবর পেয়ে

ভক্তরা গেলেন এবং পাকা ঘরবাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা নিলেন।

আশ্রমের সামনেই ২ কানি ভূমি ক্রয় করা হয়েছে, দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ার উদ্দেশ্যে। অনেক ভক্তের অবদানে আজ মাঝারি ধরণের একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে। এ সব ভক্তদের ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে কয়েক জনের অবদান তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তাঁরা হলেন-

রাসেশ্বর দত্ত, ভুবন দে, রোহিনী সাহা, বিনোদ সাহা, শশীমোহন সাহা, শম্ভু দাস, সুরেশ দেবনাথ।

১৯৮৯ সালে রত্না সরকারী চাকুরী পেয়েছে। রত্নার একমাত্র মেয়ে আছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই রত্না স্বামীহারা হয়েছে। কন্যাকে নিয়ে, রত্না এখন মায়ের সাথেই থাকে। স্বপ্নার বিয়ে হল ১৯৯৬তে। স্বপ্না থাকে স্বামীগৃহে, অন্য গ্রামে।

প্রতি বৃহস্পতি বার তিনি মৌন থাকেন। প্রতিদিন বিকালে গীতা ভাগবদ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করে শুনান। আশ্রমে নিত্য সেবা পূজা হয়; বাৎসরিক কালীপূজা, দুর্গাপূজা,ইত্যাদি হয়। প্রতি বৎসর পূজাতে অন্নদান ও বস্ত্র দান করা হয়। ভারত বিকাশ পরিষদ ২০০০ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রমেই চক্ষু চিকিৎসা শিবির করেছিল। সনাতন ধর্ম পরিষদের তিনি উৎসাহী সদস্যা। মহানাম অঙ্গন কর্তৃক আয়োজিত মানব ধর্ম সম্মেলন ১৯৯৬ খ্রীঃ থেকে হয় আগরতলাতে। তাতে তিনি যোগদান করেন যথেষ্ঠ উৎসাহ নিয়ে। তিনি ১৯৭৬ থেকে দিনলিপি লিখেন। তিনি ভারতের প্রায় সব কয়টি প্রধান তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ করেছেন। তিনি স্বরচিত ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

তাঁর উপলব্ধিপ্রসূত মর্মবাণী আছে অগণিত। তন্মধ্যে মাত্র গুটি কতক নীচে উল্লেখ করা গেল —

(ক) পতিতকে টানিয়া তোলাই জ্ঞানী মহতের লক্ষণ

(খ) সুষ্ঠু সমাজ পরিচালনায় আত্মজ্ঞান সম্পন্ন তেজস্বী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন

(গ) ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে, মনের বিভ্রান্তি দূর হয়

(ঘ) ঈশ্বরকে যে ভালোবাসে, প্রতি জীবকে সে ভালোবাসে

(ঙ) সনাতন ধর্মের মূল মেরুদন্ড হল চরিত্র গঠন, ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা।

অবশেষে প্রশ্ন হল- কে ভিক্ষা করল, কে ক্ষুধার জ্বালায় কচুর শাক খেল, ঝড়ে কার ঘর ভেঙ্গে গেল, কে মেয়ে বিবাহ দিল, কে কখন উদ্বাস্তু হল, কে কার ঘর বাড়ী করে দিল,

কে কোন্ মন্দির গড়ে দিল- এসব লিখে লাভ কি? এসব জেনে লাভ কি? এর থেকে শিক্ষার কি আছে? উষারানীর জীবনী থেকে আমাদের এটাই শিক্ষার আছে যে,দেবভক্তি ও আত্মশক্তি যুক্ত হলে মানুষ দৈন্যদশা থেকে যশ-খ্যাতির শীর্ষে উঠতে পারে। যার ভেতর জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি রূপ ত্রিধারা প্রবাহিত হয়, তাকে সহায়তা করার জন্য চিরকাল কিছু উদার হৃদয় এগিয়ে আসে। গায়ত্রী মন্ত্রের শেষাংশে প্রার্থনা করা হয়েছে, যাতে ঐশ্বরিক শক্তি আমাদের বিচার -বুদ্ধিকে উর্দ্ধমুখী করে। উষারানীর বিচারবুদ্ধিতে এই প্রার্থনার ব্যবহারিক প্রয়োগিক রূপ প্রকটিত। তাই ভক্তদের দৃষ্টিতে তিনি সাধ্বী গায়ত্রী দেবী। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) খ্রী কর্তৃক রচিত একটি নারীচরিত্রের সহিত গায়ত্রী দেবীর তুলনা চলে। নির্যাতিতা প্রফুল্ল অবশেষে ভবানী পাঠক নামক গুরুর সৎপরামর্শে ও সৎউপদেশে তেজস্বিনী দেবী চৌধুরানীতে উন্নীতা হয়েছিলেন। উষারানী তেমনি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের (১৮৩৬-১৮৮৪ খ্রীঃ), স্বামী স্বরুপানন্দের (১৮৮৭-১৯৮৪ খ্রীঃ) স্বপ্নাদেশে গায়ত্রী দেবীতে উন্নীতা হলেন। ভগবান তাদেরকেই সহায়তা করেন যারা কর্মতৎপর, শ্রদ্ধাপরায়ণ। এই হিতোপদেশের অন্যতম উদাহরণ হল গায়ত্রী দেবীর জীবন। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাসকে অবলম্বন করে তিনি নানা গোলকধাঁধা থেকে বীরাঙ্গনা রূপে বের হয়ে আসতে সমর্থ হন। ❑

শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মা

ত্রিপুরা রাজ্যের তেলিয়ামুড়া নামক থানার অন্তর্গত রাজনগর নামক গ্রামে পিতা চিন্তাহরণ সরকার ও মাতা সুরুচিবালা সরকারকে আশ্রয় করে আবির্ভূতা হন এক সুদর্শনা কন্যা, যাঁর পিতৃদত্ত নাম হল অপর্ণা সরকার এবং সাধন জগতে নাম হল শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মা। তাঁর জন্মতিথি হল সোমবার, শুভ পৌষ সংক্রান্তি,১৩৫৮ বঙ্গাব্দ (জানুয়ারী ১৯৫২ খৃঃ)

চিন্তাহরণ ও সুরুচিবালার পুত্রকন্যার সংখ্যা পাঁচ জন; তাঁদের নাম হল যথাক্রমে ঝর্ণা, অপর্ণা, রতন, খোকন। দ্বিতীয়া কন্যা শৈশবে মারা যায়। তৃতীয়া কন্যা অপর্ণা হলেন শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মা। অপর্ণার শৈশব, বাল্য, কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে তেলিয়ামুড়াতে। তিনি দুইটি বিদ্যালয়ে (মহারানীপুরস্থিত বিদ্যালয়, কালাটিলাস্থিত বিদ্যালয়) পড়াশুনা করেছেন। কন্যাকে উচ্চশিক্ষা না দিয়ে, পিতা কন্যাদান (১৯৬৪ খ্রীঃ) করে দেন। তখন অপর্ণার বয়স মাত্র ১২ বৎসর (৭.২.১৩৭০বঙ্গাব্দ)। পাত্রের নাম শ্রী ফণিভূষণ দাস, পঞ্চায়েত বিভাগে সরকারী কর্মচারী। কালক্রমে ফণিভূষণ ও অপর্ণার চারপুত্র জন্মিল; পুত্রদের নাম হল অরুণ, কানাই, নিমাই, নিতাই। আগরতলা নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে ভট্টপুকুর নামক পল্লীতে ফণিভূষণের বাড়ী বিদ্যমান। আগরতলা এবং ভট্টপুকুর - এর মধ্যস্থল দিয়ে পশ্চিমমুখী হাওড়া নদী প্রবাহিতা। চার পুত্রের জন্মসন হল যথাক্রমে ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১ এবং ১৯৭৩ খৃঃ। তৃতীয় পুত্র নিমাই শৈশবে মারা যায়। বাকী তিনপুত্র বর্তমান।

বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, হাসিখুসী মেজাজ এবং পরোপকারী স্বভাব থাকায় গৃহবধু অপর্ণা সহজেই ও শুরুতেই শ্বশুরালয়ে বড়দের স্নেহভাজন হলেন এবং পাড়া-প্রতিবেশীর স্নেহভাজন হলেন। কিন্তু কালক্রমে এই জনপ্রিয়তা হয়ে গেল অশান্তির ও ঈর্ষার কারণ। বাড়ীতে এত লোকের যাতায়াত পছন্দ হল না কারো কারো। গৃহদাহের সূত্রপাত হল। ইহার চরম পর্যায়ে অপর্ণার উপর প্রচন্ড মানসিক বেদনা এবং দৈহিক নির্যাতন চল্‌ল।

এমন সময় এল যুগসন্ধিক্ষণ। এ যেন সীতার অগ্নি পরীক্ষার মুহূর্ত্ত। এযেন ভক্ত প্রহ্লাদের অন্তিম নির্যাতনক্ষণ। বিশেষ তিথিটি ছিল শ্রাবণী অমাবস্যা ১৩৮১ বঙ্গাব্দ (১৯৭৪খৃঃ) ঘনঘোর বর্ষা। নিকটবর্তী মাট-ঘাট, দীঘি-নালা জলমগ্ন। সেদিন গৃহবধু অপর্ণা পুকুরের ভেতর পেলেন দক্ষিণেশ্বরী কালী মূর্তি। ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে সেটিকে দেবালয়ে স্থাপন করা হল। এই খবর তড়িৎগতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। অতঃপর প্রতি শনি-

মঙ্গলবার লোমসমাগম অস্বাভাবিক বেড়ে গেল। ভাবাবিষ্টা অপর্ণা যা বলেন, তাতে ভক্তরা উপকৃত হতে লাগল। অপর্ণার ব্যক্তিত্বে নতুন মাত্রা যুক্ত হল। কিন্তু পাশাপাশি যুগপৎ চল্‌ল গৃহবিবাদ, দ্বৈরথ, মনোমালিন্য। ইহা চল্‌ল প্রায় ১২ বৎসর (১৯৭৪-১৯৮৬ খ্রীঃ)। আর নয়; এবার গৃহছাড়ার পালা। শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে, স্বমহিমায়, স্বভূমিতে, সাধনার উচ্চকোটিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পালা।

আগরতলা নগরের পশ্চিম প্রান্তে প্যারীবাবুর (১৮৭৬-১৯৪৮ খ্রীঃ) বাগান নামে একটি সমৃদ্ধজনপদ আছে। সেই জনপদ-নিবাসী দুই তরুণ, উদ্যোগী ভক্ত (গজু দত্ত, বাপী পাল) সেই সংকটকালে এগিয়ে এলেন। অপর্ণা দেবীকে নিয়ে এলেন এবং একটি শান্ত পরিবেশ বিশিষ্ট বাড়ীতে রাখলেন। প্রায় ৬ মাস রাখা হল। সেখানেই ভক্ত সমাগম হতে লাগল। গজু ও বাপী আরো দুইধাপ এগিয়ে গেল; দৈনিক খরচবহন করল এবং আশ্রম স্থাপনের জন্য ভূমির সন্ধানে লেগে গেল। অদম্য ইচ্ছা শক্তির দ্বারা উদ্দেশ্য সফল। আগরতলার দক্ষিণে, শান্তিপল্লী ও সিদ্ধি আশ্রম নামক জনপদে জনৈক হীরালাল সাহার বাড়ী বিক্রয় হবে। সেটিই পছন্দ হল এবং কেনা হল(২৫.৬.১৯৮৭ খ্রীঃ)। কিছু দিনের মধ্যেই শান্তিপল্লীতে চলে গেলেন। ভূমি ক্রয়ের ব্যাপারে কতিপয় ভক্ত কায়িক ও আর্থিক সহযোগীতা করেছেন। অতঃপর সুভাষ সাহা প্রমুখ ভক্তরা ভেবে চিন্তে অপর্ণাদেবীর নতুন নামকরণ করলেন শ্রীশ্রী মা স্নেহময়ী। বৎসর তিনেক পরেই জনৈক গুজরাটী ব্যবসায়ী লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে পাকা মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে আগরতলার পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত চম্পকনগর নামক পার্ব্বত্য পল্লীতে গড়া হল স্নেহময়ী আশ্রমের শাখা। প্রথম আশ্রম অর্থাৎ শান্তি পল্লীস্থিত আশ্রম নয়া এক সংকটে পড়ল। রেলপথ তৈরীর জন্য ঐ পল্লীর অনেক ঘরবাড়ী রেল কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণ করল। আশ্রমটিও তাতে অন্তর্ভুক্ত হল। অবশ্য ক্ষতিপূরণ দিল ভারত সরকার। তাই সেই আশ্রম ছেড়ে দিতে হল। গড়ে তোলা হল আগরতলার জয়নগরে নতুন করে আশ্রম। এই কাজে এগিয়ে এলেন এক তরুণ, শিক্ষিত যুবক, নাম শ্রী জ্যোতির্ময় রায়। তেলিয়ামুড়া নিবাসী চিত্তরঞ্জন রায় ও অরুণা রায়-এর পুত্র শ্রী জ্যোতির্ময় রায় (১৭ই ভাদ্র, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ; অর্থাৎ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ খ্রীঃ) মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্মানিক সহ স্নাতক হয়ে এই আশ্রমের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

শ্রীশ্রী অরুণাময়ীর আশ্রমে মুখ্যতঃ দু'টি উৎসব হয়; প্রথমটি হল পৌষ সংক্রান্তিতে, তাঁর আবির্ভাব তিথিতে। দ্বিতীয়টি হয় শ্রাবণী অমাবস্যাতে, তাঁর দিব্যদর্শন তিথিতে। শ্রাবণী অমাবস্যা তিথিতে তাঁকে আসনে সাজিয়ে, বসিয়ে দক্ষিণা কালীমাতাজ্ঞানে পূজা-অর্চ্চনা করা হয়। পুরোহিত শংকর চক্রবর্তী কয়েক বৎসর পৌরহিত্য করেছেন, তারপর

করেন হরিদাস চক্রবর্ত্তী। এছাড়া, প্রতি শনিবারে ও মঙ্গলবারে পূর্ব্বাহ্নে বহু আর্তের আগমন ঘটে। তন্মধ্যে বেশীর ভাগ হল রোগী বেকার, দরিদ্র, বিদ্যার্থী।

স্নেহময়ীর জীবন-সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তিকা, একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। "শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মায়ের লীলাপ্রসঙ্গ" এই নামে কয়েক বৎসর যাবৎ (১৩৯৭, ১৩৯৮, ১৩৯৯, ১৪০০, ১৪০১, ১৪০২, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ) পুস্তিকা প্রকাশিত হল। তাতে উপকৃত আর্তিদের স্বীকার-উক্তি প্রকাশিত। বহুলোক নানা ভাবে উপকৃত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী খ্যাতনাম অধ্যাপক, গবেষক ও লেখক ডঃ সুভাষ সোম একটি মানানসই বই লিখেছেন। বইটির পরিচয় এরূপ ডঃ সুভাষ সোম; **দেবী না মানবী**; প্রকাশক শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মা ধাম ও আশ্রম; আগরতলা; ১৪০৪/১৯৯৮ খ্রীঃ পৃঃ ১৪৪; মূল্য ৭৫ টাকা। ডঃ সোম আরেকটি বই লিখেছেন স্নেহময়ী সম্বন্ধে। এইটির নাম হল- মানবপ্রেমী স্নেহময়ী; কলিকাতা, ২০০১ খৃঃ।

জয়নগরাস্থিত নতুন আশ্রম ভবনটি এখন (২০০০ খৃঃ) নির্মীয়মান। ভক্তরা যার যেমন খুসী অর্থ ও উপকরণ দিয়ে সহযোগীতা করছে। আশ্রমের অভ্যন্তরে ৫/৭ টি আলমিরা ভর্ত্তি ভাল-ভাল কাপড়; শাড়ী, শীতবস্ত্র। সবই ভক্তদের দেওয়া। সে সব তিনি দান করে দেন। কিন্তু নিজে ঘরে থাকাকালীন অতি সাধারণ পোষাক পরিধান করেন। আশ্রমের পাচিকা শ্রীমতী মঞ্জু সরকার রান্না করেন ঠিকই, কিন্তু স্নেহময়ী মা নিজেও থালবাসন ধোয়া, তরকারী কাটা, পরিবেশন করা, কাপড় কাঁচা, প্রভৃতি কাজ করেন প্রয়োজনে। তিনি গান ও কবিতা রচনা করেন; স্বীয় উপলব্ধিজাত হিতোপদেশ লিখে রাখেন। এমন একটি হল "সরলতাই শুচি, হিংসাই অশুচি"। তাঁর শিশু সুলভ সরলতা ও প্রাণখোলা হাসি চম্বুকের মত শক্তিশালী। কেউ যদি শ্রদ্ধার সহিত তাঁর আশ্রমে যায়, তবে তিনি অকপটে অতীতের রোমন্থন করেন, গান-কবিতা শুনান, ছবি দেখান। শ্রাবণ মাসে পদ্মপুরাণ পাঠ করা হল তাঁর বিশেষ সখ। একাজে তিনি গায়ক-গায়িকা নিয়ে ভক্তদের বাড়ীতে গান-বাজনা করেন। তরুণ শিষ্য শ্রী শুভ্রনীল সেন সেদিন (১১. ৮. ২০০০) চুপি-চুপি বল্‌ল- স্নেহময়ী মা স্বয়ং অবতার। ❑

শেখর ব্রহ্মচারী

ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজধানী উদয়পুর নগরে, মধ্যপাড়া নামক পল্লীতে পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য ও বীণাপাণি ভট্টাচার্য নামক দম্পতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এক পুত্র, যাঁর পিতৃদত্ত নাম হল জ্যোতিলাল। জ্যোতিলালের জন্ম সম্ভবতঃ ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে।

পুলিনবিহারী ও বীণাপাণি হলেন পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যার পিতা-মাতা। জ্যোতিলালের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর উদয়পুরে অতিবাহিত হয়েছে। জ্যোতিলালের লেখাপড়া হয়েছে উদয়পুরে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করে আর এপথে পা বাড়ালেন না।

কিশোর বয়সেই জ্যোতিলালের স্বভাবে-চরিত্রে আধ্যাত্মিক প্রবণতার স্ফুরণ ঘটেছিল। বালক জ্যোতিলাল সমবয়সীদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। শটতা, চঞ্চলতা, প্রবঞ্চণা, ফাঁকিবাজি প্রভৃতি তাঁর আচার-ব্যবহারে কখনো প্রকাশ পেত না। তাই বালক জ্যোতিলাল ছিলেন অনেকেরই বিশ্বাসভাজন ও স্নেহভাজন।

সমতল ত্রিপুরাতে আবির্ভূতা পরমযোগিনী শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা (১৮৯৬-১৯৮২ খৃঃ) হলেন ত্রিপুরার গৌরব। তাঁর প্রধান আশ্রম কনখলে স্থাপিত। যুবক জ্যোতিলাল উচ্চ মাধ্যমিক অবধি পড়াশুনা করে, গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন কনখলে। মায়ের আশ্রমে পেলেন আশ্রয়, আদর, আপ্যায়ন ও আশীর্ব্বাদ। কিছুদিন পর শুভদিনে শুভক্ষণে দীক্ষাব্রত অনুষ্ঠান হল। দীক্ষান্তে নতুন নামকরণ হল শেখর ব্রহ্মচারী রূপে। ইহা ১৯৭০ সালের ঘটনা।

চারিত্রিক মাধুর্যে, সেবাপরায়ণতায়, শান্ত স্বভাবের দ্বারা ক্রমেই আশ্রমবাসীদের স্নেহভাজন ও প্রীতিভাজন হয়ে উঠলেন তরুণ শেখর ব্রহ্মচারী। সেই সুবাদে আনন্দময়ী মার সাথে ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণের সুযোগ পেলেন শেখর। শেখরকে দীক্ষা দেবার পর, মাত্র বার বৎসর (১৯৭০-১৯৮২খৃঃ) জীবিত ছিলেন আনন্দময়ী মা, তখন তিনি পরিণত বয়স্কা এবং সম্মানের শীর্ষে। মায়ের একান্ত সেবক হিসাবে নানা স্থানে ভ্রমণের, বহু সাধু-সন্তদের দর্শন পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটে শেখরের।

শেখর ব্রহ্মচারী মূলতঃ ভক্তিমার্গের লোক । জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ তাঁর নিকট গৌণ। তিন মার্গকে ত্রিভুজাকারে সাজালে, শেখরের ক্ষেত্রে ভক্তি উপরে, জ্ঞান ও কর্ম ত্রিভুজের নীচে অবস্থান করবে। এসব তথ্য দিলেন শ্রীতুষারবিন্দু চক্রবর্তী। ❑

তপন সাধু

প্রাক্তন সমতল ত্রিপুরাতে, কসবা থানার পশ্চিমে জীনতপুর নামক গ্রামনিবাসী অখিল চন্দ্র ভট্টাচার্য ও পূর্ণলক্ষ্মী ভট্টাচার্য নামক দম্পতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এক শিশু, যাঁর পিতৃদত্ত নাম হল তপন কুমার ভট্টাচার্য। তপনের জন্মতিথি হল আশ্বিন. ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ। তপনের মৃত্যুতিথি হল ভাদ্র ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খৃঃ। তপনের আয়ুষ্কাল খুব কম, মাত্র ৪২ বৎসর (১৯৫৪-১৯৯৬খৃঃ)।

তপনের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে জীনতপুর নামক গ্রামে। জীনতপুর ছিল সমতল ত্রিপুরার অন্তর্গত। দেশবিভাজনের পর ইহা পূর্ব পাকিস্থানভুক্ত হল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী ভৈরবে রেলগাড়ী থামিয়ে অগণিত হিন্দুকে হত্যা করা হল। সেই আতঙ্কে বহু হিন্দু ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিল। অখিল ও পূর্ণলক্ষ্মী পুত্রকন্যাদের নিয়ে চলে আসেন আগরতলাতে। তখন তপনের বয়স চার বৎসর মাত্র। তপনের বাল্য, কৈশোর, যৌবন আগরতলাতে অতিক্রান্ত হয়েছে। তপনের বিদ্যা শিক্ষা আগরতলাতেই হয়েছে। শ্যামলাবর্ণের, স্বাস্থ্যবান যুবক তপন খেলাধূলাতে উৎসাহী ছিলেন। বাংলাদেশের সংগ্রাম (১৯৬৯-৭০খৃঃ) সবে মাত্র শেষ হয়েছে। একদিন বিদ্যালয়ের মাঠে খেলতে গিয়ে তপন খুব ব্যাথা পান। সেই ব্যাথার পরিণাম হিসাবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হল। এমন উৎসাহী, উদ্যমী যুবক একেবারে গৃহবন্ধী হয়ে গেলেন।

কিন্তু দমে যাবার পাত্র নন তিনি। বিকলাঙ্গ শরীর নিয়েই এই দুর্লভ মানব জীবনকে সফল করতে বদ্ধ পরিকর হলেন তিনি। জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্য চাই অর্থ, ভূমি, আশ্রমিক পরিবেশ। ঠিক সেসময় মণিকাঞ্চন যোগ ঘটল। সরকারের কৃপায় একটি চাকুরী পাওয়া গেল। কর্মস্থল বিশালগড়, আগরতলা থেকে কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে। বিশালগড়েই বড় রাস্তার পশ্চিম পাশেই স্থান নির্বাচন করা হল। বিশালগড় থানাধীন পশ্চিম লক্ষ্মীবিল মৌজাতে মুড়াবাড়ী নামক পাড়াতে এক বড় ভূমি ক্রয় করে নিলেন। প্রায় সায়ে ছয় কানি ভূমিতে গড়ে তোলা হল সাধুনিবাস, ছাত্রাবাস, পাঠাগার, পুকুর, ভোজনালয়, বাগান, উদ্যান ইত্যাদি।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সমাপন করতে দুই দশক সময় লেগেছে। ১৯৭০ এর দশক ও ১৯৮০-এর দশক একাজে গেল।

নিজের সৎ উদ্দেশ্য ও নিরলস উদ্যম থাকলে ক্রমেই অন্যদের দৃষ্টিগোচর হয়। শুরু থেকেই স্থানীয় অভাবগ্রস্থ পরিবারসমূহকে সহায়তা করার সক্রিয় উদ্যোগ ছিল তপন ভট্টাচার্যের। আশ্রমে দীন-দুঃখী, অনাথ বালকদের থাকা-খাওয়ার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হত। আবাসিক বিদ্যার্থীরা হাত গুটিয়ে বসে থাকত না। অবসর সময়ে আশ্রমের নানা প্রকার কাজ করত এবং সাপ্তাহিক মুষ্টিভিক্ষাতে যেত। ত্রিপুরার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'দৈনিক সংবাদ'। ইহার সাংবাদিক ভূপেন দত্ত ভৌমিক বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালে মারা যান। ভূপেন বাবু আর্থিক সহায়তা করে গেছেন এই আশ্রমের প্রতি। ভূপেনবাবু ছিলেন তপনের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক স্বরূপ।

কিছু আনন্দ, উৎসব, গান বাজনা, পূজা-পার্বণ না থাকলে জীবন হয়ে যায় এক ঘেয়ে, শুষ্ক। এই মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন তপন ভট্টাচার্য। তাই তিনি পৌষ পার্বণ, শিবরাত্রী, জন্মাষ্টমী, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি উৎসবের আয়োজন করতে দিতেন। ছাত্ররা, অভিভাবকরা, আশে-পাশের পাড়াপ্রতিবেশীরা তাতে অংশগ্রহণ করে আনন্দ পেত এবং নিজেদের আশ্রম বলেই ভাবতে শিখল।

তপন জন্মসিদ্ধ সাধু নন। এমন অনেক মহাত্মা ছিলেন ও আছেন যাঁরা সাধু হবার জন্য কিশোর বয়স থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পূর্ব জন্মের সাধনালব্ধ পূণ্যবলে বলীয়ান এই সব মহান ব্যক্তি নমস্য। তপন ভট্টাচার্য এই শ্রেণীভুক্ত নন। তিনি ঘটনাচক্রে, অবস্থার বিপাকে সাধু হয়েছেন।

তপনের খ্যাতি মেধাবী ছাত্ররূপে নয়, আদর্শ শিক্ষক রূপে নয়। উচ্চ মার্গের সন্তরূপে নয়, শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক ও বক্তা রূপে নয়। তপনের মহত্ব নিহিত আছে লোককল্যাণে, বিকলাঙ্গ দেহকে উৎসর্গ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মধ্যে। দয়ার পাত্র, সেবার পাত্র না সেজে বরং বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার স্থির বুদ্ধি তপনকে করেছে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তপনের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম ১০৮ শ্রীশ্রী বালক বাবা অনাথ আশ্রম।

অসুস্থ তপনকে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হল নয়াদিল্লীতে। কেন্দ্রীয় সরকারের অখিল ভারত চিকিৎসা কেন্দ্রে। সেখানেই তিনি ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ইং দিনাঙ্কে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহটি আনা হল ত্রিপুরাতে, বিশালগড়স্থিত আশ্রমে। এখানেই সৎকার করা হল। এই আশ্রমেই প্রতিপালিত শ্রী দুলাল সরকার অতঃপর উত্তরসূরী হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। ❑

সর্ববেদানন্দ মহারাজ

ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজধানী উদয়পুর নগরে জগন্নাথ দীঘির পশ্চিম পাড়ে বাস করত একটি ব্রাহ্মণ পরিবার যাদের পূর্ব নিবাস ছিল কুমিল্লাতে ঘাসিগ্রাম নামক পল্লীতে। পরিবারের কর্তা সারদাচরণ চক্রবর্তী ও কর্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী। এই দম্পতি চার পুত্র ও দুই কন্যার পিতা-মাতা। তৃতীয় পুত্র মিহির চক্রবর্তী হলেন উত্তরকালে সর্ববেদানন্দ মহারাজ। মিহিরের জন্ম উদয়পুরে, ১৬ই মাঘ ১৩৬১ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ৩০শে জানুয়ারী ১৯৫৫ খৃঃ।

মিহিরের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে উদয়পুরে। উদয়পুর দীঘি ও মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এই সব হল ত্রিপুরার রাজাদের কীর্ত্তি। সমসের গাজীর আক্রমণে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে উদয়পুর পরিত্যক্ত হল ত্রিপুরার রাজা কর্তৃক। অতঃপর আগরতলা হল ত্রিপুরার রাজধানী। ১৭৪৮ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দুই শত বৎসর উদয়পুর ছিল অর্ধমৃত। ১৯৪৭ সালের পর সমতল ত্রিপুরার কুমিল্লা থেকে বাঙ্গালী হিন্দু আগমন স্রোত উদয়পুরকে পুনরায় প্রাণবন্ত করতে থাকে। সেই আগমন স্রোতে মিহির চক্রবর্তীর পিতা মাতা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মিহিরের লেখাপড়া উদয়পুরে হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ার পর আর এপথে যেতে ভাল লাগল না। কিশোর বয়সেই ভাব প্রবণতা, পরহিতৈষণা, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সঙ্গীতের প্রতি গভীর আকর্ষণ প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মিহিরের মধ্যে প্রকাশ পেল। বিদ্যালয়ের শিক্ষার পাশাপাশি সঙ্গীতের প্রতি, বিশেষতঃ তবলা শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ অনুভব করল মিহির। কালক্রমে সঙ্গীত প্রভাকর হল।

১৯৮০ সালের জুন মাসে ত্রিপুরাতে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। পাহাড়ী-বাঙ্গালী দাঙ্গাতে উভয় সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্থ হল। ইহা বড়ই বেদনাদায়ক ঘটনা। তখন ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রচুর সেবাকাজ করেছিল। তখনই মিহির রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করল।

সেই পরিচয় ক্রমেই ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। মিহির স্বামীজিদের সাথে ত্রাণশিবিরে যেতেন এবং সেবাকাজে অংশ নিয়ে অনাবিল আনন্দ পেতেন। কয়েকমাস পরেই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হল, ত্রাণ শিবির বন্ধ হল, লোকজন ঘরে ফিরল, স্বামীজিরা আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কিন্তু মিহির কোথায় যাবে ? মিহিরের তখন তটস্থ অবস্থা। অবশেষে মায়ার বন্ধন সহজেই ছিন্ন করে মিহির অনুসরণ করল স্বামীজিদের পদাঙ্ক। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে গুয়াহাটি নগরে, রামকৃষ্ণ মিশনে মিহির গুরু কৃপা লাভ করল। শ্রীমৎ স্বামী ইজ্ঞানন্দ মহারাজ শুভদিনে দীক্ষা দিলেন মিহিরকে।

আশ্রমিক জীবনে সর্ববেদানন্দ মহারাজ ঠাকুরের নিত্য পূজাপাঠ করেন, কীর্তন-আরতি করেন। এছাড়া, সেবামূলক কোন কাজের নির্দেশ এলে তা নিষ্ঠার সহিত ও আনন্দের সহিত পালন করেন। এসব তথ্য দিলেন অধ্যাপক তুষারবিন্দু চক্রবর্তী। ❑

গুরুদেব শান্তিকালী

ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তর সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত মনীন্দ্র রোয়াজা পাড়াতে আনুমানিক ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হন এক নবজাতক, যিনি উত্তরকালে গুরুদেব শান্তিকালী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতার নাম ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। ইহারা নোয়াতিয়া ত্রিপুরী সম্প্রদায় ভুক্ত।

ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ছিলেন কৃষিজীবি, জুমচাষী, গৃহী। বিয়ের পর কালক্রমে তিনটি সন্তান জন্মেছিল, কিন্তু তিনটি সন্তানই শৈশবে মারা যায়। পুত্রশোকাতুরা মাতা দুঃখ করে শিবের নিকট মনের আকুতি জানাতেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়স্থিত তীর্থে গিয়ে শিবের পূজা দিলে পুত্রলাভ হবে। পরদিন ভোরে স্বামীকে বল্লেন স্বপ্নের কথা। অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে উভয়ে যাত্রা করলেন চন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে। সাব্রুম থেকে পশ্চিমে ফেনী । ফেনী থেকে দক্ষিণে চন্দ্রনাথ পাহাড়। দীর্ঘ পথ; দুই রাষ্ট্র, অচেনা স্থান। তবুও পুত্রলাভের আশায় তাঁরা সব ঝুকি নিলেন। অবশেষে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন। উঁচু পাহাড়ের চূড়াতে অবস্থিত মন্দিরে উঠতে অনেক সিঁড়ি আছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত পথিকের আর যেন পা চলে না। প্রায় মাঝপথে উঠেছেন, এমন সময় এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী উপর থেকে এলেন। ক্লান্ত পথিকের অবস্থা দেখে দয়ালু সন্ন্যাসী বল্লেন আর উঠতে না পারলে, আমায় দাও, আমিই শিবের চরণে নিবেদন করব। পথিক বল্লেন আমরাই নিবেদন করে মনের বাসনা জানাব। সন্ন্যাসী বল্লেন, বেশ তাই করো। কিন্তু নিজেরা উপরে উঠতে চেষ্টা করেও আর পা চলে না। তাই সন্ন্যাসীকে পুনরায় ডেকে মনের বাসনা জানালেন এবং পূজার উপকরণ দিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী বল্লেন, তোমাদের পুত্রলাভ হবে, সে হবে মহান, তার নাম রেখো শান্তি, ভূমিষ্ঠ হবার প্রথম দশদিন খুব সাবধানে রাখবে, এখান থেকে বাড়ী ফেরার পথে পারৎপক্ষে কোথাও থাকিও না। অনেক কষ্টে, বৃষ্টি বাদলের দিনে বিপদে পড়ে, বাড়ী পৌঁছলেন তাঁরা। যথাসময়ে এক শিশু জন্মিল। কিন্তু এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বন্য বানর এসে অতর্কিতে শিশুকে নিয়ে গেল। চারিদিকে হইচই পড়ে গেল। কয়েক দিন পর এক বিশাল বটগাছের নীচে শিশুকে পাওয়া গেল। এই ভাবে সন্ন্যাসীর সাবধান-বাণী সত্য হল।

শিশু ক্রমেই বড় হতে লাগল। এই কিশোর অন্যদের চাইতে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। একটু ভাবুক, একটু শান্ত প্রকৃতির। কয়েক বৎসর যেতেই, নিকটবর্তী পাঠশালায় ভর্ত্তি করানো হল। মনু বিদ্যালয়ে ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়াকালীন এই কিশোরের মনে ভাবান্তর হল। ভাবান্তর ক্রমে ভাবাবেগে পরিণত হল। পড়াশুনা ভাল লাগে না। বিদ্যালয়ে যেতে অনিচ্ছা।

মা-বাবা আর বাধ্য করেন নি, জোর করেন নি বিদ্যালয়ে গতানুগতিক পড়া চালিয়ে যেতে।

ক্রমে-ক্রমে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর কথা। প্রায়ই তাঁর কথা শুন্‌তে লোক আসতে থাকল। সপ্তাহে দুই দিন, শনিবারে ও মঙ্গলবারে লোক সমাগম হতে লাগল। তখন তাঁর উপর কালী দেবী ভর করতেন বলে তাঁর অনুভব হত। ঐ অবস্থাতে তিনি যা বল্‌তেন তাতে অনেকেই উপকৃত হয়েছে। কেউ পারিবারিক সমস্যা, কেউ দৈহিক রোগ-শোকের সমস্যা নিয়ে আসত। ভাবাবেশে তিনি নিজেকে কালী দেবী বল্‌তেন। সেই থেকে নাম হয়ে গেল শান্তিকালী। তিনি কালী দেবীর মতো মেয়েলী পোষাক ব্যবহার করতেন।

১৯৮০ সালের জুন মাসে ত্রিপুরাতে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। দাঙ্গা বেঁধেছিল ত্রিপুরী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে। ত্রিপুরাতে এত বেশী বাঙালীর আগমনকে সুনজরে দেখেনি কতিপয় ত্রিপুরী । সেই অসন্তোষের বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে থাকল কিছু-কিছু বিদেশী কুচক্র। ফলে অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ভয়াবহ রূপ নিল। ১৯৪৭ সাল থেকে বিগত পাঁচ দশক যাবৎ কম-বেশী মাত্রায় সাম্প্রদায়িক মন কষাকষি অবিরত ধারায় প্রবহমান। এরই পাশাপাশি পার্ব্বত্যপল্লীতে বিদেশী সংস্কৃতির স্রোত ফল্গুধারা থেকে প্রবল বন্যার স্রোতের রূপ নিল।

এই সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে শান্তি কালীর ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণ করলে তাঁর মর্ম্মমূলে পৌঁছা যাবে। কালবৈশাখীর বাতাসে গাছের শুকনা পাতা ঝরে পড়ে। নতুন পাতা গজায়। কিন্তু প্রবল ঝড়-তুফানে গাছ-গাছড়া উপরে পড়ে, ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে চুড়মার হয়। সামাজিক জীবনেও মাঝে-মধ্যে বিধ্বংসী ঝড়-তুফান কয়েকবার এসেছে, এখনও আসছে। এমন সংকট কালে কেউ থাকে অটল; কেউ স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সাথে তাল মিলিয়ে থাকতে নিরাপদ বোধ করে।

শান্তি কালী সাম্প্রদায়িকতার কন্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়ান নি এবং বিদেশাগত সাংস্কৃতিকপ্লাবনে গা ভাসান নি। তিনি ছিলেন বাহ্যতঃ কোমল, স্নিগ্ধ, আত্মভোলা, খোস মেজাজী; কিন্তু অন্তরে দৃঢ়চিত্ত, আপন বিশ্বাসে অবিচল, নিষ্পাপ, নিরহঙ্কার, নির্লোভি। তাঁর ভেতরে বিশুদ্ধ মূলধন এতবেশী ভরপুর ছিল বলেই, তিনি বল্‌তে পারতেন সেই আমি, সোহহম্, আমিই কালী।

এই মহামন্ত্র তাঁকে বৈরাগ্যের পথে নেয় নি; নিরাকার ব্রহ্মের পথে নেয় নি; কর্মহীন, সঙ্গহীন গুহাতে নেয় নি। এই মহাবিশ্বাস তাঁকে নিল কর্মের পথে, সেবার পথে ; যুক্ত করল অনেকের সাথে।

জাগতিক অর্থে তাঁর ভেতর লেখাপড়ার ঘাটতি ছিল। পুঁথিগত বিদ্যা নিতান্ত কম ছিল। মাত্র ষষ্ঠশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি সেই ঘাটতি পূরণ করেছিলেন সাধনার দ্বারা, সেবার দ্বারা, পূতঃচরিত্রবল দ্বারা। লেখাপড়া বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতা বাড়াতে পারে, হৃদয়বল বাড়াতে সব সময় পারে না। সাধনা ও জীবসেবা পারে হৃদয়বল বাড়াতে।

তাঁর সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ভারতের চিরায়ত পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সনাতন ধর্ম ও দর্শনে তাঁর বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে নবাগত বিদেশী হাওয়া ইহাকে উন্মূল করতে পারে নি। দেব-দ্বিজে তাঁর ভক্তি বিশ্বাস নিরাকার নয়, সাকার, ইহা প্রতিমাতে মূর্ত, দেবালয়ে স্থাপিত, নিত্য পূজিত, সমাজ সেবায় সক্রিয়, বাস্তবে আচরিত।

তাঁর বাড়ীতে, আশ্রমে, দেবালয়ে, ছাত্রাবাসে লেখা ছিল না "শুভ লাভ"। তিনি লাভ করতে আসেন নি, তিনি কারো লাভে ভাগ বসাতে আসেন নি। তিনি ছিলেন পরদুঃখ ভাগী। অনেক অনাথ, অভাবগ্রস্থ, নিরক্ষর বালক বালিকাকে তিনি আশ্রমিক পরিবেশে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করে থাকার-খাওয়ার পড়ার ব্যবস্থা করেছেন। এমন কয়েকটি স্থানের নাম হল মনুবাজার, মির্জা, করবুক, তইদু, চাচু বাজার, সাঁচিরামবাড়ী, চান্দুল, সোনামুড়া, বুরাখা, লংতরাইরাজা, বড় কাঠাল, দেবতাবাড়ী (জিরানীয়া)। জিরানীয়ার আশ্রমটি ১৪. ৪. ১৯৯৪খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এবং প্রধান কর্মকেন্দ্র। তিনি প্রয়োগবাদী ছিলেন।

মহারাজাদের শাসনকালে মহারাজাদের আদেশ- উপদেশ প্রায় সকল প্রজাই শুনত, মানত। মহারাজ বীর বিক্রম যত দিন জীবিত ছিলেন (১৯০৮-১০৪৭খৃঃ), তত দিন তাঁর কথাকে প্রজারা শিরোধার্য করে নিত। তিনিও প্রজাদিগকে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। ১৯৪৭ সালের পর, গণতান্ত্রিক শাসনকালে কোথায় সেই ব্যক্তিত্ব! এখন শুধু কলরব, কোলাহল, হলাহল, দলাদলি। এখন বিচ্ছিন্নতা বোধের বড়ই ছড়াছড়ি, বাড়াবাড়ি। সামাজিক বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হতে আর বিশেষ বাকি নেই। বাক্যবাগীশের দৌড়াদড়ি, ছড়াছড়িতে জীবন দুর্বিষহ।

মহারাজ ধন্য মানিক্য (১৪৯০-১৫১৫খৃঃ) ত্রিপুরার প্রশাসনে শান্তি-শৃঙ্খলা এনেছিলেন। বিজয় মাণিক্য (১৫২৮-১৫৬৩খৃঃ) দিগ্বিজয় করেছিলেন। গোবিন্দ মানিক্য (১৬৬৭-১৬৭২খৃঃ) দেবালয়ে পশুবলি কমাতে চেষ্টা করেছেন। বীর বিক্রম (১৯২৩-১৯৪৭খৃঃ) বুদ্ধিদীপ্ত শাসন দিয়েছেন। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার করে গেছেন। গুরুদেব শান্তিকালী কি দিয়েছেন, যে-জন্য ত্রিপুরাবাসী তাঁকে স্মরণে রাখবে?

তিনি দিয়েছেন সনাতন ধর্মের দীক্ষা, স্বদেশ প্রেমের শিক্ষা। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসূত

অজ্ঞেয়বাদের অনিশ্চয়তাতে ত্রিপুরাবাসীকে ফেলে দেন নি। তিনি আধুনিকতাপ্রসূত বাধাবন্ধন হীন নির্বান্ধবতাতে ঠেলে দেন নি। তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদে আন্দোলিত হতে উস্কানী দেন নি। তিনি স্বীয় সংস্কৃতিকে নির্মূল করতে যুক্তি দর্শান নি।

তিনি কান পেতে শুনেছিলেন ত্রিপুরাবাসীর হৃদয়ের কথা। সেই হৃদয়ের কথা হল বাউল সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, হরিনাম সংকীর্তন। এই সব গানে ত্রিপুরাবাসী মাতোয়ারা হয়। এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও আগরতলাতে, মান্দাইতে এবং আরো অন্য অনেক গ্রামে কীর্তন হয়, হরিসভা হয়। ইহা এক মহামিলনের সূত্র। এই মহামিলনের স্রোত যেন শুকিয়ে না যায়, হৃদয়ের দুয়ার যেন বন্ধ হয়ে না যায়, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বার্লিন-প্রাচীর গড়ার জন্য নয়, ভাঙ্গার জন্য তিনি শাবল হাতে নিয়েছিলেন। শুধু ভক্তি নয়, কেবল জ্ঞান নয়, নিছক কর্ম নয়, পরন্তু এই তিনের সমাহারের ও সমন্বয় সাধনের শিক্ষা তিনি নিজ আচরণের দ্বারা বুঝিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন প্রণালীতে ঋষির জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তেজ, গৃহীর কর্মপ্রেরণা নিহিত ছিল। তাই বার-বার আহত হয়েও, প্রতিহত হয়েও, প্রাণনাশের হুমকি পেয়েও হত-উদ্যম হন নি, পিছু টান দেন নি। তাঁর চিত্তে দুই ভূমির স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল-প্রথম ভূমি হল রক্ষণশীল সমাজ, দ্বিতীয় ভূমি হল নব্যদলের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা।

সক্রেটিস্ যে-দিন নিহত হলেন, সেদিন গ্রীক্‌জাতির আত্মাও নিহত হল। গুরুদেব শান্তিকালী যেদিন (২৭. ৮. ২০০০খৃ) আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন, সেদিন ত্রিপুরীজাতির আত্মাও নিহত হল কিনা ভবিষ্যৎ বল্‌তে পারবে। দুঃসহ ব্যথার অবসান হবে কিনা কে জানে! ❑

শ্রী প্রেমাঞ্জন দাস

পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অন্তর্গত কোনাবন নামক গ্রাম-নিবাসী শ্রীগোপাল চন্দ্র দেবনাথ ও শ্রীমতী যোগমায়া দেবী নামক দম্পতির অন্যতম পুত্র হলেন শ্রী প্রদীপ দেবনাথ। প্রদীপের জন্মতিথি হল আনুমানিক মঙ্গলবার, ৭ই ভাদ্র, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ। প্রদীপই উত্তরকালে শ্রী প্রেমাঞ্জন দাস নামে খ্যাত হন এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্ঘের ত্রিপুরা শাখাতে দায়িত্বপূর্ণ পদে ব্রত আছেন।

সমতল ত্রিপুরার কুমিল্লা ভূ-ভাগে মন্দভাগ নামক জনপদের অন্তর্গত দেউস নামক গ্রামে বংশানুক্রমে এই পরিবার বসবাস করে আসছেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজন জনিত রাষ্ট্র-বিপ্লবের অন্যতম শিকার হল এই পরিবার। বিতাড়িত হয়ে নিকটবর্তী পার্ব্বত্য ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিলেন অছিরাম দেবনাথ। অছিরামের পুত্র গোপাল। গোপালের পুত্র-কন্যারা হলেন দিলীপ, করুণাময়ী, প্রদীপ, দীপক, ঝর্ণা, বাসনা ও অপর্ণা।

প্রদীপের জন্ম হয়েছে ত্রিপুরাতে, কোনাবন গ্রামে, ভাদ্র মাসে। সিংহরাশিযুক্ত এই নবজাতক যৌবনে বৈরাগ্যভাবে ভাবিত হয়ে উঠবে বলে কুষ্ঠি নির্মাতা আচার্য ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। প্রদীপের শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন ত্রিপুরাতে অতিবাহিত হয়েছে। প্রদীপ আবল্য সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন।

প্রদীপ বরাবরই মেধাবী ছাত্র। পড়াশুনার প্রতি প্রদীপের আগ্রহ প্রচণ্ড। তাই একের পর এক, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে বিদ্যার্থী প্রদীপ। মাধ্যমিক (১৯৭৮ খ্রীঃ), উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৮০ খ্রী), দর্শনে সাম্মানিক স্নাতক (১৯৮৩ খ্রীঃ), স্নাতকোত্তর (১৯৮৬ খ্রীঃ) এবং গবেষণা (২০০০ খ্রীঃ) এতগুলো পরীক্ষায় প্রদীপ উত্তীর্ণ। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে গবেষণা করে প্রদীপ অতঃপর ডঃ প্রদীপ দেবনাথ নামে সম্মানিত।

প্রদীপের জন্ম এক বৈষ্ণব পরিবারে। আগরতলা নগর থেকে প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কোনাবন নামক গ্রাম ক্ষেত-খামার, চাষবাস, গরু-বাছুড় এবং কৃষক পরিবার নিয়ে গঠিত। এই গ্রামের প্রায় সকলেই পূর্ব বঙ্গ থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তু, হিন্দু বাঙ্গালী গৃহস্থ। বাস্তুচ্যুত হলেও গ্রামবাসীরা সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয় নি। ভাদ্র মাসে ধানের চারা রোপণের পর, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ — এই তিন মাস যাবৎ গ্রামবাসীরা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ কীর্তন করে। বৈষ্ণব সেবা দেয়। এমন পরিবেশে প্রদীপের বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রদীপের

পিতামহ ও পিতামহী এসবে নিজেরা অংশ নিতেন এবং নাতিকে সঙ্গে নিতেন। নাতি তাতে অংশ নিত মহানন্দে।

ছাত্র জীবনেই আশ্রমবাসী হয়ে পরমার্থের সন্ধান করতে প্রদীপ গৃহত্যাগ করে নানা রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। অবশেষে কলিকাতাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের প্রকাশিত পুস্তক পড়ার সুযোগ ঘটে। এই সংঘের আচার-বিচার পছন্দ হল প্রদীপের। স্নাতকোত্তর পরীক্ষা সমাপ্ত করে ঐ সংঘে যোগদান করল ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে। ১৯৮৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এই সংঘে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় আছে এই তরুণ সাধকের। কলিকাতা, বোম্বাই, মায়াপুর, মণিপুর, আগরতলা প্রভৃতি স্থানে সংঘের মঠ-মন্দির আছে। তাতে শিক্ষা-নবিশী হিসাবে কাজ করার দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এই সাধক। ১৯৮৬ সালের শেষভাগে প্রাপ্ত দীক্ষা প্রদীপের জীবনের এক বিশেষ ধাপ। দীক্ষান্তে নতুন নাম হল শ্রী প্রেমাঞ্জন দাস। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহের পুত্র রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ(৮-৮-১৯২৪ খ্রীঃ -) বিগত ১০-৯-১৯৮৬ দিনাঙ্কে প্রায় ৮ গণ্ডা ভূমি দান করেন এই সংঘকে।

এই সংঘের আচার-বিচার অনুযায়ী সাধক প্রেমাঞ্জন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বিগত ২৩-১১-১৯৮৮ দিনাঙ্কে। সহধর্মিনীর নাম রূপমঞ্জরী দেবী, ১৯৯০ সালে তাঁদের ঘরে জন্মে এক শিশু, শিশুর নাম রাখা হয়েছে দামোদর পণ্ডিত দাস। সাধনভজনের পাশাপাশি পড়াশুনা করা, গবেষণা করা, পুস্তক রচনা করা, পত্রিকা পরিচালনা করা হল শ্রী প্রেমাঞ্জন দাসের মুখ্য সখ। সমাজের সমস্যার প্রতি প্রেমাঞ্জন উদাসীন নন। অধঃপতন রুখতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁর চরিত্রে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় দেখা যায়। এই কর্মযজ্ঞে দুজন সহকর্মীর নাম তিনি বিশেষ ভাবে বললেন, তাঁরা হলেন শ্রী ব্রজবিহারী দাস এবং শ্রী বলরাম দাস। উভয়েই নিষ্ঠাবান, ভক্তিবান সাধক। ❑

শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজ

পূর্ব বঙ্গে, সমতল চট্টগ্রামে, আনোয়ারা থানাধীন সিংহরা নামক গ্রামনিবাসী অতুলচন্দ্র বিশ্বাস ও কর্ণবালা বিশ্বাস নামক দম্পতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন অন্যতম শিশু, যিনি উত্তর কালে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজ বলে ত্রিপুরাতে খ্যাতি লাভ করেন।

অতুল চন্দ্র বিশ্বাস ও কর্ণবালা বিশ্বাস হলেন গ্রামনিবাসী সাধারণ গৃহস্থ এবং সরল হৃদয় ধর্মপ্রাণ দম্পতি। তাঁরা পাঁচ পুত্রের পিতা- মাতা । পুত্রদের নাম হল যথাক্রমে দুলাল, বাদল, মিলন, ধনঞ্জয় এবং রণধীর। চতুর্থ পুত্র ধনঞ্জয় গৃহী হন নি। তিনিই পরবর্ত্তীকালে স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি নামে পরিচিত হন। তাঁর জন্মদিন হ'ল আনুমানিক ১৪ ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ৩০.১১.১৯৬২খৃঃ। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। একই তিথিতে গুরু নানক(১৪৬৯-১৫৩৯খৃঃ) ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বালক ধনঞ্জয় এর শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে জন্মভূমি সিংহরা গ্রামে। গ্রাম্য পাঠশালাতে পড়াশুনা করেছেন। খুব সম্ভবতঃ ১৯৮১ সালে তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং ১৯৮৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর আর জাগতিক বিষয় নিয়ে মহাবিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন নি।

বাল্যকালেই ধনঞ্জয়-এর মনে আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ লক্ষ্য করা গেছে। কিশোর বয়স থেকেই পূজা-পার্বণের কাজে মাতৃদেবীকে সহায়তা করতেন। পাড়াতে যেখানে গান-বাজনা হত, ভজন-কীর্তন হত, হরিসভা বসত সেখানেই তিনি ছুটে যেতেন। তাতে পেতেন অনাবিল আনন্দ । কিশোর বয়সেই তাঁর সহজ সরল, আত্মভোলা স্বভাব প্রকাশ পেল। এজন্য পাড়া-প্রতিবেশীরা আদর করত। তিনি যখন ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্র, তখন সিংহরা গ্রামে নেপাল চন্দ্র দত্তের বাড়ীতে পদার্পণ করেন পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ স্বামী জ্যোতিশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ। তঁর শান্ত-সৌম্য মূর্তি দর্শনে বালকের খুব ভাল লাগল। মাকে সেকথা বল্লেন এবং দীক্ষা নেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। স্নেহশীলা মাতা দিলেন অনুমতি। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে দীক্ষা পেলেন। এরপর মাতৃদেবী একখানা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পুত্রকে দিলেন।

দীক্ষান্তে নিজের দেহ-মনে এক নতুন প্রেরণা উপলব্ধি করলেন তরুণ শিষ্য। সেই থেকে রোজ খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে, স্নানসন্ধ্যা করেন, ফুল তোলেন, গীতা পাঠ করেন। সেই যে নিরামিষ আহার ধরেছেন, তা অব্যাহত রেখেছেন। সাধন-ভজনের

পাশাপাশি লেখাপড়া চল্‌ল। এবং দুটি পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হলেন। ১৯৮৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর, গুরুর আদেশ হল ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে, সাব্রুমে, জলেফা নামক গ্রামে স্থাপিত শংকর মঠে আসতে। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে যুবক শিষ্য এলেন জলেফাতে। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯১খৃঃ পর্যন্ত আট বৎসর থাকেন শংকর মঠ, জলেফাতে। তখন তিনি ব্রহ্মচারী। এই আট বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে মঠকে সুসজ্জিত করেছেন, জনমানসে পরিচিতি দিয়েছেন। এই সময়ে তিনি দুঃস্থ ছাত্রদের পড়াতেন বিনা শুল্কে। ১৯৮৬তে তিনি উত্তর ভারতের অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্র দর্শন করেছেন। ১৯৮৭ তে বিলোনীয়ার উত্তর পশ্চিমে পশ্চিম পাহাড়ে শ্রীরামপুর গ্রামে বন জঙ্গল কেটে নতুন আশ্রম স্থাপন করেছেন।

গুরুর নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এতদিনে। গুরু অন্তঃদৃষ্টিতে দিনের পর দিন, কাজের পর কাজ দিয়ে, পরীক্ষা করেন শিষ্যকে। ব্রহ্মচর্য থেকে সন্ন্যাস পেতে হলে পরোক্ষ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তরুণ শিষ্য। ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৯৯১ খৃঃ) সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা পান। সেদিন মোট চারজন দীক্ষা পান। বয়স অনুসারে, তাঁদের নাম হল শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ গিরি মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী রবীশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী তপনানন্দ গিরি মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজ। দীক্ষাস্থল হল বাংলাদেশের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে, সতীতীর্থ সীতাকুন্ডে। সন্ন্যাস গুরু হলেন পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ স্বামী জ্যোতিশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ।

অতঃপর বৃহত্তর ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন শুদ্ধানন্দ মহারাজ। দায়িত্ব স্থল ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা। ১৩৯১ বঙ্গাব্দের ২৮শে আশ্বিন (১৯৮৪ খৃঃ) আগরতলা নগরের পশ্চিম প্রান্তে জয়নগর গ্রামে শংকর মঠ ও মিশন স্থাপন করে গেছেন শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতিশ্বরানন্দ মহারাজ। তাঁরই শিষ্যা মোক্ষদাসুন্দরী বণিক- একখণ্ড সমতল ভূমি দান করেছিলেন। অমরেন্দ্র, নির্মল ও নিখিল বণিক-এর মাতৃদেবী মোক্ষদাসুন্দরী এই ভূমি দান করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেলেন। দান করা ভূমির পরিমাণ চার গন্ডা, এক ধূর।

১৯৯১ খৃষ্টাব্দ থেকে এক দশকের অধিককাল যাবৎ শুদ্ধানন্দ মহারাজ আগরতলার জয়নগরে শংকর মঠের অধ্যক্ষ রূপে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, আশ্রমের কর্মকান্ড বেড়েছে। আশ্রমটির অবস্থান হল আগরতলা নগরের এক কোণে, গলিতে, খালের পাশে এবং ক্ষুদ্র পরিসরে। শুদ্ধানন্দ মহারাজ দক্ষিণ প্রান্তে পাকা দালান কোঠা নির্মাণ করালেন। ভক্তদের ও শিষ্যদের কাছ থেকে তিলে-তিলে ধন সংগ্রহ করে এই ব্যয়সাধ্য কাজ সমাধা করেছেন। শুধু তাই নয়, ২০০০ সালে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করেছেন। ২০০১ সালে প্রাক্‌প্রাথমিক বিদ্যালয়

স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ও বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। অধিকন্তু প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে বাৎসরিক উৎসব পালন করা হয়। দেবী পাল নাম্নী বৃদ্ধা শিষ্যা এই আশ্রমে থাকেন। লালুচন্দ্র দে নামক ছাত্র এই আশ্রমে থেকে- খেয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। পটুরানী ও দেবী পাল সম্পর্কে বোন। তাঁদের প্রাক্তন বাড়ী চট্টগ্রাম, পরবর্তী বাড়ী মুহুরীপুরে। উভয়েই বিবাহিতা ; পরে আশ্রমবাসিনী হন । ১৯৯৮ তে পটুরানী মারা যান। পটুরানীকে লোকে ভক্তি মা বলে সম্বোধন করত। দেবীপালের আশ্রমিক নাম হল সেবানন্দময়ী।

এই আশ্রম চলে কিসের জোরে? আয়ের উৎস কি কি? আগরতলাতে শংকর মঠের শত—শত শিষ্য নাই । স্বরচিত শত-শত পুস্তক নাই। বিদেশী ভক্তদের দান-দক্ষিণা নাই। আগরতলা নগরের বাইরে কোন ক্ষেত-খামার নাই। বিত্তালয়ে স্থায়ী আমানত নাই। আগরতলার আশ্রমটির আয় অনিশ্চিত ও নিতান্ত নগন্য। এই যৎসামান্য যে-আয় তা মুখ্যতঃ ত্রিবিধঃ- কতিপয় শিষ্যের মাসিক দান। মুষ্টি ভিক্ষা এবং গীতাপাঠের প্রণামী। শুদ্ধানন্দজী গীতা পাঠ করে আনন্দ পান । গীতা পাঠ করতে তাঁকে আমন্ত্রণ করে নেয় ভক্ত ও শিষ্যরা।

শুদ্ধানন্দ মহারাজের গুরু-পরম্পরার পরিচয় কি? তিনি কোন্ পথের পথিক? তাঁদের উপাস্য দেবতা হলেন স্বয়ং নারায়ণ। দক্ষিণ ভারতে, কেরলে ভূমিষ্ঠ হন আদি শংকরাচার্য। তিনি এই পথের শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। তাঁর চার জন প্রখ্যাত শিষ্য হলেনঃ-পদ্মপাদ, হস্তামলক, মন্ডন এবং তোটক। এই চার জনের দশ জন প্রখ্যাত শিষ্য হলেনঃ-অরণ্য, আশ্রম, গিরি, তীর্থ, পর্বত, পুরী, বন, ভারতী, সরস্বতী ও সাগর। তাঁদের বলা হয় দশনামী সন্ন্যাসী।

শুদ্ধানন্দের স্থানীয় গুরুরা হলেন গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই চট্টগ্রামে আবির্ভূত হয়েছেন। এখা নে মাত্র পাঁচ প্রজন্মের পরিচয় পাওয়া গেছে, প্রথম হলেন স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ। দ্বিতীয় হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ। তৃতীয় হলেন স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজ, চতুর্থ হলেন স্বামী জ্যোতিশ্বরানন্দ মহারাজ। পঞ্চম হলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ প্রমুখ চারজন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আয়ুস্কাল হল ১২৬৭-১৩৩২ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৮৬০-১৯২৫ খৃঃ।

গৈড়লা গ্রাম নিবাসী সত্যানন্দ মহারাজ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সূর্য সেনের গুরুদেব। ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পূর্ব নাম ছিল নবীনকুমার বৈদ্য। ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে শিষ্য স্বরূপানন্দ সীতাকুন্ডে আশ্রম স্থাপন করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। স্বরূপানন্দের শিষ্য জ্যোতিশ্বরানন্দ মহারাজ শংকর মঠ কে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যান। একাধিক দেশে

শংকর মঠ স্থাপন করেন, ছাত্রাবাস, দেবালয়, বিদ্যালয় ইত্যাদি সেবাপ্রকল্প চালু করেন জ্যোতিশ্বরানন্দ মহারাজ।

শুদ্ধানন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি রূপ? তাঁর দুর্বলতা কোথায়? তাঁর সবলতা কোথায়? শুদ্ধানন্দ মহারাজ সুপুরুষ নন, সুপন্ডিত নন, সুবক্তা নন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সম্মোহনী শক্তি নাই। তিনি সন্ন্যাসী বটে, তবে গুহাবাসী, বৃক্ষতলবাসী,সর্বত্যাগী, পবন আহারী নন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি- এই ত্রিবিধ ধারাই তাঁর মধ্যে আছে, তবে ক্ষীণ ধারায়। তিনি বাক্‌সিদ্ধ নন। তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞার প্রখরতা নাই, বুদ্ধির দীপ্তি নাই। কিন্তু প্রত্যন্তরবাসী সুলভ, গ্রামবাসী সুলভ আত্মবিশ্বাস, কষ্টসহিষ্ণুতা, গুরুতে নিষ্ঠা, দেবদ্বিজে ভক্তি তাঁর মধ্যে অটুট আছে। তাঁর আচার-আচরণে ঋজুতা আছে, জটিলতা-কুটিলতা নাই। তিনি যা নন, তাঁর চাইতে অধিক ও মহান বলে জাহির করার কৃত্রিম প্রবণতা তাঁর মধ্যে নাই। যে ব্রতে তিনি ব্রতী, সেটাকে চরম স্তরে উন্নীত করার জন্য মরিয়া হয়ে দিনরাত কাজ করার ও প্রতিপক্ষকে সমুচিৎ শিক্ষা দেবার মত দৃঢ়চিত্ততা তাঁর মধ্যে নাই। তাই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে তিনি মানিয়ে, টিকে থাকতে পারেন, এবং প্রতিপক্ষ তাঁকে প্রবল শত্রু বলে গণ্য করে না। তিনি দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক না হতে পারেন, কিন্তু মিত্র হতে পারেন। অমায়িক স্বভাব ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা তাঁর বিশেষ দিক্। তাই সহজেই কেউ তাঁর কাছে আসতে পারে। ❑

ব্রহ্মচারী প্রণব চৈতন্য

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা নগর-এর দক্ষিণ প্রান্তে বড়দোয়ালী নামক গ্রামে ১৩৭০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (৫.১০.১৯৬৩ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন শ্রী প্রশান্ত কুমার দে। উত্তরকালে তিনিই শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণু পুরীজি মহারাজের শিষ্য হয়ে ব্রহ্মচারী প্রণব চৈতন্য নামে খ্যাত হন। তাঁহার পিতা-মাতার নাম রামমনি দে ও সন্ধ্যা দে।

রামমনি দে ও সন্ধ্যা দে দম্পতির পুত্র-কন্যার সংখ্যা হল ৬ জন। তাদের নাম হল যথাক্রমে-শিপ্রা, প্রশান্ত, রুনু, কপিল, হৃষিকেশ এবং দামোদর। তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান প্রশান্ত হলেন পরবর্ত্তী জীবনে ব্রহ্মচারী প্রণব চৈতন্য নামে খ্যাত। প্রশান্তের শৈশব,বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয় আগরতলা নগরে। উমাকান্ত বিদ্যালয় এবং মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখার ছাত্র ছিলেন প্রশান্ত। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন, কিন্তু স্নাতক হবার আগেই ভিন্ন পথ ধরেন। ১৭ বৎসর বয়স (১৯৬৩-১৯৮০খৃঃ)পর্যন্ত প্রশান্ত আগরতলাতে পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের পরিবেশে থাকেন।

সৎগুরুর সন্ধানে প্রশান্তকে অন্ধকারে হাতড়াতে হয় নি, ভুল পথে ঘুরপাক্ খেতে হয় নি। পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণু পুরীজি মহারাজের শিষ্য। ফলে পারিবারিক পরিবেশে পূর্ব্বেই সঠিক দিশা- নির্দ্দেশ প্রস্তুত ছিল। ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে পিতৃালয় থেকে বেরিয়ে যান, অজানার উদ্দেশ্যে নয়, অচেনা পথে নয়; সোজা বিষ্ণু পুরীজির আশ্রমে। নিষ্ঠাবান ভক্ত ও শিষ্য পেয়ে বিষ্ণুপুরীজি দীক্ষা দেন এবং কাশীধামে সংস্কৃত, বেদ, বেদান্ত ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। দশ বৎসর (১৯৮১-১৯৯০খৃঃ) চল্‌ল শাস্ত্র পাঠ। ন্যায় শাস্ত্রী, বেদান্ত-আচার্য ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হলেন; এতে আত্ম প্রত্যয় হল দৃঢ়। পাশাপাশি চল্‌ল সারা ভারতের প্রধান-প্রধান তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ। শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুপুরীজি হলেন আচার্য শংকর পন্থী এবং দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। বিষ্ণুপুরীজি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এবং বিদেশে নানা স্থানে শিষ্যদের আমন্ত্রণে যান ও সাথে নিনে যান স্নেহাস্পদ প্রণবচৈতন্য ব্রহ্মচারীকে। ১৯৮৯, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদেশে (বৃটেন, কানাডা) ভ্রমণ করেছেন এবং তথায় প্রবচন দিয়ে এসেছেন।

১৯৬০খৃঃ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুপুরীজি অন্ততঃ দশটি আশ্রম স্থাপন করেছেন ভারতের নানা প্রদেশে, যেমন - ত্রিপুরায় , অসমে, পশ্চিম বঙ্গে,

উত্তর প্রদেশে। তিনি এই ধরাধামে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়েছেন। অক্লান্ত শ্রমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার হয়েছে। তাই তিনি ৭৭ বৎসর বয়সে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে শিষ্য প্রণব চৈতন্য ব্রহ্মচারীকে পরবর্তী মঠাধ্যক্ষ পদে মনোনীত করেছেন। ❑

শ্রী সনন্দনদাস ব্রহ্মচারী

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা নগর-এর অন্তর্গত কৃষ্ণনগর নামক সমৃদ্ধ জনপদের বাসিন্দা সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী ও শোভারানী চক্রবর্তী নামক দম্পতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এক সুসন্তান, যাঁর পিতৃদত্ত নাম হল শ্রী স্বপন চক্রবর্ত্তী। স্বপনের আশ্রমিক নাম হল শ্রীসনন্দনদাস ব্রহ্মচারী। স্বপনের জন্মতিথি হল আনুমানিক মাঘ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, বা ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ।

পিতা সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী (আঃ ১৯২০-১৯৮৬খৃঃ) ছিলেন সমতল ত্রিপুরার চান্দপুর নিবাসী। ১৯৪৭ সালের ঘটনাবলীতে বাধ্য হয়ে তিনি পার্বত্য ত্রিপুরাতে আশ্রয় নেন। তিনি ছিলেন ছয় জন পুত্র-কন্যার পিতা। পুত্র-কন্যাদের নাম হল যথাক্রমে-কল্পনা সুভাষ, সুজিৎ, অপর্ণা, স্বপন এবং ঝর্ণা। উদ্বাস্তু পরিবারের কর্তা হিসাবে, তাঁকে কঠোর শ্রম করতে হয়েছে, তাই তিনি দীর্ঘজীবি হন নি। শোভারানীর উপর পুত্র -কন্যাদের লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়ে সুধীরবাবু লোকান্তরিত হন।

স্বপনের শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন আগরতলাতে অতিবাহিত হয়েছে। স্বপন ১৯৭৯খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর স্থানীয় রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন; কিন্তু তখন পিতৃদেব হলেন রোগাক্রান্ত। তাই ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্যক্তিগত পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিয়ে স্নাতক হলেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত স্নাতক হলেন স্বপন।

১৯৮৮ থেকে ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পিতৃহারা যুবক স্বপন অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যবসাতে লেগে গেলেন। মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে পাইকারী দরে আপেল, আঙুর ইত্যাদি কিনে এনে কামান চৌমুহনীতে বিক্রয় করতেন। সৎপথে থেকেই অর্থ উপার্জন করেছেন এবং উপার্জিত অর্থ মায়ের হাতে তুলে দিতেন প্রত্যহ। এই ভাবে ছয় বৎসর অতিক্রম হল। অভাব তাঁর স্বভাবকে নষ্ট করতে পারে নি।

এই ছয় বৎসর (১৯৮৮-১৯৯৪খৃঃ) শুধু ফল বিক্রয় করেন নি। অবসর সময়ে, ছুটির দিনে বিভিন্ন আশ্রমে যাতায়াত করেছেন। মনে মনে তুলনা করেছেন বিভিন্ন আশ্রমের পরিবেশের মধ্যে। স্বপনের ভাল লাগল শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-এর পরিবেশ।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে অর্থাৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে স্বপন চলে এলেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে। সেই শুভ দিন হল রথযাত্রার পুণ্য তিথি। সেই শুভ

তিথিতেই তিনি হরিনাম জপ করার কৃপা পেলেন। পরে বিখ্যাত নবদ্বীপ ধামে পেলেন দীক্ষা। তাঁর দীক্ষাগুরু হলেন শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ (১৯২৪খৃঃ-)। দীক্ষান্তে নাম হল শ্রীসনন্দন দাস ব্রহ্মচারী।

দীক্ষান্তে নানা তীর্থ দর্শন করে, শ্রী সনন্দনদাস ব্রহ্মচারী আগরতলাতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। মঠে নানা প্রকার দায়িত্ব পালন করতে হয়। এত বড় মঠ পরিচালনার জন্য ভক্তদের কাছে আনুকূল্য সংগ্রহার্থে যেতে হয়। ব্যক্তিগত ভজন-পূজন চালালেই চলবে না, পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং মঠের প্রতি সেবা পালন করতে হয়। মঠের হিসাব রক্ষা, আনুকূল্য সংগ্রহ, পূজা-আরতি, প্রভৃতি কাজ করেন সনন্দনদাস ব্রহ্মচারী। মঠ রক্ষক যখন যে কাজের জন্য নির্দেশ দেন, সে কাজ আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত পালন করেন শ্রী সনন্দনদাস ব্রহ্মচারী। ❑

শ্রী রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

অসম প্রদেশে, বরাক নদীর উপত্যকায়, শিলচর নগরে শ্রী কুমুদচন্দ্র দাস এবং শ্রীমতী ফুলরানী দাস নামক দম্পতির পুত্র রূপে ভূমিষ্ঠ হন এক শিশু, যাঁর পিতৃদত্ত নাম হল সঞ্জিৎ। এই বালক উত্তর কালে শ্রী রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন। তাঁর জন্মসন হল ১৩৭০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ।

পিতা কুমুদচন্দ্রের পূর্ব নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলাতে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই শ্রীহট্টে জনমত যাচাই হল। উদ্দেশ্য শ্রীহট্টের ভাগ্য নিদ্ধারণ । কার্যতঃ তাহা জোর যার মুলুক তার নীতিতে পাকিস্থান ভুক্ত হল। তাই অন্য অনেকের মতই কুমুদচন্দ্র দেশত্যাগী হলেন। বাস্তুচ্যুত কুমুদ চন্দ্র শিলচরে এসে কোন মতে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি দুই পুত্রের পিতা। পুত্রদের নাম হল স্বপন ও সঞ্জিৎ।

সঞ্জিতের শৈশব, বাল্য, কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে শিলচরে। শিলচর থেকেই ১৯৮৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন; কিন্তু পার্থিব জগতের পড়াশুনা ভাল না লাগায় ছেড়ে দিলেন।

অন্তর্বর্তী চার বৎসর (১৯৮২-১৯৮৫খৃঃ)বাড়ীতে থেকেই গৃহ শিক্ষকতা করেছেন, টাইপ শিখেছেন, আর বিভিন্ন আশ্রমে, মঠে-মন্দিরে যাতায়াত করেছেন। কোথায়, কোন্ আশ্রমে গেলে মনের সাথে মিল হয়, সেটাই ভাবতে থাকেন। শিলচরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃতসঙ্ঘের শিষ্য-ভক্ত রয়েছে । তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা হল। শিলচর নিবাসী শিষ্য হিরণ্যগর্ভ দাস পুরোণো ও অভিজ্ঞ কার্যকর্তা হয়েছেন। তিনি ত্রিপুরাতে এসেছেন এবং আগরতলার উত্তরে তালতলা নামক গ্রামে স্থাপিত কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্ঘের বিদ্যালয়ে কাজ করছিলেন।

১৯৮৬ সালে তরুণ ভক্ত সঞ্জিৎ আমন্ত্রণ পেলেন ত্রিপুরার তালতলাতে কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের বিদ্যালয়ে কাজ করার। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯খৃঃ পর্যন্ত চার বৎসর সঞ্জিৎ কাজ করেছেন কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্ঘের ত্রিপুরা শাখাতে। কখনো তালতলাতে, কখনো আগরতলাতে, কখনো দক্ষিণে উদয়পুরে। উদয়পুরের অভিজ্ঞতা সঞ্জিতের কোমল মনে প্রীতিকর বোধ হয় নি।

১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ ১৩৯৭বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, শুভ অক্ষয় তৃতীয়াতে সঞ্জিৎ আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে যোগদান করেন। এখানেই তিনি

প্রথমে হরিনাম প্রাপ্ত হন, এবং পরে ১৪০০বঙ্গাব্দের রথযাত্রা তীথিতে দীক্ষা পান। দীক্ষান্তে নাম হল শ্রী সৎপ্রসঙ্গানন্দ দাস ব্রহ্মচারী। কিন্তু তিনি রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী নামেই পরিচিত।

বিগত ১৮ই জানুয়ারী ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে একটি গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ। আগরতলা নিবাসী হীরালাল বণিক-এর পুত্ররা গ্রন্থাগারের জন্য একটি পাকা বাড়ী নির্মাণ করে দেন। সেই গ্রন্থাগারে ধর্মগ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে। পড়াশুনার পরিবেশ অতি চমৎকার। সেই গ্রন্থাগার দেখাশুনা করার আংশিক দায়িত্ব পালন করেন শ্রী রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

বিগত ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধন করা হল। চিকিৎসালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পাকা বাড়ী নির্মাণ করে দেন ডাঃ উষারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পত্নী সুষমা গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন উষারঞ্জন বাবু। সেই চিকিৎসালয়ের কাজ দেখাশুনা করেন শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। এ জন্য হোমিও চিকিৎসাবিদ্যা পড়াশুনা করছেন এবং ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারীতে পরীক্ষা দিয়েছেন। ডাঃ ইন্দুভুষণ সরকার মহাশয়ের প্রেরণায় রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী হোমিওপাথি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে শুরু করেছেন।

শ্রী রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ছোট খাট গড়নের, শ্যামলা বর্ণের এবং অত্যন্ত বিনম্র স্বভাবের। নিজে দায়িত্ব নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় দেহবল, মনোবল, অর্থবল ও সাধনবলের অভাব আছে তাঁর স্বভাবে-চরিত্রে। কিন্তু কারো ছত্রছায়ায় কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় আনুগত্যবোধ, শালীনতা, ব্যবহারিক মাধুর্য তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান আছে। ❑

শ্রী দারিদ্র্যভঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা নগর-এর প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে জারুলবাচাই নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের বাসিন্দা অমরচান্দ সরকার ও শ্রীমতী যশোদা সরকার নামক দম্পতির অন্যতম পুত্র শ্রী দুলাল সরকার উত্তরকালে শ্রী দারিদ্র্যভঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন। দুলাল ভূমিষ্ট হন সম্ভবতঃ ১৩৭১ বাংলার পৌষ মাসে অর্থাৎ ২৭.১২.১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে।

ত্রিপুরা রাজ সরকারের অধীনে চাকুরী করার দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে এই পরিবারের। কয়েকপুরুষ পূর্ব থেকেই আগরতলার উপকণ্ঠে উত্তর-পশ্চিম কোণে এক গ্রামে বাস করতেন রামধন সরকার। রামধন ছিলেন রাজকর্মচারী। তাঁর পুত্র মুরারীমোহন ত্রিপুরার রাজকর্মচারী ছিলেন। মুরারীমোহনের পুত্র অমরচান্দ কাজ করতেন ভারতীয় বিমান সেবা বিভাগের ত্রিপুরা রাজ্য শাখাতে। অমরচান্দের পুত্র দুলাল ভারতীয় বিমান সেবা বিভাগে কিছুদিন কাজ করেছেন।

অমরচান্দ (আঃ ১৯২৩-১৯৭৯খৃঃ) এবং যশোদারানী হলেন সাত জন পুত্র-কন্যার পিতা-মাতা। পুত্র-কন্যাদের নাম হল যথাক্রমে- পরিমল,বিমল,শ্যামল, দুলাল, দিলীপ, চম্পারানী ও সঞ্জিৎ। পিতা অমর চান্দ মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে হঠাৎ পাহাড়ী জ্বরে মারা যান। মাতা যশোদারানী পুত্র-কন্যাদের লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হলেন। পরের বৎসর ১৯৮০ সালের জুন মাসে লাগল ভয়াবহ দাঙ্গা । জারুলবাচাইতে বসবাসকারী বাঙালী হিন্দু পরিবারগুলো হল আতঙ্কগ্রস্থ।

দুলালের শৈশব, বাল্য, কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে জারুলবাচাই গ্রামে। তের বৎসর বয়সে দুলাল পিতৃহারা হন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে গৃহ হারা হন। গ্রামের পাঠশালা নাই। কয়েক ক্রোশ হেঁটে যেতে হত অন্যগ্রামের পাঠশালাতে। এসব কারণে মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হল। পড়াশুনার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল বালক দুলালের।

অর্থ উপার্জনের জন্য দুলাল দুই স্থানে চাকুরী করেছেন। প্রথমে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীতে ১৯৮৩-৮৪ সালে, এবং পরে ভারতীয় বিমান সেবা বিভাগে ১৯৮৫ সালে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীতে গিয়ে দেখেন প্রায় সব সময় অপরাধী, চোরাই চালানকারী, পাচারকারী, চোর-ডাকাত- এদের নিয়ে যুজতে হয়। কাজের এই পরিবেশ মোটেই ভাল লাগল না দুলালের। সেটা ছেড়ে দিয়ে পিতার সুবাদে ভারতীয় বিমান সেবা বিভাগে গিয়ে

কাজ পেলেন। এখানকার পরিবেশ অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু কাজের চাপ বড় বেশী, বাড়ী থেকে ছুটতে হত প্রায়ই। সে-কাজ ছাড়লেন, মাত্র সাত মাস কাজ করার পর। অতঃপর কিছুকাল অটোরিক্সা চালাতে থাকেন। ইহা ১৯৮৬ সালের ঘটনা।

১৯৮৭ সালে দুলালের জীবনে এল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা নামক একখানি ছোট পুস্তক পড়ার সুযোগ হল। সেই বই পড়ে সুপ্ত বিবেক-বৈরাগ্য জেগে উঠল। মনের ভেতর আলোড়ন শুরু হল। সাংসারিক কাজকর্ম আর ভাল লাগে না। কয়েকটি আশ্রম বাহির থেকে দেখে, অবশেষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মনোরম পরিবেশ খুব ভাল লাগল; দুলালকে হাতছানি দিচ্ছিল। মঠের সিংহদরজাতে বসে জনৈক বৃদ্ধ ভক্ত হরিনাম জপ করছিলেন। দুলাল সেই সাধকের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করলেন। সাধকের স্নেহমাখা আগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ দুলালের মনে অভয় ও আশ্বাস এনে দিল। দুলাল মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মঠাধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মঠাধ্যক্ষের সহৃদয় ব্যবহার দুলালকে মুগ্ধ করল। মঠাধ্যক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী পক্ষকাল ব্যাপী পাঠ-কীর্তন শুনতে থাকেন। মনের সাথে মিল হলে তবেই যেন আশ্রমে আসেন -এই হল মঠাধ্যক্ষের কথা। কোন প্রলোভন, প্রতারণা, প্রচার দ্বারা কাউকে আশ্রমবাসী করতে মঠাধ্যক্ষ নারাজ। পক্ষকাল যাবৎ পাঠ-কীর্তন শুনলেন। ইহা ১৩৯৪ বাংলার আষাঢ় মাসের ঘটনা। সামনেই জগন্নাথের স্নান যাত্রা। শুভদিন। সেইদিন গৃহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত হল। মাতৃদেবীকে প্রণাম করে, ভাই-বোনদিগের অনুমতি নিয়ে দুলাল পিতৃগৃহ ছাড়লেন।

ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কৃপা করে দীক্ষা দিলেন দুলালকে। দীক্ষান্তে নতুন নামকরণ হল দারিদ্র্যভঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী। দারিদ্র্যভঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ; গায়ের রঙ শ্যামলা। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের জন্য আনুকূল্য সংগ্রহ এবং পাঠাগার সংরক্ষণ - এই সব দায়িত্ব পালন করেন এই ব্রহ্মচারী। তাঁর সহযোগী হলেন শ্রী রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। দারিদ্র্যভঞ্জনদাসের ভেতর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা আছে, কর্মক্ষমতা আছে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করার প্রবল আগ্রহ আছে; আধুনিক মুদ্রণ বিদ্যা আয়ত্ত করার দক্ষতা আছে। ❑

শ্রী তন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তে বিলোনীয়া নামক মহকুমা অবস্থিত। বিলোনীয়ার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত নলুয়া নামক গ্রামের বাসিন্দা শ্রী ধনঞ্জয় সরকার -এর পুত্র হলেন শ্রীতপন সরকার, যিনি উত্তর কালে শ্রীতন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন। তপনের জন্মসন হল আনুমানিক ২২ পৌষ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ বা ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ।

শ্রী ধনঞ্জয় সরকারের প্রাক্তন নিবাস ছিল নিকটবর্তী নোয়াখালীতে। ভারত বিভাজন জনিত রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি দেশত্যাগী হয়ে নলুয়াতে আশ্রয় নেন। ঋষ্যমুখ জনপদের অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে ঘর-জামাই হয়ে আসেন রমেশ চন্দ্র পাল। রমেশ পালের কন্যা জ্যোৎস্না হলেন ধনঞ্জয়ের স্ত্রী ।এই দম্পতির ৫ জন পুত্র-কন্যা ।তাদের নাম হল যথাক্রমে তপন, স্বপন, নমিতা, অনিতা এবং প্রণব। শ্রী ধনঞ্জয় সরকার হলেন ত্রিপুরা সরকারের অধীন কর্মচারী ;ভূমিরাজস্ব বিভাগে চাকুরীর সূত্রে তিনি উদয়পুরে কয়েক বৎসর থাকেন এবং ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরের দক্ষিণ পাশে থাকার একটি ছোট বাড়ী ক্রয় করে নেন।

তপনের শৈশব এবং বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে নলুয়াতে। কিন্তু কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছে উদয়পুরে। ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে তপন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন উদয়পুর থেকেই। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন, কিন্তু পাঠ সমাপ্ত রেখে চলে যান যতনবাড়ীস্থিত কারিগরী বিদ্যালয়ে কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা করতে।১৯৮৬ সালে কারিগরী বিদ্যা সমাপ্ত করেন আর অধিক বিষয়করী বিদ্যা অর্জ্জন ভাল লাগল না।

শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ গোস্বামী মহারাজ ত্রিপুরারই আরেক সুসন্তান। তিনি উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের এক ক্রোশ দক্ষিণে- পূর্ব্বে এক পল্লীতে একটি আশ্রম স্থাপন করেছেন। তিনি বৈষ্ণর মতে সাধন-ভজন করেন। তাঁর কাছ থেকে বালক তপন নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন নাম জপ করার অধিকার প্রাপ্ত হন। গুরু কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন লক্ষবার নাম জপ করে নিতে পারলে প্রতিদিন তবে উত্তম হয়। সেই কথা বালকের মনে সাড়া জাগিয়েছিল।

১৯৮৬ সাল এই তরুণ তাপসের জীবনে বিশেষ স্মরণীয় বৎসর ।স্বামী পরমানন্দের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করা হলে পর, তিনি উপদেশ দিলেন তীর্থ ভ্রমণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ও মনের সাথে বোঝাপড়া করতে। ত্রিকালদর্শী গুরুর উপদেশ শিরোধার্য করে এবং পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে বেড়িয়ে পড়বেন। তাই হিতাকাঙ্ক্ষীদের নিমন্ত্রণ

করে ভোজ দিলেন; সারাদিন কীর্ত্তন করা হল। তখন ছিল শরৎকাল । সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময় গভীর রাত্রে তপন এক কাপড়ে নীরবে গৃহত্যাগ করলেন। হাঁটতে- হাঁটতে এলেন ত্রিপুরাসুন্দরী মাতার বাড়ীর সামনে। তখন রাত্র প্রায় তিনটা।

১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল। রাত তিনটা নাগাদ এই বালক রাজপথে একা দণ্ডায়মান। এমন সময় দক্ষিণ দিক্ থেকে একটি লরি এসে দাঁড়াল বালকের সামনে। বালককে গাড়ীতে তুলে নিল; পথে কথাবার্তা হল; পথে খেতে দিল গাড়ী চালক । গাড়ী যাবে গৌহাটীতে বালককে গৌহাটীতে নামিয়ে দিয়ে, অধিকন্তু ৫০্ টাকা হাতে দিয়ে কামাখ্যা তীর্থে যাবার পথ দেখিয়ে দিল সেই দয়ালু চালক।

১৩৯৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস; (অক্টোবর ১৯৮৬খৃঃ)দেবীপক্ষ; নবরাত্র; এই উপলক্ষে উৎসব-উৎসব ভাব। তরুণ তপন কামাখ্যা তীর্থে রাস্তার পাশে চাবুত্রাতে বসে দৈনিক এক লক্ষ বার নাম জপ করতে ব্যস্ত। দিন যায়, রাত যায়, তপন আসন ছাড়েন না। অবশেষে কয়েকদিনের মধ্যেই জনৈক বৃদ্ধ ভক্তের চোখে পড়ল ব্যাপারটি। তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন, কাছে এলেন, স্নেহভরে প্রশ্ন করলেন, ফল দিলেন, বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যুক্তি দেখিয়ে খেতে বাধ্য করলেন। এই বৃদ্ধ ভক্তের নাম পবিত্র চক্রবর্তী; নিবাস নদীয়া, বয়স প্রায় ৯০ বৎসর, গৃহীভক্ত। তিনি প্রায়ই কামাখ্যাতে থাকেন, ঘর ভাড়া করে থাকেন, সাধন-ভজন করেন, আবার কয়দিন বাদেই চলে যান, তপনকে নিয়ে যান ভাড়া ঘরে; থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন; তপনের জন্য তিন বৎসর একটানা সেই ঘরের ভাড়া চালিয়ে যান পবিত্র বাবু। এই তিন বৎসর থাকা- খাওয়া বাবত ব্যয় বহন করেছেন ঐপবিত্র বাবু। এই সময় স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী (১৯০০-১৯৭৯খৃঃ)কর্তৃক স্থাপিত উমাচল যোগাশ্রমের সহিত তপনের পরিচয় হল।

১৩৯৬ বঙ্গাব্দের শীতকাল (১৯৮৯খৃঃ)। তপন স্থানান্তর গমনের প্রেরণা উপলব্ধি করলেন। পবিত্র চক্রবর্তীকে এই কথা বলাতে, তিনি রেলপথে ভ্রমণের ব্যয় বহন করলেন। রেলপথে মথুরাতে গিয়ে নামলেন। সেখানে জনৈক ঝাড়ুদার প্রশ্ন করল, সাধুবাবা! আমরা কেন মন্দির প্রবেশ করতে পারি না ? এই প্রশ্ন তপনের মনে দাগ কাটল, মন্দিরে প্রবেশে কোন আইনগত ও ধর্মীয় বাধা থাকতে পারেনা বলে আশ্বস্ত করলেন ঝাড়ুদারকে। মথুরা থেকে বৃন্দাবন গেলেন।

বৃন্দাবনে নানা মন্দিরে ঘুরেন, একা-একা পদব্রজে রাস্তায়-রাস্তায় চলেন; শেষে চানা-ছোলা কিনে নিয়ে যমুনার তীরে বসেন। চানা-ছোলা ভিজিয়ে,স্নান করে জপ করতে বসেন। সায়ংকালে কোথা থেকে এক বৃদ্ধ সাধু এলেন যমুনাতীরে। যমুনাতীরে প্রচণ্ড

শীতে বালক মারা যেতে পারে। এই বলেই সেই সাধু তপনকে হাতধরে নিয়ে এলেন উপরে এক গাছতলে । গাছতলাতে চাবুত্রাতে বসিয়ে, নীচ থেকে খাবার এনে দিলেন। পরের দিন দুটি কিশোর বালক এনে দিল খাবার । এর পর গ্রামবাসীরা দুধ, রুটি, ফল ইদ্যাদি দিয়ে যেত। গ্রামবাসীরাই ছোট কুটিয়া নির্মাণ করে দিল।

১৩৯৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস (ফেব্রুয়ারী ১৯৯০খৃঃ)। শিবরাত্রি সমাগত। শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে নিরম্বু উপবাস করে ৭দিন যাবৎ কঠোর তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাতদিন চল্‌ল কঠোর তপস্যা। সপ্তম দিবস রাত্রে একটি অলৌকিক, স্বর্গীয় অনুভূতি হল। ক্ষণিকের সেই দুর্লভ অনুভূতি তপনের মনে ও সত্ত্বায় আস্তিক্য বোধ দৃঢ় করল। গৃহত্যাগের সার্থকতার সাত্ত্বিক স্বাদ পেলেন । মানব কল্যাণে কাজ করার প্রেরণা লাভ তখনই হল। গৃহত্যাগ সার্থক বলে মনে হল। মনের শুন্যতা দূর হল। ক্ষণিকের অনুভব সমগ্র জীবনের সম্বল হয়ে রইল। পরদিন সকালে ঘটনাটি প্রকাশ করা হলে পর, বহু ভক্ত সমাগম হল। ভক্তরাই সুসজ্জিত নগর পরিক্রমার আয়োজন করল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই। যমুনাতে স্নান করিয়ে ফল আহার করাল। ভক্তদের শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা মনে হল মাতৃস্নেহতুল্য।

এই ঘটনার পর থেকেই ভক্তের সমাগম ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কেউ শিষ্য হতে চায়, কেউ আশ্রম গড়ে দিতে চায়, কেউ অর্থ দিতে চায়। তখন পরমানন্দ জীর চেতাবনী মনে হল। তিনি সাবধান করে বলে ছিলেন, কামিনী-কাঞ্চন- যশ-এই তিনের পেছনে মন ছুটলে পরমার্থ লাভ হতে পারে না।

১৩৯৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস (এপ্রিল ১৯৯০খৃঃ) । হিমালয়ের কোলে অবস্থিত চারধাম বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে খোলা হয়। শীতকালে বন্ধ থাকে। চারধাম যাত্রার জন্য নানা প্রান্থ থেকে যাত্রীর সমাগম ঘটে। বৃন্দাবনের কতিপয় সন্তের আগ্রহে তপন চারধাম যাত্রাতে দলেবলে রওনা হলেন। বয়স্ক সন্তরা ধীরে-ধীরে পথ চলে। তপনের তরুণ বয়স, উৎসাহী মন আর ধৈর্য ধরে না। তপন আগে-আগে চলে, বন-জঙ্গল দিয়ে চলে, এদিক-ওদিক দেখে, প্রাকৃতির সৌন্দর্য এই প্রথম দর্শনে আত্মহারা হয়ে যায়। এই করতে-করতে সঙ্গের সন্তদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। গঙ্গোত্রীতে পৌঁছার আগেই পথে হল বৃষ্টি; তপন পাহাড়ী ক্ষেত্রে বনে-বনে ভক্ত প্রহলাদের মতো ঘুরে বেড়ায়, আরেকটু গেলেই গভীর খাদে পড়বে, মৃত্যু অনিবার্য । অতিকষ্টে গঙ্গোত্রীতেই পৌঁছে গিয়ে প্রায় ছয় মাস বিশ্রাম ও সাধন-ভজন করলেন গঙ্গোত্রীতেই। শরৎ কালে, শীতের প্রারম্ভে চারধাম বন্ধ করে সাধু-সন্তরা, ভক্তরা, ব্যবসায়ীরা, যাত্রীরা নেমে আসে নীচে। তপন নেমে এলেন এবং বৃন্দাবনে প্রাক্তন কুঠিয়াতে আশ্রয় নিলেন।

১৩৯৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস (অক্টোবর ১৯৯০খৃঃ) তপন বৃন্দাবনে অবস্থান

করছেন। উদয়পুরে গুরুদেব পরমানন্দজীর নিকট পত্রযোগে সমস্ত অভিজ্ঞতা জানালেন। বৃন্দাবনের এক বৃদ্ধ সাধু অনুরোধ করলেন, তাঁর আশ্রমের দায়িত্ব নিতে । প্রতিষ্ঠিত আশ্রম, বিত্তালয়ে সঞ্চিত অর্থ- ইত্যাদি সাজানো বাগানের মত দেওয়া হবে তপনকে; বিনিময়ে তপন যেন বৃদ্ধ সাধুর অন্তিম কালে একটু সেবাযত্ন করে। উদয়পুরের গুরুদেব এসব জেনে পত্র দেন তপন যেন ত্রিপুরাতে প্রত্যাবর্তন করে। গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী তপন চলে আসেন উদয়পুরে গুরুর আশ্রমে প্রায় এক বৎসর অবস্থান করেন। গুরু-শিষ্যে খোলাখুলি মত বিনিময় হল। তপন লোকহিতে কিছু করতে চান। গুরুর অনুমতি নিয়ে তপন গৌহাটী যাবার মনস্থ করেন।

১৩৯৮ বঙ্গাব্দ (১৯৯১খৃঃ) তপন গেলেন উমাচল আশ্রমে। যোগবলে রোগারোগ্যের কলা-কৌশল শিক্ষালাভ করতে তপন বদ্ধপরিকর হলেন। সমস্ত নিয়ম কানুন নিষ্ঠার সহিত পালন করে যোগাসন আয়ত্ত করতে থাকেন।

১৩৯৯ বঙ্গাব্দে (১৯৯২খৃঃ) উজ্জয়িনীতে কুম্ভ মেলা হল। সেই মেলাতে যাবার সুযোগ এসে গেল। কামাখ্যা থেকে তিনজনের জোট যাবে, রেলগাড়ীর টিকিট কাটা হল; হঠাৎ একজন অসুস্থ হয়ে গেলেন। বাকী দুই জনের আগ্রহে তপন সঙ্গী হলেন। সেই সময় কাশীবাসী শ্রীমৎ স্বামী গোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন উজ্জয়িনীতে। তিনি কৃপা করে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দেন তপনকে। দীক্ষান্তে নাম হল তন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী। উজ্জয়িনী থেকে পুনরায় এলেন উমাচল আশ্রমে। প্রায় নয় বৎসর যাবৎ উমাচল আশ্রমে যোগবলে রোগারোগ্যের পদ্ধতি শিক্ষালাভ করে ২০০০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন করেন। ❑

শ্রীমৎ সর্বেশ্বর চৈতন্য মহারাজ

ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর নগর-এর উত্তর পার্শ্ব দিয়ে গোমতী নদী প্রবাহমান। গোমতী নদীর উত্তর তীরে প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। সেই স্থান ও আশে-পাশের গ্রাম রাজনগর নামে পরিচিত। রাজনগর নিবাসী শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী ও শ্রীমতী মায়া চক্রবর্তী নামক দম্পতির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এক শিশু। জন্মদিন হল ৩০ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭খৃঃ। শিশুর পিতৃদত্ত নাম হল শম্ভু চক্রবর্তী। ইনিই বর্তমানে শ্রীমৎ সর্বেশ্বর চৈতন্য মহারাজ নামে পরিচিত।

আশুতোষ এবং গনেশ হলেন ভাই। উভয়ে কৌলিক বৃত্তি অর্থাৎ যজন-যাজন নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। উদয়পুরে এই পরিবার সুপরিচিত। কিশোর শম্ভুকে প্রথমে গ্রামের পাঠশালায় এবং পরে রমেশ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করানো হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, পড়াশুনার চাইতে দেব-দ্বিজে,হরিনামে,কীর্তনে তার রুচি অধিক। কাকা গনেশ চক্রবর্তী একবার একটি ছোট ঢোলক কিনে দিয়েছিলেন। বালক শম্ভুর তাতে কি আনন্দ! সেই ঢোলক গলায় ঝুলিয়ে পাড়ার রাস্তায়-রাস্তায় সমবয়সীদের নিয়ে নাচগান করে।

ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর নগর রাজপাটশুন্য, কিন্তু জনমানবশুন্য নয়। এই নগরের উপর বহুবার বৈদেশিক আক্রমণের ঝড়-ঝাপটা গেছে। পাঠান-মোঘলের অত্যাচারে ইহা একাধিক বার শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। অবশেষে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে সমসের গাজীর অত্যাচারে ইহা পরিত্যক্ত হল কৃষ্ণ মাণিক্য (১৭৪৮-১৭৮৩)কর্তৃক। এই নগরে বহু দেবালয় ও বিশাল-বিশাল জলাশয় আছে। অধিকাংশ মন্দিরের অবস্থা করুণ, বিগ্রহ শুন্য। বিদেশী বিধর্মীরা নষ্ট করেছে। এমনই একটি মন্দির হল ভুবনেশ্বরী মন্দির।

বিশ বৎসর বয়সে,১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে, যুবক শম্ভু ভুবনেশ্বরী মন্দিরটি সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই শুভ উদ্যোগ ক্রমেই ভক্তদের দৃষ্টিতে এসেছে। ভক্তদের সহায়তায় ঐ মন্দিরের জীর্ণদশা ঘুচতে চলেছে।

শম্ভু কালক্রমে বিদ্যাশিক্ষার পথ ছেড়ে সাধন-ভজনের পথে পা বাড়ালেন। তিনি দর্শন পেলেন মহামন্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুপুরিজী মহারাজের । তাঁর থেকে দীক্ষা পেয়েছেন। গুরুর নির্দেশেই তিনি কাশীতে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত পড়ছেন। ❑

শ্রী নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা নগর-এর দক্ষিণে বিশালগড় নামক প্রাচীন জনপদ বিদ্যমান। বিশালগড় নিবাসী নেপালচন্দ্র দেব এবং গায়ত্রী দেবী নামক দম্পতির অন্যতম পুত্র নন্দদুলাল উত্তরকালে আশ্রমিক জীবনে শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন। নন্দদুলালের জন্মদিন হল আনুমানিক মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ।

সমতল ত্রিপুরার কুমিল্লা নগর-এর নিকটেই ছিল নেপালচন্দ্রের পূর্বনিবাস। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজন জনিত প্রবল প্রতিকূলাতে বাধ্য হয়ে নেপাল চন্দ্র পার্ব্বত্য ত্রিপুরার বিশালগড়ে আশ্রয় নেন। নেপালচন্দ্র ও গায়ত্রী দেবী হলেন ৬ জন পুত্র-কন্যার পিতা-মাতা। তাদের নাম হল যথাক্রমে দীপিকা, নন্দদুলাল, টুকুন, ভোলানাথ, পার্থ এবং ধ্রুব।

নন্দদুলালের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে বিশালগড়ে। বিশালগড়ের সংলগ্ন মধ্য লক্ষ্মীবিল নামক পল্লী হল নন্দদুলালের জন্মস্থান । গ্রামের পাঠশালাতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন বালক নন্দদুলাল।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেবের যেমন চাউল-কলা রোজগারের বিদ্যা ভাল লাগত না, বালক নন্দদুলালের ভাল লাগত না অর্থকরী বিদ্যা। এই বালকের মনের স্বাভাবিক রুচি হল পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন। তাই বিদ্যালয়ের পড়াতে মন বসে না। মনের ভেতর অস্বস্তিবোধ তুষানলের মত অনুভূত হল। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ে যাতায়াত একেবারেই নিরর্থক মনে হল।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যাবে? কোন্ আশ্রমে গেলে ভাল হয়? কোন্ গুরুর নিকট দীক্ষা নেওয়া সমুচিৎ হবে? এই সব প্রশ্ন বালক নন্দদুলালের অন্তর্জগতকে আলোড়িত করল। তাই বালক এলেন আগরতলাতে। আগরতলাস্থিত মহানাম অঙ্গনে কিছুদিন রইলেন; কিছুদিন মদন প্রভুর নিকট যাতায়াত করতে লাগলেন। নানা স্থানে পাঠ-কীর্তন শুনতে থাকলেন।

১৩৯১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ নন্দদুলালের জীবনে স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর বর্ষাকালে রথযাত্রা তিথিতে নন্দদুলাল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসেন। এই মঠে আসার জন্য প্রেরণা দেন পিসীমা শ্রীমতী সুনীতিবালা ধর। প্রমোদ ধর ও সুনীতি ধর হলেন আগরতলা নিবাসী ভক্ত। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সাথে তাঁদের যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। পিসীমার পরামর্শ অচিরেই সঠিক বলে প্রমাণিত হল। নন্দদুলালের খুব

পছন্দ হল মঠের পরিবেশ এবং মঠবাসীদের ব্যবহার।

ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কৃপা করে নন্দদুলালকে দীক্ষা দেন। দীক্ষান্তে তাঁর নাম রাখা হল শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী । নন্দদুলাল ব্রহ্মচারীর গায়ের রঙ গৌরবর্ণ,চেহারা নাতি দীর্ঘ। মঠ পরিচালনার্থে ভক্ত-শিষ্যদের কাছ থেকে আনুকূল্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এছাড়া মঠ রক্ষক ত্রিদন্ডিভিক্ষু ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ যখন যা নির্দেশ করেন, তা পালন করেন ঈশ্বরীয় সেবা মনে করে। নন্দদুলাল ব্রহ্মচারীর চরিত্রে চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ভক্তিনিষ্ঠা আছে। ❑

ব্রহ্মচারী দয়াল চৈতন্য

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া নামক জনপদে নয়নপুর নামক গ্রাম-নিবাসী শ্রী নিরঞ্জন ভৌমিক ও শ্রীমতী তরুবালা ভৌমিক-এর একমাত্র পুত্র শ্রী দীপক কুমার ভৌমিক জন্মগ্রহণ করেন শনিবারে, অগ্রহায়ণ মাসে, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে (১০. ১২. ১৯৬৮ খৃঃ)। দীপক কুমারের আশ্রমিক নাম ব্রহ্মচারী দয়াল চৈতন্য।

নিরঞ্জন ভৌমিকের পূর্ব্ব নিবাস ছিল নোয়াখালী জেলাতে। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে নোয়াখালীতে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার করা হয়েছিল। তখনই অন্য অনেকের সাথে, এই পরিবার ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল। দীপকের শৈশব, কৈশোর ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে তেলিয়ামুড়াতে। গ্রামের পাঠশালাতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ হয়। পরে আগরতলাতে এসে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষাতে কাশীতে গমন করেন। কাশীতে সংস্কৃত নিয়ে পড়াশুনা করেন এবং বেদান্তচার্য উপাধি প্রাপ্ত হন।

আগরতলার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত আমতলী উচ্চ বিদ্যালয়ে যখন পড়াশুনা করতেন, তখন স্বামী অমরেশ্বর পুরী মহারাজের আশ্রমে যাতায়াত করতেন বালক দীপক কুমার। সেই পরিচয় ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। অমরেশ্বর পুরী মহারাজের অনুপ্রেরণায় শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণু পুরী মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি গাঢ় হতে থাকে এবং ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে দীক্ষা প্রাপ্ত হন। উভয়ের প্রেরণায় কাশীতে যান সনাতন ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে। কাশীতে থাকতে-থাকতেই আশে-পাশের তীর্থসমূহ দর্শন করে নেন। কালক্রমে উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত প্রধান-প্রধান তীর্থসমূহ দেখে নেন। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর শ্রীরাম জন্মভুমি সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেন এবং ৭ দিন কারাবাস করতে বাধ্য হন। এ ছাড়া, যোগাসন শিক্ষালাভ করেন। একাধিকবার যোগাসন প্রতিযোগীতায় অংশ নেন এবং পুরস্কৃত হন। তিনি সনাতন ধর্ম পরিষদের সাথে যুক্ত আছেন। মমতাময়ী সরস্বতী মা যখনই কোন কাজে ডাকেন, দয়াল চৈতন্য যথাসাধ্য সহযোগীতা করেন। ❑

প্রভুপাদ গোস্বামী

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা নগর। আগরতলা থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বেলাবর নামক একটি গ্রাম আছে। বেলাবর গ্রাম-নিবাসী শ্রী কামিন্দ্র ও শ্রীমতী ছায়া ধর নামক দম্পতির আট জন পুত্র-কন্যা। তাদের নাম হল যথাক্রমে আশুরঞ্জন, পারুল, অমররঞ্জন, দীপালী, মেনকা, রবীন্দ্র, হেনা এবং অপর্ণা। এই পরিবারের পূর্ব নিবাস ছিল ঢাকা জিলাতে। উদ্বাস্তু হিসাবে ত্রিপুরাতে আগমন ঘটে এবং শরণার্থী শিবিরে কালাতিপাত করে। শরণার্থী শিবির বন্ধ হয়ে যাবার পর, কায়িক পরিশ্রম করে কোন প্রকারে সংসার নির্বাহ করতে থাকে।

এই পরিবারের সুসন্তান রবীন্দ্র অন্যদের চাইতে ভিন্ন প্রকৃতির। বালক রবীন্দ্রের জীবনচর্চা গতানুগতিক নয়। তাঁর জন্ম ত্রিপুরাতেই; আনুমানিক ১৩৮৪ বাংলাতে, অর্থাৎ ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে। জন্মের সঠিক দিনক্ষণ, মাস-তিথি বালকের মনে নেই। গ্রামের পাঠশালাতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন; কিন্তু আর ভাল লাগল না।

১৪০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে বালক দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা গুরু হলেন আগরতলার উত্তরে গান্ধীগ্রাম নিবাসী প্রদীপপদ গোস্বামী। তখন বালকের বয়স ১৬ বৎসর মাত্র।

বালক রবীন্দ্র প্রায়ই স্বপ্নে দেখতেন শ্রীকৃষ্ণকে। কোথাও মাঠের ধারে, গাছতলে বসে তিনি মাটির মূর্তি বানিয়ে ফুল, দূর্বা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা-পূজা দিতেন। এজন্য বাড়ীর লোকজন মারধোর করত। কিন্তু বালক তাতে নিরস্ত হলেন না। ক্রমেই বাড়ীরসাথে তিক্ততা চরমে উঠল। বাড়ীর পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠল। অতঃএব গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। বাড়ীর অনতিদূরে, অরুন্ধুতিনগরে সর্বধর্ম মিশন নামে একটি আশ্রম আছে। ইহার স্থাপয়িতা হলেন শ্রীমৎ লবচন্দ্র পাল (১৮৮২-১৯৬৬খৃঃ) নামক জনৈক সাধক। এই আশ্রমে আপাততঃ আশ্রয় নিলেন। সেদিন ছিল ১১ই বৈশাখ ১৪০১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ এপ্রিল ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ। দুই বৎসর অধিক কাল এই আশ্রমে রইলেন। কিন্তু এই আশ্রমের সাধন-ভজন প্রণালী মনঃপুত হল না। এই আশ্রমে মাছ, ডিম, শুটকি ইত্যাদি রান্না হয় এবং সে-সব আমিষ দ্রব্য ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয়।

বালক রবীন্দ্র ছটফট করতে থাকেন, এই পরিবেশ থেকে চলে আসার জন্য। প্রায় সপ্তাহ খানেক সময় সরকারী গোবিন্দবল্লভ হাসপাতালে রাখতে হল। তারপর পিতৃগৃহে

নিয়ে আসা হল। ইহা ১৪০৩ বাংলার বৈশাখ মাসের ঘটনা।

প্রায় তিন বৎসর অর্থাৎ ১৪০৩, ১৪০৪ এবং ১৪০৫ বাংলাতে বালক কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন, যেখানেই কীর্তন হত, সেখানেই যেতেন, নাম সংকীর্তন করতেন, গান-বাজনা করতেন, ভোগ প্রস্তুতে সাহায্য করতেন। সাত্ত্বিক নিরামিষ ভোজন করে পরম তৃপ্তি পেতেন। ১৪০৫ বাংলার পৌষ ও মাঘ মাসে বালক রবীন্দ্র প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন না। চারিদিকে শুধু দেখতেন কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা প্রকার লীলা তখন মানস পটে ভেসে উঠত।

অবশেষে ৮ই ফাল্গুন ১৪০৫ বাংলাতে অর্থাৎ রবিবার ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে নিজের বসতবাড়ীতে মাটি খুড়ে পেলেন এক চমৎকার দ্রব্য। তামার কলসী এবং ঐ কলসীতে রক্ষিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ। তড়িৎ গতিতে এই সুখবর বিভিন্ন দিকে ছড়াল। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ভক্ত সমাবেশ হতে লাগল। ভাবাবেশে তিনি নানা কথা বলেন। তাতে অনেকেই হয়েছেন উপকৃত। এই সময় থেকে তিনি প্রভুপদ গোস্বামী নামে ক্রমেই খ্যাতি লাভ করতে থাকেন।

মহারাজগঞ্জ বাজারে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও ভক্তপ্রবর শ্রী তপন চৌধুরী ও শ্রীমতী শিখারাণী চৌধুরী অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি ও স্নেহ করেন তরুণ বৈষ্ণব প্রভুপদ গোস্বামীকে। শ্রী চৌধুরী দম্পতি ১৪০৬ বাংলার বৈশাখ মাসে তীর্থ পর্যটনে যান এবং সাথে করে প্রভুপাদ গোস্বামীকে নিয়ে যান। তখনই পশ্চিমবঙ্গের নানা তীর্থক্ষেত্র যেমন — কালীঘাট, নবদ্বীপ, মায়াপুর প্রভৃতি দর্শন লাভের সুযোগ ঘটে।

১৪০৬ বাংলার মাঘ মাসে পিতা লিখিতদলিলপত্র করে দুই গণ্ডা ভূমি দান করে দেন শ্রীকৃষ্ণের সেবার্থে। উল্লেখযোগ্য এই যে, ঐ ভূমিতেই ১৪০৫ বাংলার ৮ই ফাল্গুন শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ পাওয়া গিয়েছিল। লিখিত দানপত্র পাওয়ার অব্যবহিত পরেই দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে মন্দির নির্মাণ কাজ শুরু হল। ভক্তরাই দিয়েছেন যাবতীয় অর্থ ও উপকরণ। ১৪০৬ বাংলার ৮ই ফাল্গুন মন্দিরের শুভ-উদ্বোধন করা হল। দিনরাত কীর্তন হল, কয়েক হাজার লোক প্রসাদ পেল।

এই আশ্রমে ২টি উৎসব বড় আকারে করা হয়। প্রথমটি শ্রাবণ মাসে ঝুলন পূর্ণিমাতে। প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ কীর্তন হয়, অগণিত ভক্ত প্রসাদ পায়। দ্বিতীয় উৎসব হয় ৮ই ফাল্গুন, শ্রী বিগ্রহের আবির্ভাব তিথিতে। এই উৎসবে কীর্তন হয় ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রভুপাদ গোস্বামী বয়সে এখনও (২০০১ খ্রীঃ) তরুণ। তাঁর মনে আছে ভক্তি,

দেহে আছে শক্তি, ব্যবহারে আছে কোমলতা, আচারে আছে নম্রতা। তাই তাঁর ভক্ত সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। প্রসঙ্গতঃ কয়েকজন ভক্তের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন — মনা সাহা অর্থাৎ নারায়ণপদ গোস্বামী, চন্দনলাল দাস, চন্দনের মাতা শ্রীমতী লক্ষ্মীবালা দাস, মণিশঙ্কর দাস, স্বপন দাস, কাজলরাণী দাস, শ্রী তপন চৌধুরী ও শ্রীমতী শিখারানী চৌধুরী শ্রী হীরালাল দাস প্রমুখ। ❑

অনুক্রমণিকা

প্রাচীন ত্রিপুরার সাধু-সন্তদিগের জীবনী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ত্রিপুরার কতিপয় সাধু-সন্তের জীবনী সংগ্রহ করে আবির্ভাব-কালানুক্রমে সাজানো হল।

অমর মাণিক্যের পুত্র রাজধর মাণিক্য বর্তমান গ্রন্থের সর্ব প্রথম আলোচিত সন্ত। তিনি ছিলেন রাজর্ষি। তাঁর রাজত্বকাল হল ৪৬৮৮-৪৭০১ কল্যব্দ: ১৫৮৬-১৫৯৯ খৃষ্টাব্দ, ৯৯৬-১০০৯ ত্রিপুরাব্দ, ৯৯৩-১০০৬ বঙ্গাব্দ। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু (১৪৮৬-১৫৩৩খৃঃ) থেকে প্রায় একশত বৎসর কনিষ্ঠ ছিলেন রাজধর মাণিক্য। রাজধর মাণিক্যের পূর্বে ত্রিপুরাতে যেসব সন্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে কোন লিখিত প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। এই গ্রন্থে মাত্র পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে (১৫০০-২০০০খৃঃ) যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের জীবনী সংকলন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমন কি, সেই চেষ্টাও আংশিক। রামকৃষ্ণ মিশনে, ভারত সেবাশ্রম সংঘে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘে যোগদান করেছেন এমন কারো- কারো পূর্বাশ্রম ত্রিপুরাতেই ছিল। তাঁদের জীবনী সংগ্রহ করতে না পারায় বইটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

সন্ত বলতে এখানে কেবলমাত্র অবিবাহিত, ব্রহ্মচারী, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে বুঝানো হয়নি। গুণ ও কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চতুর্বর্ণের অন্তর্গত যে-কেউ গুণ ও কর্মের বিচারে মহান বলে অনুভূত হয়েছে তাকেই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে।

পার্বত্য ত্রিপুরা ও সমতল ত্রিপুরা মিলে ত্রিপুরা রাজ্য। বর্তমান গ্রন্থে উভয় ত্রিপুরার গ্রামে-গঞ্জে, নগরে আবির্ভূত সন্তদের জীবনী সংকলিত হল। ১৯৪৭ সালের পর সমতল ভূ-ভাগকে ধরে রাখতে না পারার জন্য ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েই, তৎপূর্ববর্তী বৃহত্তর ত্রিপুরাতে আবির্ভূত সাধু-সন্তদের জীবনী এতে সংগৃহীত হল।

ত্রিপুরার বেশ কয়েকজন রাজা ছিলেন প্রজারঞ্জক, দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ এবং গো-ব্রাহ্মণের রক্ষক। সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন মহারাজকুমার সহদেব বিক্রম কিশোর। সহদেব বিক্রম কিশোর (১৯৩০-) ত্রিপুরাতে ধর্ম মহাসংঘ স্থাপন করেছেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাদেশিক শাখার সভাপতি ছিলেন

দীর্ঘকাল, কুঞ্জবনে ভোলাগিরি আশ্রম স্থাপনের কাজে সহযোগিতা করেছেন। বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও ত্রিপুরীদের ভূমি সংরক্ষণ -- এই দুটি সমস্যার নিয়মতান্ত্রিক সমাধান তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর কথায় কর্ণপাত না করাতে, পরে ভয়াবহ দাঙ্গা হল। কিন্তু দুর্গম পার্বত্য এলাকা, অত্যন্ত অনুন্নত অর্থনীতি, বন্য জন্তু-জানোয়ার, মশা-মাছির উৎপাত, কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে নরমুণ্ডছেদন প্রথার প্রাবল্য -- প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলে খুব খ্যাতনামা সন্ত-মহাত্মার আশ্রম-আখড়া অতীতে, মধ্যকালে গড়ে উঠেনি। পক্ষান্তরে উত্তর ভারতে, গঙ্গার উপত্যকায়, হিমালয়ের কোলে সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই গড়ে উঠেছিল বহু আশ্রম-আখড়া, তীর্থক্ষেত্র। সেসব তীর্থ ও আশ্রম হাজার-হাজার বৎসর যাবৎ হাতছানি দেয় অন্যান্য এলাকার সন্তদিগকে। স্মরণাতীত কাল থেকেই সেখানে সন্তদের ভীড়। ত্রিপুরা থেকেও বহু ত্যাগী পুরুষ এভাবেই সেখানে চলে গেছেন। মাত্র কয়েকজনের জীবনী লিখিত ইতিহাসের বই-এর পাতায় স্থান পেয়েছে। তাদের অনেকের কথাই বিস্মৃতির গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে।

আকারে-প্রকারে, গুণে-কর্মে উদ্ভিদ প্রজাতির সকলেই, জানোয়ার প্রজাতির সকলেই, পাখী প্রজাতির সকলেই, কীট-পতঙ্গ প্রজাতির সকলেই একরূপ নহে। এই বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক ও প্রয়োজনীয়। তদ্রুপ মনুষ্য প্রজাতির সকলেই একরূপ নহে। ঠিক তেমনি, সাধু সন্তরা সকলেই একরূপ নহে। কেউ কর্মপ্রধান, কেউ জ্ঞান প্রধান, কেউ ভক্তিপ্রধান, মুষ্টিমেয় কেউ-কেউ কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির সমাহারে সমুজ্জ্বল। এই গ্রন্থের অন্তর্গত দুই জন সন্তের মধ্যে তুলনা করা যাক্। এঁরা হলেন শ্রীমৎ স্বামী হংসরাজ সোহংমণি (১৮৯৪-১৯৭৯ খ্রীঃ) এবং শ্রীমৎ স্বামী দয়ালানন্দ (১৮৯৯-১৯৭০ খ্রীঃ)। হংসরাজ সোহংমণি ছিলেন অতীন্দ্রয়বাদী, ভক্তিমার্গী, অন্তর্যামী, মৌনী অথচ প্রচারক, নিস্ক্রিয় অথচ কর্মশীল, ধ্যানপ্রতিভাসম্পন্ন। পক্ষান্তরে, দয়ালানন্দ ছিলেন সরব, সক্রিয়, কর্মবীর, নির্বাহী প্রতিভাসম্পন্ন, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। আবার দেখা যায়, স্বামী স্বরূপানন্দের (১৮৮৭-১৯৮৪ খ্রীঃ) মধ্যে কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি — এই ত্রিধারার সমন্বয়।

আশ্রমিক জীবনে আসার পশ্চাতে প্রেরণা সকলের ক্ষেত্রে একরূপ নহে। কেউ আসে তীব্র বৈরাগ্যবোধ থেকে, কেউ আসে ঘটনাচক্রে, কেউ আসে পারিবারিক জীবনের বিতৃষ্ণা বা বিশৃঙ্খলা থেকে।

বৈরাগ্য ভাবাপন্ন সন্তদের নিকট গৃহস্থ জীবন কারাগার সদৃশ মনে হয়,

আশ্রমিক জীবন অনাবিল আনন্দধাম বলে মনে হয়। আশ্রমিক জীবনের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ-তিতিক্ষা, পরীক্ষা-পরিশ্রম সহজ, সরলভাবে গ্রহণ করে ক্রমেই সাধন জগতে অগ্রসর হতে পারেন তাঁরা। অন্য দুই ধরণের আশ্রমবাসীর পক্ষে আশ্রমিক জীবনকে কখনো কখনো রুক্ষ শুষ্ক বলে মনে হয়। এরা না ঘরকা, না ঘাটকা।

সন্তদের জীবনীমূলক তথ্য সংগ্রহ করতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ হল। কেউ-কেউ সরাসরি, স্পষ্টভাবে উত্তর দেন; কোন প্রকার ভণিতা, রাখঢাক নেই, কোন সংকোচ নেই। পূর্বাশ্রমের কাহিনী বলতে তাঁরা এতটুকু দ্বিধা করেন না। পূর্বাশ্রমের অর্থাৎ পৈত্রিক নিবাসে থাকার সময়কার ঘটনাবলী না বলার একটি প্রথা আছে। কিন্তু কয়েকজন তেজস্বী তপস্বী সেসব পরোয়া করেন না। মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুপুরীজি মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ বিজয়ানন্দ মহারাজ, পূর্ব বাংলা সারস্বত মঠের শ্রীমৎ নির্ব্বিকারানন্দ সরস্বতী মহারাজ নির্ভয়ে, নিসংকোচে, পূর্বাশ্রমের ও আশ্রমের ঘটনাবলী বলে দেন। এতে ইতিহাস-লিখন সহজ হয়। পক্ষান্তরে কেউ- কেউ সন্ধ্যা ভাষায় উত্তর দেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১ খ্রীঃ) মহাশয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত **বৌদ্ধ গান ও দোহা** নামক গ্রন্থের ভূমিকায় সন্ধ্যা ভাষার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "সহজিয়া ধর্মের সকল বইই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার। খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।" ত্রিপুরাতে অতীন্দ্রিয়বাদী সহজিয়া সন্ত সোহংমণি মহারাজ সন্ধ্যা ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর একান্ত অনুগত ভক্তরাই সেসব কথার মর্মার্থ বুঝতে পারত।

সব সাধু-সন্তের দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ, দেশের সমস্যা ও সম্ভাবনার প্রতি মনোভাব একরূপ নহে। মূল প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিকোণ উত্তরসুরীদের কার্যধারাকে সাধারণতঃ প্রভাবিত করে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রীঃ) ধর্মান্তরকরণের কুফল সম্বন্ধেঅত্যন্ত সজাগ ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ) দেশবাসীর সামগ্রিক দুর্দশা দূর করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর (১৮৭৪-১৯৩৭ খ্রীঃ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে অনাচারমুক্ত করতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। স্বামী স্বরূপানন্দ (১৮৮৭-১৯৮৪ খ্রীঃ) চরিত্র গঠন আন্দোলনকে ব্যাপক রূপ দিয়েছিলেন। স্বামী প্রণবানন্দ (১৮৯৬-১৯৪১ খ্রীঃ) তীর্থক্ষেত্রে কতিপয় পাণ্ডার উৎপাত বন্ধ করতে এবং আর্তের সেবা করতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আবার কোন কোন আশ্রম ও আশ্রমবাসীর মধ্যে জাতীয়

দৃষ্টিভঙ্গির নিতান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরায় উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের পুরোহিতদের অনেকের মধ্যেই এবং পুরাতন আগরতলায় চৌদ্দ দেবতা মন্দিরের পুরোহিতদের মধ্যে এই অভাব সুস্পষ্ট। স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী (১৮৮০-১৯৩৫ খ্রীঃ) স্বীয় আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী (১৭৩০-১৮৯০ খ্রীঃ) কোন প্রকার সেবা প্রকল্প গড়ে তুলতে চান নি।

আঠালো, কাঁচা মাটি যেমন দক্ষ কুম্ভকারের হাতে নানা প্রকারের বাসনে রূপান্তরিত হয়, ঠিক তেমনি নিষ্ঠাবান ভক্ত-শিষ্য তদীয় গুরুর হাতে নানা ভাবে, নানা কাজে গড়ে উঠে । দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দ প্রমুখ দক্ষ কারিগরের হাতে বহু কাঁচা সোনা পাকা সোনাতে রূপান্তরিত হয়ে দেশবাসীর অশেষ হিতসাধন করছেন।

যে গুরু দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে চিহ্নিত করে যথাসাধ্য সমাধানের জন্য দিক্‌দর্শন দিয়ে যান, তিনি জনসমাজে অমর রহেন। আচার্য বিনোবা ভাবে (১৮৯৫-১৯৮২ খৃঃ) জমিদারদের কাছ থেকে ভূমি দান হিসাবে নিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। বিবেকানন্দ নিরক্ষরতা দূর করতে কঠোর ব্রত রেখেছিলেন আশ্রমবাসীদের সামনে। প্রণবানন্দ ঝড়ায়, খড়ায়, দাঙ্গায়, বন্যায়, ভূমিকম্পে আর্তের সেবাকে গুরুত্ব দিতে শিখিয়ে গেছেন।

পক্ষান্তরে, যেসব সাধক বা সাধ্বী স্বীয় সাধন বলে উচ্চ মার্গে আরোহণ করেছেন, অগনিত ভক্তের প্রণাম পেয়েছেন, অথচ কোন-না-কোন সমস্যা সমাধানে নিজেকে জড়ান নি, শিষ্যকে নির্দেশ দেন নি, তিনি শিক্ষিত, যুক্তিবাদী ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধা পেতে পারেন না। তাঁর তপোবলে আশ্রম কিছুকাল চল্‌তে পারে কিন্তু ক্রমেই শীর্ণ হয়ে যেতে পারে।

দেশ ও দেশবাসীর জীবনযাত্রাতে অকল্পনীয় পরিবর্তন এসেছে। সহস্রাধিক বৎসর পরাধীন থাকার পরিণাম ভয়াবহ। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের পর ইংল্যাণ্ড আর পরাধীন থাকেনি। দীর্ঘ স্বাধীনতার সুফল বৃটীশ জাতি উপভোগ করছে। পক্ষান্তরে, ভারত বহুকাল পরাধীন থাকায়, অঙ্গচ্ছেদ করেও মুক্তিলাভ করতে পারছে না। আরো দুর্দিন আসার সম্ভাবনা। প্রতিদিন নারীনির্যাতন, অপহরণ, ধর্মান্তরকরণ, ক্ষুদ্রাকারে আক্রমণ অব্যহত আছে। দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই তোষণ করতে প্রতিযোগীতা করছে, এবং আত্মকলহে নিমগ্ন। বৈদেশিক আক্রমণ সমাগত জেনে দেশপ্রেমিক চাণক্য চেতাবনী দিতে এসে অপমাণিত হয়েছিলেন ভোগান্ধ

রাজাদের দ্বারা। সমাজের মুষ্ঠিমেয় লোক সজাগ-সচেতন, বাদবাকী অধিকাংশ লোক চিরকালই ভোগী, লোভী, উদাসীন। সেই অধিকাংশের তালিকায় যদি সাধু সন্তরা অর্ন্তভূক্ত হয়, তবে বিপদ অধিক ঘনীভূত ।

পাঠান-মোগল ও বৃটিশ আমলে ভারতীয় সাধুরা সমাজের হিতার্থে ভক্তি আন্দোলন করেছিলেন। ইহা ছিল প্রগতিশীল, সাম্যবাদী, শান্তিবাদী, যুক্তিবাদী জাতীয় আন্দোলন। পরাধীনতা ও গৃহদাহ সমতুল্য। গৃহদাহকালে প্রতিবেশীর বাড়ীতে নাচগানে অংশগ্রহণ যুক্তিহীন। পরাধীনতা হেতু ভারতীয় সাধু-সন্তরা দুর্বলদের সেবা করতে পারেনি। স্বাধীনতা লাভের পর, সাধু সন্তদের একাংশ অনুন্নতবর্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করে শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী বিজয়ানন্দ সেবার কাজে ও জনচেতনা বৃদ্ধির কাজে জীবনপাত করেছেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে মরা মানুষ জীবিত হয়ে যেত বলে শ্রোতারা মন্তব্য করত। তিনি নিজেকে সমাজের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে, পাহাড়াদার কুকুর হিসাবে তুলনা করতেন। স্বামী বিষ্ণুপুরিজী মহারাজ এবং স্বামী কৃপালানন্দ গিরি মহারাজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কতিপয় রাজনীতিবিদ্‌দের ভণ্ডামীকে সমালোচনা করেন। সমাজকে যারা বিভ্রান্ত ও বিপদগামী করছে, প্রশাসনের নৌকার তলদেশ ফুটা করছে, তাদের তোয়াজ করা সাধুজনোচিত নয় বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন বিজয়ানন্দ জী, বিষ্ণুপুরিজী, কৃপালানন্দজী।

আগে সর্বনাশা মহামারী রোগের বিভীষিকাতে লোক কাবু ছিল। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিতে সেই মহামারি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত। তৎস্থলে নতুন মহামারি এসে হাজির। নতুন রোগটির নাম পলিটিক্স বা রাজনীতি। ইহা এখন মানুষের অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, ধর্মনীতি ও শাসননীতির রন্ধ্রে-রন্ধ্রেপ্রবেশ করেছে। অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি ও শাসননীতি হারিয়ে ফেলেছে স্বীয় স্বয়ংক্রিয়তা। ধর্মনিরপেক্ষনীতির অপপ্রয়োগে ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা বিপন্ন হতে চলেছে। এমন সর্বনাশা, আত্মঘাতি রাজনীতির বিরুদ্ধে সাধু-সন্তরা যদি সজাগ ও সচেতন না হয়, তাহলে তারাও ভণ্ড পর্যায়ভুক্ত বলে আগামী প্রজন্ম দোষারোপ করবে। সুতরাং কতিপয় সাধু সন্তের সতর্ক বাণী সর্বনাশা পলিটিক্সের বিরুদ্ধেই কেবল ; সুস্থ রাজনীতির প্রতি কটাক্ষ নয়। অপ্রিয় সত্যভাষণের অন্তরালে সততা, সাহস ও দেশপ্রেম নিহিত থাকে। প্রিয় মিথ্যাভাষণ ভাঁড়ামি তুল্য।

যাঁরা সত্যিকারের সাধু-সন্ত, তাঁরা সমাজের বন্ধু-দার্শনিক ও পথদ্রষ্টা। তাঁরা অমৃতের সন্ধানে সাধনা করেন, অমৃত লাভ করেন এবং অমৃত বিলিয়ে দেন। উদ্দেশ্য ও উপায় যেন সৎ হয়। বৈষয়িক উন্নতি ও নৈতিক উন্নতি যেন পরস্পরের সহায়ক হয় — এই মর্মে তাঁরা উপদেশ দেন।

দাদু দয়াল (১৫৫৪-১৬০৩ খ্রীঃ) মনে করতেন যে, সাধু-সন্তদের দেহ হল দীপক, ব্রহ্মজ্যোতিতে সেই দীপক জ্যোতির্ময়। সৎলোক পতঙ্গের মত এসে সেই দীপকেতেপতিত হয়।

Bertrand Russell (1872-1970) মন্তব্য করেছেন মনীষী সম্বন্ধে The Basic writings of Bertrand Russell নামক গ্রন্থের ৩৬০ পৃষ্ঠায়। রাসেল বলেন, "Phophets, mystics, poets, scientific discoverers are men whose lives are dominated by a vision; they are essentially solitary men. When their dominant impulse is strong, they feel that they cannot obey authority if it runs counter to what they profoundly believe to be good. Although, on this account, they are often persecuted in their own day, they are apt to be, of all men those to whom posterity pays the highest honour."

যোগাচার্য শিবানন্দ সরস্বতী (১৯০০-১৯৭৯ খ্রীঃ) **বিচিত্রা** নামক গ্রন্থের ভূমিকাতে সাধু-সন্ত বিষয়ে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। শিবানন্দ সরস্বতী বলেন, 'সাধু-সন্ন্যাসীদের মাঝে তিনটি স্তর রহিয়াছে। একদল জ্ঞানী, আর এক দল প্রেমিক, এই দুই দল ছাড়া বাকী তৃতীয় দলের সাধুদের ভিতরে জ্ঞান ও প্রেম-এই দুইটারই সমন্বয় হয়। .... খাঁটি জ্ঞানীরা একটু রূক্ষ ও কর্কশ প্রকৃতির হয়। .... লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে লোক গেলে তিনি শ-কার ব-কার উচ্চারণ করিয়া এমন গালাগাল আরম্ভ করিতেন যে কানে আঙ্গুল দিয়া পালাইয়া না আসিয়া উপায় থাকিত না। এই জাতীয় গোঁড়া জ্ঞানী সাধুরা সাধারণ কাঠের মত নিজেরা ভগবান বা মুক্তির দিকে ভাসিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু কাহাকেও সঙ্গে লইতে পারেন না। কাহাকেও ইহারা যথার্থভাবে পরিচালনা করিতে পারেন না। ইঁহাদের বিভূতি ও সাধুত্বের কঠোরতা দেখিয়া অনেকে তাঁহাদের চেলা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চেলাদের অতৃপ্তই থাকিতে হয়।

গোঁড়া ভাবুক ও ভক্ত সাধুদের বেলাতেও ঠিক এইরূপ ঘটে। ইঁহারা সাধুগিরি করার যথার্থ অধিকারী নন। ....

একটা মানুষকে আমরা আদর্শ মানুষ বলি কখন, যখন দেখি লোকটির বিচারবুদ্ধি অতি সাত্ত্বিক এবং অন্তরটাও স্নেহ-মমতা করুণায় পরিপূর্ণ। যদি দেখি কাহারও ভিতর বিচার-বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ম, কিন্তু অন্তরটা অতি নিষ্ঠুরের মত, স্নেহ মমতার লেশমাত্র তাহাতে নাই। এইরূপ মানুষকে আমরা কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারিব না। আবার যদি দেখি কাহারও ভিতর হৃদয়ের আবেগ উচ্ছাস ও স্নেহ-মমতাগুলি একটু উগ্র ধরণের, সুষ্ঠ বিচার শক্তি দ্বারা এই উচ্ছাসগুলি নিয়ন্ত্রিত নয়, তাহা হইলে এই রূপ লোকও আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে না। এই দুইটি বৃত্তি যাহার ভিতর সামঞ্জস্য লাভ করে তিনিই শুধু আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন। উন্নত সাধক সম্বন্ধেও এই উপমাটি খাটে'।

কবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০ খ্রীঃ) **পরোপকার** নামক একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ কবিতাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কবিতাটি নিম্নরূপ —

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল।
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান।
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ন দান।।
স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত।
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত।।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে।
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।।

বর্তমান গ্রন্থে যে-সব ব্যক্তির জীবনী অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, তাতে আছে বিভিন্ন ধরণের লোক ঃ রাজা ও প্রজা, নগরবাসী ও গ্রামবাসী, উচ্চ শিক্ষিত ও নিরক্ষর, ত্রিপুরী ও বাঙ্গালী, নারী ও পুরুষ, বিবাহিত ও ব্রহ্মচারী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তান্ত্রিক, জুমিয়া ও ব্যবসায়ী এবং চতুবর্ণ থেকে আসা লোক। লোক বাছাই-করতে কেবলমাত্র গুণ ও কর্মকে মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছে।

কুলগত পেশা এবং বর্ণগত চৌহদ্দি থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সনাতন সমাজে ঐ চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে সন্ন্যাসের মুক্তাঙ্গনে উঠে আসার কোন বিধিগত অন্তরায় ছিল না।

সেই স্বাধীনতার ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু সন্ন্যাস জীবনে আসাই যথেষ্ঠ নয়। সাধনা ও সৎকর্মের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তবেই চতুর্বর্ণের লোক ঐ সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। সেই অগ্নি পরীক্ষা এখনও লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের নানা প্রান্তে, নানা সময়ে, নানা বর্ণে-বংশে আবির্ভূত খ্যাত ও অখ্যাত সাধু-সন্তরা সমাজের অস্থিরতা দূর করতে, ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করতে, নৈতিক মান বজায় রাখতে, মূল্যবোধ জাগ্রত রাখতে, সর্ব ভারতীয় ঐক্যবোধ গড়ে তুলতে, ত্রিকালের মধ্যে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখতে সহায়তা করে আসছেন। ত্রিপুরার সন্তদের ভূমিকা একই সুরে বাঁধা।

এই সন্তদের সাধন প্রণালীতে ও কার্যপ্রণালীতে আপাত বৈচিত্র্য ও বৈপরিত্য দেখা যায়। কিন্তু অভ্যন্তরে সাদৃশ্য ও সুরসংগতি বিদ্যমান। সেই সুরসংগতির স্বরূপ কি প্রকার? সেটি হল ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ- প্রভৃতি মহান আদর্শকে নিজেদের জীবনে আচরণের সাধনা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, সত্যই অমৃত, সত্যই মধু, সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই ধারক। এসব নীতি হল সভ্যতার বনিয়াদ, ক্ষুধার্ত আত্মার খোরাক। সন্তরা সত্যের সাধক, ভৌতিক শক্তির সাধক নহেন। তাঁরা আত্মাকে অভুক্ত রাখ্‌তে চান না।

কিছু বিদেশী মতবাদ অষ্ট্রেলিয়াতে, আমেরিকাতে, আফ্রিকাতে, এশিয়াতে অপরাপর সংস্কৃতিকে ছলে-বলে পদানতকরণ ও নির্মূলকরণ করেছে। ভারতীয় সন্তরা ও দার্শনিকরা ঐ পন্থাকে অপছন্দ করতেন। তাঁরা রক্তের দাগ রক্ত দিয়ে মোছতে চেষ্ঠা করেন না। তাঁরা উগ্রদর্শন দ্বারা উগ্র সমর্থকের জন্ম দিতে চান নি। বীণার ঐক্য আর একতারার ঐক্যের মধ্যে প্রভেদ তাঁরা জানতেন।

ভারতপথ হল শান্তির পথ, সত্যের পথ, বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়ের পথ। কিন্তু কোন্ সমন্বয়ের পথ? আততায়ীকে ভয়ে বাবা ডাকা সমন্বয় নয়। আততায়ীকে নানা ভাবে তোষণ-পোষণ হল আত্মঘাতী আত্মপ্রবঞ্চণা। দুরভিসন্ধিজাত এই চাটুকারিতা ধড়িবাজদের দৃষ্টিতে উদারতা ও সমদৃষ্টি। খাঁটির চাইতে ভেজালের সচলতা বেশী হলে সভ্যতার সংকট অনিবার্য। ❑

ভারতীয় সাধকের নামের তালিকা

নিম্বার্ক	বৃহস্পতিবার, কার্তিকী পূর্ণিমা,	১৫ কল্যাব্দ
আদি শংকরাচার্য		২৫৯৪ কল্যাব্দ-
রামানুজ		১০১৭-১১৩৭ খৃষ্টাব্দ
মাধব আচার্য		১২৩৮ ১৩১৭
নাম দেব		১২৭০-১৩৫০
জ্ঞানেশ্বর		১২৭১ ১২৯৬
রামানন্দ		১২৯৯-১৪১০
বিদ্যাপতি		আঃ ১৩৭৪
কবির		১৪২৫ ১৫১৮
শংকর দেব		১৪৪৯ ১৫৬৮
হরিদাস		১৪৫০-১৫২৮
গুরু নানক		১৪৬৯ ১৫৩৮
নিত্যানন্দ		১৪৭৪-১৫৪২
বল্লভ আচার্য		১৪৭৯ ১৫৩১
সুরদাস		১৪৭৯-১৫৮৪
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু		১৪৮৬-১৫৩৩
সনাতন -		
রূপ -		
মীরা বাঈ		১৪৯৮-১৫৪৬
শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর		১৫০৭-১৫৮৯
শ্রীজীব গোস্বামী		১৫১১-১৫৯৬
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী		১৫১৭ -
শ্রীনিবাস আচার্য		১৫১৯ -
শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর		১৫২৩-১৫৮৯
একনাথ		১৫৩৩ ১৫৯৯
বীরভান		১৫৪৩-
দাদু দয়াল		১৫৫৪-১৬০৩
তুকারাম		১৫৯৮-১৬৫০
তৈলঙ্গ স্বামী		১৬০৭-১৮৮৭
রামদাস স্বামী		১৬০৮-১৬৮১
তুকারাম		১৬০৮-১৬৬০
রাম প্রসাদ		১৭২৩-১৭৮৫
লোকনাথ ব্রহ্মচারী		১৭৩০-১৮৯০

হরিচাঁদ ঠাকুর	১৮১১-১৮৭৭
স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী	১৮২৪-১৮৮৩
শ্যামাচরণ	১৮২৮-১৮৯৫
ভোলাগিরি	১৮৩২-১৯২৮
আনন্দ স্বামী	১৮৩২-১৯০০
বালানন্দ ব্রহ্মচারী	১৮৩৩-১৯৩৭
রামকৃষ্ণ পরমহংস	১৮৩৬-১৮৮৬
শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১৮৩৮-১৯১৪
বামাক্ষ্যাপা	১৮৩৮-১৯১১
বিজয়কৃষ্ণ	১৮৪১ ১৮৯৯
সারদামণি	১৮৫৩-১৯২০
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৮৫৪-১৯৩২
বিশুদ্ধানন্দ	১৮৫৬ -১৮৯৯
গৌরী মা	১৮৫৭-১৯৩৭
সন্তদাস কাঠিয়া বাবা	১৮৫৯-১৯৩৫
রাম ঠাকুর	১৮৬০-১৯৪৯
বিবেকানন্দ	১৮৬৩-১৯০২
অভেদানন্দ	১৮৬৬-১৯৩৯
নিবেদিতা	১৮৬৭-১৯১১
প্রভু জগদ্বন্ধু	১৮৭১-১৯২১
ঋষি অরবিন্দ	১৮৭২-১৯৫০
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর	১৮৭৪-১৯৩৭
ব্রহ্মজ্ঞ মা	১৮৮০ - ১৯৩৪
স্বামী স্বরূপানন্দ	১৮৮৭-১৯৮৪
শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর	১৮৮৮-১৯৬৯
স্বামী কৃষ্ণানন্দ	১৮৯০-১৯৬৮
সীতারাম ওঙ্কারনাথ	১৮৯১-১৯৮২
আনন্দময়ী মা	১৮৯৬-১৯৮২
স্বামী প্রণবানন্দ	১৮৯৬-১৯৪১
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ	১৮৯৬-১৯৭৭
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী	১৯০০-১৯৭৯
শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ	১৯০৪-১৯৭৯
ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	১৯০৪-১৯৯৯
মহামণ্ডলেশ্বর শ্রমৎ স্বামী বিষ্ণুপুরীজি মহারাজ	১৯২১-
শ্রীল ভক্তিবল্লব তীর্থ গোস্বামী মহারাজ	১৯২৪ -

নকুল সাধু

(১৮৭১ — ১৯২৪)
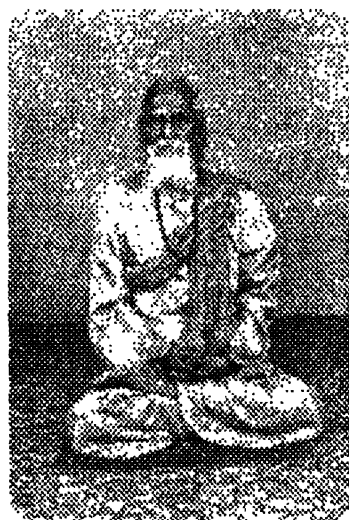
শ্রী শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতিশ্বরানন্দ
গিরি মহারাজ

জ্যোতিশ্বরানন্দজীর শিষ্য
শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজ
(১৯৬২—

জ্যোতিশ্বরানন্দজীর শিষ্যা
সেবানন্দময়ী মা
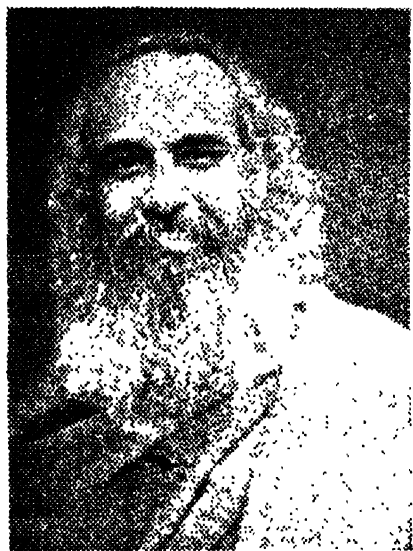
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
(১৮৮৭ — ১৯৮৪)

সাধু প্রজ্ঞানাথ
(১৮৮৯ — ১৯৬৩)

শ্রীমৎ হংসরাজ সোহংমনি
(১৮৯৪ — ১৯৭৯)

শ্রীমৎ স্বামী দয়ালানন্দ
(১৮৯৯ — ১৯৭০)

স্বামী নির্ব্বিকারানন্দ সরস্বতী
(১৯০২ —)

নিবারণচন্দ্র চৌধুরী
(১৯০৭ — ১৯৯২)

শ্রীহরি
(১৯১৮ —)

শ্রীমৎ স্বামী দর্শনানন্দ মহারাজ
(১৯১৫ —)

শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ
(১৯১৯ —)

অমূল্য রতন রায়
(১৯১৯ —)

শ্রীমৎ স্বামী কৃপালানন্দ গিরি মহারাজ
(১৯২৩ —)

জ্যোতির্ময় দাস গোস্বামী
(১৯২৩ — ১৯৯৫)

অন্নপূর্ণা দেবী
(১৯২৪ —)

স্বামী অমরেশ্বরপুরী মহারাজ

(১৯২৯ --)

মহারাজকুমার সহদেব

বিক্রম কিশোর

(১৯৩০)

কৃষ্ণদাস বাবাজী গোস্বামী

(১৯৩৪ – ১৯৭৮)

শ্রীশ্রী ১০৮ মমতাময়ী সরস্বতী

(১৯৩৬ -)

শ্রীমৎ স্বামী প্রেম পুরী মহারাজ

(১৯৪০ —)

শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ মহারাজ
(১৯৪৪ —)

ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ
(১৯৪৫—)

শ্রীমৎ স্বামী অনির্বাণপুরী মহারাজ
(১৯৪৮ —)

সাধ্বী গায়ত্রী দেবী
(১৯৫১ —)

শ্রী শ্রী স্নেহময়ী মা

(১৯৫২ —)

শ্রী প্রেমাঞ্জন দাস

(১৯৬০—)

গুরুদেব শান্তি কালী

(১৯৬০-২০০০)

সনন্দনদাস ব্রহ্মচারী

(১৯৬৩ —)

রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

(১৯৬৩ —)

শ্রীমৎ স্বামী তন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৯৬৪ —)

নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী

(১৯৬৭ —)

সর্ব্বেশ্বর চৈতন্য মহারাজ

(১৯৬৭ —)

প্রভুপাদ গোস্বামী

(১৯৭৭ —)

ব্রহ্মচারী দয়াল চৈতন্য

(১৯৬৮ —